রাফায়েল সাবাতিনি-র

দ্য সি-হক

রূপান্তরঃ ইসমাইল আরমান

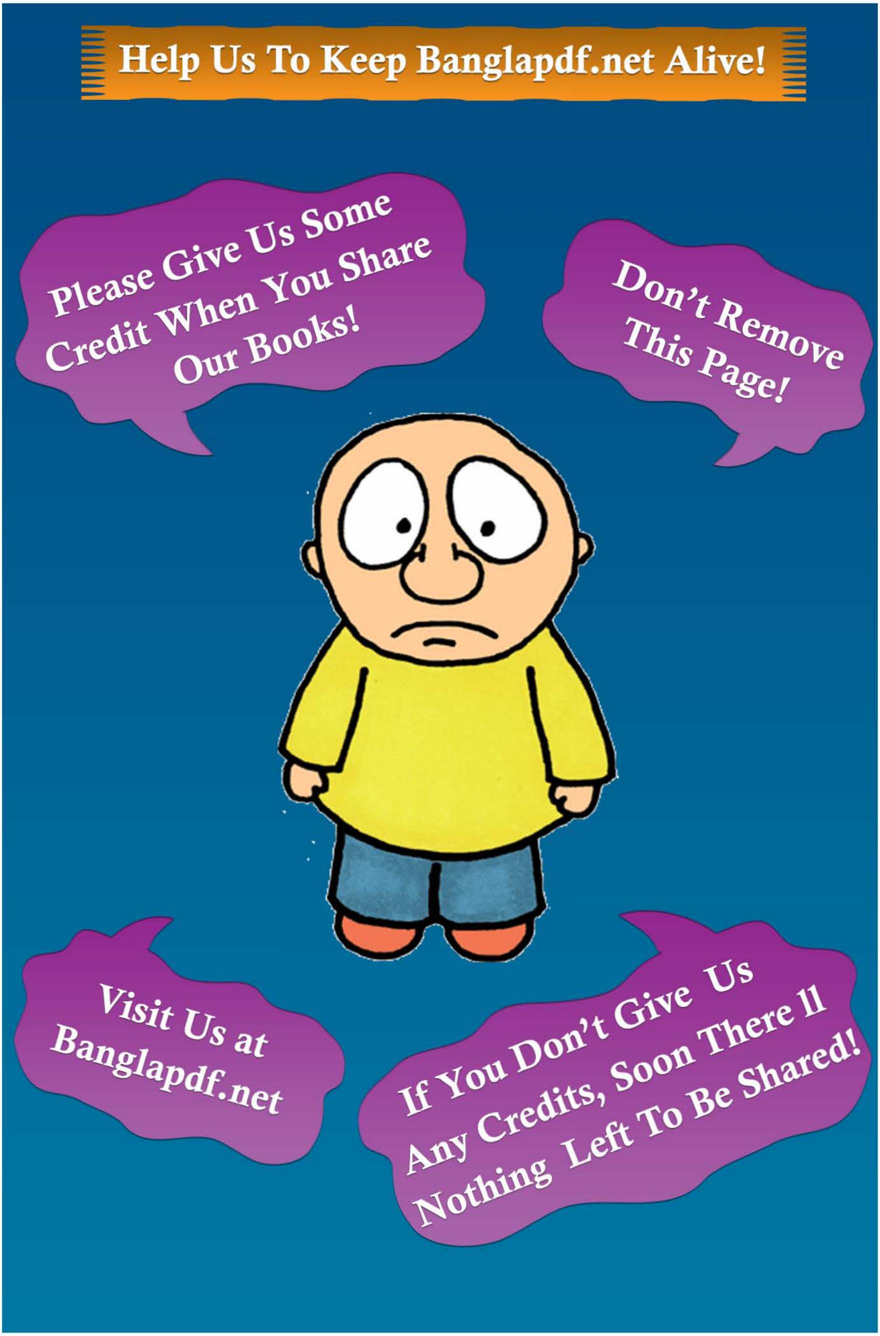
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don’t Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don’t Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

রাফায়েল সাবাতিনি-র

দ্য সি-হক

রূপান্তর ■ ইসমাইল আরমান

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-3236-5

এক শ' তিন টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১১

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

THE SEA-HAWK
By:Rafael-Sabatini
Trans. By: Ismail Arman

উৎসর্গ

যুগল নবদম্পতি...

বহ্নি-কাজমীর ও রাকিব-মোহনা।

সুখ আর আনন্দে ভরে যাক তোমাদের নতুন জীবন।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়; ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

লেখক পরিচিতি

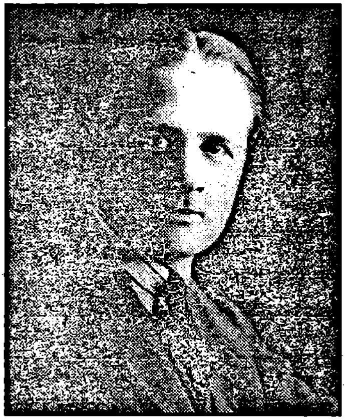

১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিলে মধ্য ইটালির অখ্যাত শহর জেসি-র এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হয় রাফায়েল সাবাতিনির। বাবা ছিলেন ইটালিয়ান পেইণ্টার, মা ইংরেজ কণ্ঠশিল্পী। কোনও ভাইবোন ছিল না তাঁর। সুইটজারল্যাণ্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন সাবাতিনি। সাতটি ভাষার উপর দখল ছিল তাঁর।

মাত্র আঠারো বছর বয়সেই ঢুকে পড়েন তিনি লেখালেখির জগতে। গল্প দিয়ে শুরু করেছিলেন, ১৯০২ সালে প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম উপন্যাস—দ্য লাভার্স অভ ইয়োভান। প্রথমদিকে খুব একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেননি তিনি, কিন্তু হতাশ না হয়ে চালিয়ে গেছেন লেখালেখি। ১৯১৫ সালে, চল্লিশ বছর বয়সে, দ্য সি-হক বেরুবার পর সাফল্যের দেখা পান। সে-ই শুরু, এরপর থেকে তিনি উপহার দিতে থাকেন *স্ক্যারামুশ, ক্যাপ্টেন ব্লাড* আর *দ্য ব্ল্যাক সোয়ান*-এর মত একের পর এক বিশ্ববিখ্যাত ক্লাসিক। ফলে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে তাঁর প্রতিটি বইয়ের লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে সারা দুনিয়ায়। ইণ্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার বলতে যা বোঝায়, তার সূচনা হয়েছে সাবাতিনির হাতেই।

তাঁর বহুল-পরিচিত অন্যান্য ঐতিহাসিক ক্লাসিক রোমাঞ্চ-উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে—*লাভ অ্যাট আর্মস, দ্য লস্ট কিং, বার্ডেলিস দ্য ম্যাগনিফিশেন্ট, বেলারিয়ন দ্য ফরচুনেট, দ্য ব্যানার অভ দ্য বুল,* ইত্যাদি। এইসব রচনার জন্য সার ওয়াল্টার স্কট ও আলেকজান্দার দ্যুমার সমকক্ষ হিসেবে তিনি সাহিত্যাঙ্গনে নিজের স্থান করে নেন।

হলিউডের সূচনালগ্নে সাবাতিনির বিখ্যাত উপন্যাসগুলো থেকে তৈরি করা হয়েছে অসংখ্য চলচ্চিত্র। এরল ফিন, টাইরোন পাওয়ার এবং স্টুয়ার্ট গ্রেঞ্জারের মত পুরনো আমলের সুপারস্টারদের জন্মই হয়েছিল সাবাতিনির বিখ্যাত কাহিনিগুলোর নায়ক চরিত্রে অভিনয় করে।

সবমিলিয়ে একত্রিশটি উপন্যাস, আটটি গল্প-সংকলন এবং ছ'টি প্রামাণ্যধর্মী বই লিখেছেন রাফায়েল সাবাতিনি। ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন দুই পুত্রের জনক—দুর্ভাগ্যক্রমে উভয় সন্তানকেই তিনি হারান পৃথক দুটো দুর্ঘটনায়। চুয়াত্তর বছর বয়সে, ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি জীবনাবসান ঘটে এই কালজয়ী লেখকের।

প্রথম পর্ব
সার অলিভার ট্রেসিলিয়ান

এক

ক্রুদ্ধ যুবক

প্রাসাদোপম পৈত্রিক নিবাস—*পেনারো হাউস*-এর বৃহদায়তন ডাইনিং হলে বসে আছে সার অলিভার ট্রেসিলিয়ান। কর্নওয়ালের এক নির্জন এলাকায় এই বাড়ি, নির্মিত হয়েছে ব্যাগনোলো নামে এক ইতালীয় নির্মাতার হাতে; প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে বিখ্যাত ইমারতশিল্পী টরিগিয়ানি-র সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে এসেছিল সে। অনবদ্য নির্মাণশৈলী এবং তার পিছনের কাহিনির কারণে পেনারো হাউসের কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে।

শিল্পী হিসেবে প্রতিভাবান হলেও ব্যাগনোলো ছিল রগচটা স্বভাবের মানুষ। সাউথওয়ার্কের এক মদ্যশালায় কথা কাটাকাটি থেকে খুন করে বসে এক লোককে। আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য এরপর পালিয়ে বেড়াতে শুরু করে সে। কোন্ পরিস্থিতিতে বা কীভাবে অলিভারের পিতা সার র‍্যালফ্ ট্রেসিলিয়ানের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল, তা জানা নেই কারও। তবে এটুকু জানা গেছে, ব্যাগনোলোকে আশ্রয় দেন তিনি, ইতালীয় শিল্পীও সে-উপকারের প্রতিদান দেয় ভগ্নপ্রায় পেনারো হাউসকে নতুন করে নির্মাণ করবার মাধ্যমে। তাই ভাঙাচোরা কাঠের কাঠামো সরে গিয়ে সেখানে মাথা তুলেছে লাল ইঁটের এক অপূর্ব দালান।

জানালাগুলো রঙিন কাঁচে মোড়া, মেঝে থেকে প্রায় ছাত পর্যন্ত লম্বা, সে-কারণে ঘরের ভিতরে অবাধে ঢুকতে পারে আলো-বাতাস। মূল প্রবেশপথে রয়েছে চমৎকার দুটো খিলান, তার উপরে ভর দিয়ে ঝুলছে বিশাল এক খোলামেলা ব্যালকনি, রেলিঙগুলো সবুজ লতায় ছাওয়া। লাল টালিতে ঢাকা ছাতের উপর রাজকীয় ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে আছে দুটো পেঁচানো চিমনি। সবমিলিয়ে ব্যাগনোলোর এই সৃষ্টি হয়ে উঠেছে অসাধারণ এক আভিজাত্যের প্রতীক।

তবে এ-সব ছাড়াও পেনারো হাউসের আরেক গর্ব হলো বাড়ির চারপাশে গড়ে তোলা চমৎকার এক বাগান। এককালের ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে এখন সেখানে লাগানো হয়েছে হরেক রকমের ফুলগাছ, তৈরি করা হয়েছে ভাস্কর্য-মণ্ডিত অনেকগুলো পানির ফোয়ারা। কালের প্রবাহে ইমারতের জৌলুস কমেছে, কিন্তু কমেনি এই বাগানের সৌন্দর্য। বরং দিনে দিনে আরও সমৃদ্ধ... আরও রূপসী হয়ে উঠেছে পেনারো পয়েন্টের উপরের এই সুসজ্জিত উদ্যান।

ডাইনিং হলের জানালা দিয়ে পেনারো হাউসের এই বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে অলিভার। মন উৎফুল্ল। জীবনকে বড় সুখের মনে হচ্ছে। তার পিছনে যৌক্তিক কারণও আছে। যৌবন চলছে ওর, মানবজীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়। সুদর্শন, সুঠাম শরীর, রোগব্যাধি বলে কিছু নেই। সম্মান ও খ্যাতিও অর্জন করেছে স্প্যানিশ আর্মাডার বিরুদ্ধে লড়াই করে। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তাই নাইট উপাধিতে ভূষিত করেছেন ওকে ব্রিটেনের রানি। প্রেমও এসেছে জীবনে—রোজামুণ্ড নামে অপরূপা এক তরুণীর বেশে।

মধ্যাহ্নভোজের পরে বসে বসে এসব নিয়েই ভাবছে

অলিভার। আয়েশ করে টানছে পাইপ। বুদ্ধিমান মানুষ ও, শিক্ষিতও বটে; কিন্তু একটা কথা জানা নেই ওর—সুখের অপর পিঠে লুকিয়ে থাকে দুঃখ। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সৌভাগ্য যে-কোনও মুহূর্তে বদলে যেতে পারে দুর্ভাগ্যে। এবং সেটার সূচনা হতে চলেছে খুব শীঘ্রি।

পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অলিভার, ওর ভৃত্য নিকোলাস হাজির হয়েছে ডাইনিং হলে। জানাল, মাস্টার পিটার গডলফিন ওর দর্শনপ্রার্থী। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল অলিভার। একটু পরেই কামরায় উদয় হলো অতিথি—হাতে একটা ছড়ি, আর মাথায় চওড়া স্প্যানিশ হ্যাট পরে। লম্বা, একহারা যুবক এই পিটার, চেহারায় আভিজাত্য, বয়সে অলিভারের চেয়ে দু-তিন বছরের ছোট। মাথাভর্তি পিঙ্গল বর্ণের চুল। দামি পোশাক পরেছে, তবে সেটা রুচিসম্মত বলা যাবে না।

উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝোঁকাল অলিভার, অভ্যর্থনা জানাল অতিথিকে।

পাইপের ধোঁয়া নাকে যাওয়ায় মুখ কুঁচকে ফেলল পিটার। বলল, 'আপনিও দেখছি বিশ্রী অভ্যেসটা রপ্ত করেছেন।'

'এরচেয়েও বাজে অভ্যেস থাকে মানুষের,' হালকা গলায় বলল অলিভার।

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' রুক্ষ গলায় বলল পিটার। বোঝা গেল, ঠাট্টা-মশকরা পছন্দ করছে না।

'হুম,' কাঁধ ঝাঁকাল অলিভার। 'কিছু মনে কোরো না, আমার এই ছোট্ট খুঁত তোমাকে মেনে নিতে হবে। নিকোলাস, একটা চেয়ার দাও মাস্টার গডলফিনকে। একটা কাপও নিয়ে এসো।' পিটারের দিকে ফিরল। 'পেনারো হাউসে স্বাগতম!'

বিতৃষ্ণা ফুটল পিটারের ফর্সা চেহারায়। বলল, 'সম্মান দেখানোয় ধন্যবাদ, কিন্তু আমি তা দেখাতে পারছি না বলে দুঃখিত।'

'অস্থির হবার কিছু নেই,' হাসল অলিভার, 'যখন সময় হবে, তখন নাহয় দেখিয়ো।'

'কখন সেটা?'

'আমি যখন তোমার বাড়িতে যাব।'

'ওই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি।'

'বসো না!' নিকোলাসের বাড়িয়ে দেয়া চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল অলিভার। ভৃত্যকেও ইশারা দিল চলে যাবার জন্য।

বসল না পিটার। 'শুনলাম, গতকাল আপনি গডলফিন কোর্টে গিয়েছিলেন,' কাঠখোট্টা গলায় বলল সে। একটু বিরতি নিল অলিভার অস্বীকার করে কি না, তা দেখতে। তেমন কিছু না ঘটায় যোগ করল, 'আমি জানাতে এসেছি, ভবিষ্যতে আমাদের বাড়িতে আপনাকে আর দেখা না গেলে খুব খুশি হব।'

মেঘ জমল অলিভারের চেহারায়। গম্ভীর গলায় বলল, 'বোধহয় না বুঝে কথাটা বলে ফেলেছ, পিটার। রোজামুণ্ড কি তোমাকে জানায়নি, গতকাল ও আমার বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে?'

'হাহ্! রোজামুণ্ড একটা বাচ্চা মেয়ে, এখনও ভালমন্দ বোঝার বয়স হয়নি ওর।'

'তারমানে ভুল করেছে ও? এমনটা ভাবার পিছনে কোনও কারণ আছে?'

এবার চেয়ারে বসল পিটার। হ্যাট খুলল মাথা থেকে, নামিয়ে রাখল কোলের উপর। হেলান দিয়ে বলল, 'কমপক্ষে এক ডজন কারণ দেখাতে পারব। তবে ওসব শোনাবার প্রয়োজন দেখছি।

আপাতত এটুকুই মনে করিয়ে দেয়া যথেষ্ট যে, রোজামুণ্ডের বয়স এখন সতেরো... এবং এ-মুহূর্তে আমি আর সার জন কিলিগ্রু ওর অভিভাবক। আমাদের কারুরই এই বিয়েতে মত নেই।'

হেসে উঠল অলিভার। 'কে চাইছে তোমাদের মতামত? বছরখানেক পরেই আইন অনুসারে সাবালিকা হয়ে যাবে ও, তখন আর অভিভাবকের প্রয়োজন পড়বে না। আমারও কোনও তাড়া নেই, বিয়েটা নাহয় এক বছর পরেই হবে। আমি ধৈর্য ধরতে জানি।'

'ধৈর্য ধরে কোনও লাভ হবে না, সার অলিভার। আমি আর সার জন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি—কিছুতেই আপনার হাতে তুলে দেব না রোজামুণ্ডকে।'

'তাই বুঝি?' বিদ্রূপ প্রকাশ পেল অলিভারের কণ্ঠে। 'এ-কথা শোনাবার জন্য তোমাকে পাঠিয়েছে সার জন? নিজে আসতে পারেনি?'

'দরকার হলে আসবেন তিনি।'

চেহারা কঠোর হলো অলিভারের। 'তোমাদের সিদ্ধান্ত তো শুনলাম, এবার আমার সিদ্ধান্ত শোনো। সার জন যদি ভুলেও পা রাখে পেনারো-তে, নিজ হাতে আমি তার কল্লা কেটে নেব... যে-কাজ বহু আগে কোনও জল্লাদের করা উচিত ছিল।'

'আমার ব্যাপারেও কিছু করবেন নাকি?' থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল পিটার।

'তুমি?' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল অলিভারের ঠোঁটে। 'ছোট শিকারে আগ্রহ নেই আমার। তা ছাড়া তুমি রোজামুণ্ডের ভাই... আমার সম্বন্ধি হতে চলেছ। তোমার ক্ষতি করে আমি রোজামুণ্ডের মনে দুঃখ দিতে চাই না।' একটু থামল ও। যখন আবার মুখ খুলল, কণ্ঠে পরিবর্তন এসেছে। 'মাথা ঠাণ্ডা করো, পিটার। সত্যি

করে বলো, সমস্যাটা কী? হ্যাঁ, আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে পুরনো শত্রুতা আছে... কিন্তু তা কি আমরা ভুলে যেতে পারি না? সার জনের কথা বাদ দাও, একরোখা আর বদমেজাজী স্বভাবের লোক সে—হিংসা-বিদ্বেষ জিইয়ে রাখতে চায়। কিন্তু তুমি তো একজন ভাই! বোনের সুখের জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে না? এসো, সবকিছু ভুলে গিয়ে আমরা বন্ধু হয়ে যাই।'

'বন্ধুত্ব?' ফুঁসে উঠল পিটার। 'কী ধরনের বন্ধু হতে পারি আমরা, তার উদাহরণ রেখে গেছেন আমাদের বাবা-রা।'

'ওঁরা যা-ই করে থাকেন, তাতে আমাদের কী? প্রতিবেশী হবার পরেও সদ্ভাব ছিল না তাঁদের মধ্যে—এ তো লজ্জার কথা! আমরা কেন সে-উদাহরণ অনুসরণ করব?'

'আমার বাবার উপর তার দায় চাপানোর চেষ্টা করলে ভুল করবেন!' সতর্ক করে দিল পিটার।

'কারও একার উপর দায় চাপাচ্ছি না,' শান্ত গলায় বলল অলিভার। 'ওঁদের দু'জনকেই ধিক্কার দিচ্ছি।'

'কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল পিটার। 'আপনি আমার মরা বাবাকে গালি দিচ্ছেন?'

'গালি বলো, বা প্রশংসা... সেটার দাবিদার দুজনেই। কপাল খারাপ, কবর থেকে কেউ ফিরতে পারে না। তা হলে হয়তো ওঁরাও স্বীকার করতেন নিজেদের ভুল।'

'গালাগালগুলো নিজের বাবার ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ রাখুন, সার অলিভার! তার মত মানুষের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে বসবাস করা কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

'এবার বোধহয় তোমার সংযত হওয়া দরকার, পিটার,' গম্ভীর হয়ে গেল অলিভার।

'কীসের সংযত? সবাই জানে, র‍্যালফ ট্রেসিলিয়ান ছিল একটা ইতর, ছোটলোক। পুরো এলাকার কলঙ্ক! আর সে-কলঙ্কের ধারক-বাহক এখন আপনি, সার অলিভার! এমন জঘন্য পরিবারে আমার বোনের সম্বন্ধ আমি কোনোদিনই হতে দেব না।'

'একই অভিযোগ আমিও করতে পারি,' বলল অলিভার। 'কলঙ্ক তোমাদের পরিবারেও কম নেই। কিন্তু ভালবাসার খাতিরে সে-সব আমি অগ্রাহ্য করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যা-খুশি করো, পিটার। কিন্তু রোজামুণ্ড আমারই হতে যাচ্ছে।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল পিটার। পায়ের ধাক্কায় পড়ে গেল তার চেয়ার। হাতের ছড়ি তুলে অলিভারকে আঘাত করবার চেষ্টা করল।

খপ্ করে ছড়িটা ধরে ফেলল অলিভার। শান্ত রইল। বলল, 'বড্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছ তুমি, পিটার। মাথা ঠাণ্ডা করো। খামোকাই এমন করছ। পুরনো ঝগড়ার জের টেনে কী লাভ হবে, বলো? ওই ঝগড়া ছিল আমাদের বাবাদের মধ্যে, আমাদের মধ্যে তো নয়!'

'ঝগড়া-টগড়া বুঝি না,' টান দিয়ে ছড়িটা ছাড়িয়ে নিল পিটার। 'কিন্তু আমার বোন একটা জলদস্যুকে বিয়ে করবে না!'

'জলদস্যু! আমি? স্প্যানিশ আর্মাডার বিরুদ্ধে আমার লড়াইকে দস্যুতা বলছ তুমি? মহামান্য রানি কি দস্যুতার জন্য নাইট উপাধি দিয়েছেন আমাকে? পাগল হয়ে গেছ তুমি, পিটার। এসব আজে-বাজে কথা কে বুঝিয়েছে তোমাকে? নিশ্চয়ই সার জন কিলিগ্রু?'

'কচি খোকা নই আমি,' গরম স্বরে বলল পিটার। 'যা বোঝার, তা নিজেই বুঝে নিতে জানি।' মুখে প্রতিবাদ করলেও আচরণে প্রকট হয়ে উঠল, অলিভারের ধারণা ভুল নয়।

‘আমাকে জলদস্যু বলে ডাকলে তাতে মহামান্য রানিকেই অপমান করা হয়। তা ছাড়া এই ফালতু অভিযোগের পিছনে কোনও প্রমাণও দেখাতে পারবে না তুমি। বাস্তবতা হলো, কর্নওয়ালের সুপাত্রদের মধ্যে আমি একজন। রোজামুণ্ড আমাকে ভালবাসে। বংশমর্যাদার দিক থেকে যেমন অনেক উঁচুতে আছি আমি, তেমনি আছি ধন-সম্পদের দিক থেকেও।’

‘ওই ধনসম্পদ এসেছে সাগরে দস্যুতা চালিয়ে, সার অলিভার। সওদাগরি জাহাজ লুটপাট করে, বন্দি নাবিকদেরকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিয়ে!’

‘এ-সব কে বলেছে তোমাকে? সার জন?’ শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অলিভার।

‘আমিই বলছি!’

‘বলছ ঠিকই, কিন্তু শুনে এসেছ সার জনের কাছ থেকে। উনিই সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছেন তোমাকে। অসুবিধে নেই, এর জবাব যথাসময়ে দেব আমি তাঁকে। কিন্তু তার আগে সার জনের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে তোমাকে একটু সবক দিতে চাই।’

‘না! কিছুই শুনতে চাই না আমি সার জনের সম্পর্কে! অন্তত আপনার মুখে না!’ খেপাটে গলায় বলল পিটার।

‘শুনতে তোমাকে হবেই!’ কাটা কাটা স্বরে বলল অলিভার। ‘জানি, যথেষ্ট সম্মান করো লোকটাকে। তোমার আর রোজামুণ্ডের বাবার বন্ধু ছিলেন তিনি, তোমরা অনাথ হয়ে যাবার পর নিজ থেকে অভিভাবকত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন... সম্মান সৃষ্টি হবারই কথা। কিন্তু তাই বলে মুখ বুজে থাকা যায় না। আমার পিছনে কেন আদাজল খেয়ে লেগেছেন তিনি, তা তোমার জানা থাকা দরকার।’

‘কী সেটা?’

'ফাল নদীর মুখে একটা বন্দর তৈরি করতে চাইছেন সার জন, কিন্তু সেটা করতে চাইছেন নিজের জমিতে... যাতে ওই বন্দর আর আশপাশের জনপদ থেকে নিজের পকেট ভারী করতে পারেন। একই রকম ইচ্ছে আমারও আছে... কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। সবার উপকার হয়, এমন জায়গাই বেছে নেব আমি। ক'দিন আগে কাজ শুরু করবার অনুমতি আর টাকার জন্য রানির দরবারে একসঙ্গে হাজির হই আমরা। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আমার পক্ষে রায় দেন রানি। যুদ্ধের সময়ের বীরত্বের জন্য হয়তো কিছুটা দুর্বলতা আছে তাঁর আমার প্রতি, তারপরেও সিদ্ধান্তটাকে অন্যায় বলা চলে না। কিন্তু ব্যাপারটাকে অন্য চোখে দেখছেন সার জন। ভাবছেন রানিকে প্রভাবিত করেছি আমি তাঁর কাজ ছিনিয়ে নেবার জন্য। তাই শুরু করেছেন অপপ্রচার।'

'কীসের অপপ্রচার?' বলল পিটার। 'রানির উপরে অবশ্যই প্রভাব খাটিয়েছেন আপনি। তাতে একা সার জন নন... আমিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।'

'ও! ব্যাপার তা হলে এই?' বাঁকা সুরে বলল অলিভার। 'এবার বুঝতে পারছি তোমার বিষোদগারের কারণ। বড্ড ভুল করেছি তোমাকে সৎ, ভাল ছেলে ভেবে। সার জনের মত তুমিও একই পথের পথিক। স্বার্থপর, নীচ... না, তোমার সঙ্গে কথা বলে আর সময় নষ্ট করবার কোনও মানে হয় না।'

'যদি এর জবাব না দিয়েছি...' দাঁতে দাঁত পিষল পিটার।

'তোমার জবাবে কোনও আগ্রহ নেই আমার,' ওকে থামিয়ে দিল অলিভার। 'যথেষ্ট সহ্য করেছি তোমার অভদ্র আচরণ। ধৃষ্টতা দেখে অবাক হতে হয়! বোনকে বিয়ে দেবে না আমার সঙ্গে! আমার নাকি বংশ-পরিচয় নেই, আমি নাকি একটা জলদস্যু!

আরে, সাহস থাকে তো সত্যি কথাটা মুখ ফুটে বলে ফেলো না! তোমাকে আর সার জনের পকেট ভারী করবার পথ বন্ধ করে দিয়েছি বলে খেপেছ... কথাটা স্বীকার করে নিলেই পারো!'

রাগে কাঁপতে শুরু করল পিটার। 'এই অপমান আমি কোনোদিন ভুলব না, সার অলিভার।'

'ভাল... মনে রাখলেই ভাল,' চাঁছাছোলা গলায় বলল অলিভার। গলা চড়িয়ে ডাকল ভৃত্যকে, 'নিকোলাস!'

হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলো নিকোলাস।

'আবার আমার দেখা পাবেন আপনি,' রুদ্রকণ্ঠে বলল পিটার। 'সেদিন সবকিছুর হিসাব-নিকাশ হবে... তলোয়ারের ভাষায়!'

'ছোটলোকদের সঙ্গে লড়াই করি না আমি,' বলল অলিভার।

'আপনি আমাকে ছোটলোক বললেন?' চেঁচাল পিটার।

'যা সত্যি, তা-ই বলেছি,' নির্বিকার রইল অলিভার। 'নিকোলাস, মাস্টার গডলফিনকে দরজা দেখিয়ে দাও।'

দুই

রোজামুণ্ড

পিটার গডলফিন চলে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ থম্ মেরে বসে রইল অলিভার। মেজাজ খাট্টা হয়ে গেছে। পারিবারিক শত্রুতার কারণে এমনিতেই ওর আর রোজামুণ্ডের মিলনের পথে হাজারটা

বাধা রয়েছে, তাতে আবার নতুন করে প্যাঁচ কষছে সার জন কিলিগ্রু। চুপ করে বসে থাকলে আরও মাথায় চড়ে বসবে লোকটা। এর একটা বিহিত না করলেই নয়... এবং সেটা এখুনি।

নিকোলাসকে ডেকে বাইরে যাবার বুট আনাল অলিভার। ওগুলো পায়ে গলাতে গলাতে জিজ্ঞেস করল, 'মাস্টার লায়োনেল কোথায়? ওকে দেখছি না যে?'

'বাইরে গিয়েছিলেন, একটু আগে ফিরে এসেছেন,' জানাল নিকোলাস।

'ডাকো ওকে।'

সমন পেয়ে একটু পরেই হাজির হলো লায়োনেল ট্রেসিলিয়ান—অলিভারের সৎ ভাই। বয়স একুশ, সার র‍্যালফ ট্রেসিলিয়ানের দ্বিতীয় স্ত্রী-র গর্ভে জন্ম হয়েছে তার। মেয়েলি চেহারা, ঠিক সুপুরুষ বলা চলে না। দু'চোখের মণি নীল, মাথাভর্তি সোনালি চুল। চামড়া ধবধবে সাদা। মা আলাদা হলেও অলিভার তাকে আপন ভাইয়ের চেয়ে কোনও অংশে কম স্নেহ করে না। ওরাই এখন ট্রেসিলিয়ান পরিবারের শেষ বংশধর—সার র‍্যালফ এবং তাঁর দুই স্ত্রী বহু বছর আগে মারা গেছেন।

'পাগলা গডলফিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল নাকি?' কামরায় ঢুকেই প্রশ্ন করল লায়োনেল।

'হ্যাঁ,' বলল অলিভার, 'আমাকে কড়া কথা শোনাতে এসেছিল... ফিরে গেছে নিজেও কিছু কড়া কথা শুনে।'

হাসল লায়োনেল। 'তা-ই বলো! গেটের কাছে দেখা হয়েছে আমার সঙ্গে। অভিবাদন জানালাম, যেন শুনতেই পেল না। নিশ্চয়ই খেপেছে খুব।'

'খেপলেই ভাল,' উঠে দাঁড়াল অলিভার। 'আরওয়েনাক-এ যাচ্ছি আমি। সার জনের সঙ্গে একটু বাতচিত হওয়া দরকার।'

ওর ভাবভঙ্গি দেখে শঙ্কা ফুটল লায়োনেলের চেহারায়। বলল, 'তুমি কি...'

'হ্যাঁ,' ভাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল অলিভার। 'বড় বাড় বেড়েছে সার জনের, মুখ দিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বেরুচ্ছে অনবরত। জিভে কীভাবে লাগাম দিতে হয়, তা শিখিয়ে দিয়ে আসব।'

'ঝামেলা দেখা দেবে, অলিভার!' সতর্ক করল লায়োনেল।

'তা তো দেবেই... সার জনের জন্য। আমার নামে বদনাম ছড়াচ্ছে সে—আমি নাকি জলদস্যু, দাস-ব্যবসায়ী, খুনি! এসব কথা বলবার আগে পরিণামের কথা ভাবা উচিত ছিল তার। সে-যাক...' প্রসঙ্গ পাল্টাল অলিভার, 'তোমার এত দেরি কেন? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'ঘুরতে বেরিয়েছিলাম,' বলল লায়োনেল। 'মালপাস পর্যন্ত গেছি।'

'মালপাস?' ভুরু কোঁচকাল অলিভার। 'আজকাল ওদিকটায় বড্ড ঘন ঘন যাচ্ছ তুমি। ব্যাপারটা কী?'

'সমস্যা কোথায়?'

'বাবার পথে হাঁটছ তুমি। তাঁর মত পরিণতি যদি বরণ করতে না চাও, সরে এসো ও-পথ থেকে। মালপাসে আর যেয়ো না তুমি, লায়োনেল—এটাই আমার ইচ্ছে।'

ভাইকে আলিঙ্গন করে বেরিয়ে গেল অলিভার।

নিকোলাস খাবার নিয়ে এসেছে, খেতে বসল লায়োনেল। কিন্তু মুখে রুচল না কিছু। দুশ্চিন্তা অনুভব করছে অলিভারের কথা ভেবে। যে-ভাবে ছুটে চলে গেল আরওয়েনাকে, নিঃসন্দেহে তুলকালাম বাধিয়ে দেবে সার জনের বাড়িতে। কী ঘটবে বলা যায় না। চুপচাপ অপমান সহ্য করবার মানুষ নন সার জন কিলিগ্রু,

অলিভারের কোনও ক্ষতি করে বসেন কি না, সে-আশঙ্কা পেয়ে বসছে ওকে। ভাইয়ের অমঙ্গলের পাশাপাশি ভবিষ্যতের চিন্তাও খেলতে শুরু করল মাথায়... অনেকটা ইচ্ছের বিরুদ্ধেই। অস্বীকার করবার উপায় নেই, অলিভার মারা গেলে লাভ বৈ ক্ষতি হবে না লায়োনেলের। ভাইয়ের সমস্ত সহায়-সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ও। চিন্তাটা মাথায় আসায় বিব্রত অনুভব করল লায়োনেল।

একেবারে সাধারণ মানুষের মত মারা গেছেন ওদের পিতা, দেনার দায়ে জর্জরিত হয়ে... চরম দারিদ্র্যের মাঝে। বাড়ি পর্যন্ত বন্ধক দিয়ে ফেলেছিলেন। সব টাকা উড়িয়েছেন মদ, জুয়া আর মেয়েমানুষের পিছনে। কপাল ভাল, হেলস্টনের কাছাকাছি কিছু জমিজমা ছিল অলিভারের, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। ওগুলো বিক্রি করে কিছু টাকা জোগাড় করে ও, জাহাজ কিনে হকিন্স নামে এক বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে বাণিজ্যে। ধীরে ধীরে ফিরিয়ে আনে পরিবারের হারানো গৌরব, পিতার ধার-দেনা শোধ করে মুক্ত করে নিজেদের সম্পত্তি। ওই জাহাজ নিয়েই স্প্যানিশ আর্মাডার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে অলিভার, অর্জন করেছে নাইট খেতাব। একার চেষ্টায় উন্নতির শিখরে পৌঁছুনোর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আর কী। বলা বাহুল্য, তরুণ নাইটের এ-সাফল্য সহ্য করতে পারছে না অনেকে, তাই অলিভারের সাগর-অভিযানকে জলদস্যুতা বলে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

ভাইয়ের সাফল্য সবচেয়ে উপকার করেছে লায়োনেলের। ভিক্ষের থালা নিয়ে রাস্তায় নামার বদলে পায়ের উপর পা তুলে আয়েশ করতে পারছে সে। তবে ইদানীং একটা দুর্ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে মনে—অলিভারের বিয়ের পর কী ঘটবে? আরাম-আয়েশের জীবন কি অব্যহত থাকবে? ঘরে বউ আসবার পরেও কি ওকে

এখনকার মত অঢেল হাতখরচ দেবে অলিভার?

লায়োনেলকে ভালবাসে অলিভার। শুধু ভাই নয়, ও তার অভিভাবকও বটে। পিতার মৃত্যুর পর অলিভারই তাকে বাবা-মায়ের ভালবাসা দিয়ে বড় করেছে। তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায়, স্ত্রী-র প্রতি ভালবাসা কি ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াবে কি না। এমনও হতে পারে, অলিভারের বউই আপত্তি জানাল লায়োনেলের বেহিসেবি খরচ এবং উদ্দাম জীবনযাপনের ব্যাপারে। তার ফলাফল হবে ভয়াবহ। এক পয়সা উপার্জন নেই লায়োনেলের, অলিভার যদি টাকা না দেয়... কে দেবে?

বসে বসে এ-সব নিয়ে ভাবছে লায়োনেল। অশুভ একটা চিন্তা জেঁকে বসছে মাথায়। সার জনের বাড়ি আরওয়েনাক-এ যদি ভালমন্দ একটা কিছু ঘটে যায় অলিভারের, তা হলে পেনারো হাউস-সহ ভাইয়ের সমস্ত ধনসম্পদ পেয়ে যাবে ও! ওফ্, কী ভালই না হবে তাতে! সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে যেতে বসেছিল, হঠাৎ করে সংবিৎ ফিরে পেল। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আর ঘৃণায় লাল হয়ে উঠল মুখ। এসব কী ভাবছে ও!

নিজের অজান্তেই ঝট্ করে দাঁড়িয়ে গেল লায়োনেল। চেঁচিয়ে উঠল, 'না!'

ওর চিৎকার শুনে ছুটে এল নিকোলাস। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'মাস্টার লায়োনেল! কী হয়েছে?'

ঘামে মুখ ভিজে গেছে লায়োনেলের। রুমাল বের করে মুছল। তাকাল ভৃত্যের দিকে। 'আরওয়েনাকে গেছে অলিভার, জানো তুমি?'

মাথা নাড়ল নিকোলাস। জানতে চাইল, 'কেন?'

'সার জনকে শাস্তি দেবার জন্য।'

নিকোলাসের পোড়খাওয়া চেহারায় হাসি ফুটল। 'তাই নাকি? খুব ভাল। কিছুদিন থেকে খুব বাড়াবাড়ি করছেন সার জন, শাস্তি একটা পাওনা হয়েছে তাঁর।'

বিস্মিত হলো লায়োনেল। 'তোমার... তোমার ভয় হচ্ছে না অলিভারের জন্য?'

'কীসের ভয়? ওই চামচিকে-টা সার অলিভারের ক্ষতি করতে পারবে নাকি? বরং তলোয়ারের খোঁচা খেয়ে বাপ-বাপ করে পালাবে।'

'তা-ই যেন হয়।'

ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে *ফাল* নদীর মোহনার কাছে পৌঁছুল অলিভার। ওখানেই কিলিগ্রু পরিবারের দুর্গ-প্রতীম প্রাসাদ—আরওয়েনাক। বেশ উঁচু জমিতে অবস্থিত, দুর্গের ছাদ থেকে চারপাশের মোটামুটি দশ-পনেরো মাইল চোখে পড়ে। ভিতরে ঢুকতেই দেখা পাওয়া গেল পিটার গডলফিনের। পেনারো হাউস থেকে সম্ভবত সরাসরি এসেছে আরওয়েনাকে।

পিটারের উপস্থিতিতেই সার জনের সঙ্গে দেখা করল অলিভার। কড়া ভাষায় তার কাছে কৈফিয়ত দাবি করল, কেন ওর নামে আজেবাজে কথা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। পিটার সঙ্গে থাকাতেই যেন তেজ বাড়ল সার জনের। সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিলেন, যা বলেছেন, তার মধ্যে একবিন্দু মিথ্যে নেই। আসলেই অলিভার একজন জলদস্যু।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল অলিভারের। এমন অপমান সহ্য করা সম্ভব নয়। সার জনকে ডুয়েলের জন্য চ্যালেঞ্জ করল ও। লোকটাও সাড়া দিল তাতে। ফলে মিনিট পনেরো পরেই আরওয়েনাক দুর্গের বাগানে মুখোমুখি হলো দু'জনে। শুরু করল

অসিযুদ্ধ।

প্রবল বিক্রমে অলিভারের উপর হামলা চালালেন সার জন, কিন্তু তা অনায়াসে ঠেকিয়ে দিল তরুণ নাইট। ভৃত্য নিকোলাসের ধারণাকে সত্য প্রমাণিত করে খুব শীঘ্রি পরাস্ত করল প্রতিপক্ষকে। মিনিট পাঁচেক পর দেখা গেল, কাঁধে একটা গভীর ক্ষত নিয়ে বাগানের মাটিতে পড়ে আছেন সার জন।

তলোয়ারটা খাপে ভরে ফেলল অলিভার, তাকাল পিটারের দিকে। দর্শক হিসেবে কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে ছিল ছেলেটা, তরুণ নাইটের যুদ্ধংদেহী রূপ দেখে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা।

'আশা করি কিছু সময়ের জন্য মুখ বন্ধ হয়েছে ওঁর,' বক্রোক্তি করল অলিভার, ইশারা করল কাতরাতে থাকা সার জনের দিকে। 'চাইলে চিরতরেই চুপ করাতে পারতাম... আগামীতে যদি আবার এভাবে আসতে হয় আমাকে, তা হলে সে-কাজটাই করব।'

'পরাজিত শত্রুকে নিয়ে উপহাস করছ?' ফুঁসে উঠল পিটার। 'কেমনতরো নাইট তুমি?'

'উপহাস না, সতর্ক করে দিচ্ছি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল অলিভার। 'আবার যদি আমার নামে আজেবাজে কথা ছড়াবার চেষ্টা করো তোমরা, তার ফল ভাল হবে না। বিদায়।'

প্রতিপক্ষকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আরওয়েনাক ত্যাগ করল ও। সরাসরি বাড়িতে ফিরল না, থামল গডলফিন কোর্টে, রোজামুণ্ডের সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

ট্রেফুসিস পয়েন্টের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে গডলফিন পরিবারের আবাস, ক্যারিক রোডের ধারে। বাড়ির পুরনো আমলের ফটক পেরিয়ে নুড়ি বিছানো আঙিনায় ঢুকল অলিভার। একজন চাকরকে ডেকে খবর পাঠাল রোজামুণ্ডের কাছে। একটু পরে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো বাড়ির পশ্চিম প্রান্তের একটা ছোট কামরায়।

উজ্জ্বলভাবে আলোকিত ওটা, জানালা দিয়ে চোখে পড়ে বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী আর ঘাসে ছাওয়া পাহাড়ি ঢালের চমৎকার দৃশ্য।

কোলের উপর একটা বই নিয়ে বসে ছিল রোজামুণ্ড, উঁচু গলায় ওর ব্যক্তিগত দাসী অলিভারের আগমন-বার্তা ঘোষণা করায় চোখ তুলে তাকাল। উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নোয়াল অভিবাদন জানাবার ভঙ্গিতে। হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে গেল অলিভারের। এমনিতেই অপূর্ব সুন্দরী রোজামুণ্ড, আজ আরও সুন্দর লাগছে। সিল্কের মত মসৃণ কোমর-ছাড়ানো সোনালি চুল ওর, পটলচেরা চোখের নীল মণিতে সাগরের গভীরতা। তীক্ষ্ণ নাক, ছোট্ট কপাল, পাতলা ঠোঁট আর ডিম্বাকৃতির মুখটা যেন শিল্পীর হাতে গড়া হয়েছে—চেহারা হয়ে উঠেছে অপূর্ব সুন্দর আর মায়াময়। ছোটখাট গড়নের দেহটাও ছিপছিপে, তাতে অকৃপণ হাতে যৌবনের সম্পদ ঢেলেছেন সৃষ্টিকর্তা, নশ্বর এক নারীকে পরিণত করেছেন সব পুরুষের আরাধ্য দেবীতে।

'তোমাকে এ-মুহূর্তে আশা করিনি আমি...' বলতে বলতে থেমে গেল রোজামুণ্ড। প্রেমিকের চেহারায় অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছে। 'কী হয়েছে, অলিভার?'

এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরল অলিভার। 'ভয় পাবার মত কিছু না,' বলল ও। 'বিব্রতকর একটা ব্যাপার। সার জন কিলিগ্রুর প্রতি তোমার আলাদা কোনও টান নেই তো?'

'থাকাটাই কি স্বাভাবিক নয়?' ভুরু কোঁচকাল রোজামুণ্ড। 'আমাদের দু'ভাই-বোনের অভিভাবক তিনি।'

বিতৃষ্ণা ফুটল অলিভারের চেহারায়। 'হ্যাঁ, অপ্রিয় একটা বাস্তবতা ওটা। ইয়ে... আরেকটু হলে আজ ওঁকে খুন করে ফেলেছিলাম আমি।'

আতঙ্ক দেখা দিল রোজামুণ্ডের চোখের তারায়, ধপ্ করে বসে পড়ল চেয়ারে। কাছে এসে তাড়াতাড়ি ওকে সব ব্যাখ্যা করল অলিভার। শেষে যোগ করল, 'এমনিতে এসব উড়ো কথায় খুব একটা পাত্তা দিই না আমি। কিন্তু সার জন একটা অক্ষমণীয় অপরাধ করেছেন। তোমার ভাইয়ের মন বিষিয়ে তুলেছেন আমার ব্যাপারে। আজ পিটার হাজির হয়েছিল আমার বাড়িতে। মুখের উপর অপমান করেছে আমাকে... ঝগড়া বাধানোর চেষ্টা করেছে। মুখ বুজে ওসব সহ্য করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে।'

'তারমানে কি পিটারকেও তুমি...' ভাইয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় গলা কেঁপে উঠল রোজামুণ্ডের।

হাসল অলিভার। 'ভয় পেয়ো না। আর যা-ই করি, তোমার ভাইয়ের কোনও ক্ষতি করব না আমি, আমাদের বিয়ের পথে যত বাধা-ই ও দিক না কেন। আসলে... আমি এসেছি সব তোমাকে খুলে বলবার জন্য। অন্য কারও মুখ থেকে অতিরঞ্জন শোনার আগে সত্যি ঘটনা জানা থাকা প্রয়োজন তোমার।'

মাথা নিচু করে ফেলল রোজামুণ্ড। নিচুকণ্ঠে বলল, 'সবাই বলে, তুমি খুব একগুঁয়ে স্বভাবের মানুষ। কারও সঙ্গে ঝগড়া বাধলে খুব নিষ্ঠুর হয়ে ওঠো।'

গম্ভীর হয়ে গেল অলিভার। 'মনে হচ্ছে তুমিও সার জনের কথায় কান দিতে শুরু করেছ।'

'দুঃখিত, তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি। ওগুলো লোকের কথা... আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু ওদের ভুল ধারণা তোমাকেই ভাঙাতে হবে। ভেবে দেখো, আজ কি সে-চেষ্টা করেছ?'

'অবশ্যই। আজ যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছি আমি।'

'সংযম!' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল রোজামুণ্ডের ঠোঁটের কোনা। 'তুমি ঠাট্টা করছ?'

'সংযম নয়? সার জন যা ঘটিয়েছে, তার জন্য প্রাণ নেয়া উচিত ছিল আমার। নিইনি। তোমার ভাইয়ের ব্যাপারেও একই কথা খাটে। বয়স কম, অন্যের কথায় নেচে উঠেছে... এই ভেবে রেহাই দিয়েছি ওকে। এ-সবই কিন্তু করেছি তোমার কথা ভেবে।'

একটু কেঁপে উঠল রোজামুণ্ড। ভালবাসার মানুষটার হাতে প্রাণপ্রিয় ভাই আর শ্রদ্ধেয় অভিভাবকের রক্ত লাগে কি না, এই ভেবে।

ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারল অলিভার, হাঁটু গেড়ে বসল চেয়ারের সামনে। হাতের মুঠোয় প্রেমিকার দু'হাত ধরে কোমল গলায় বলল, 'আমার কথা শোনো, রোজামুণ্ড। যা ঘটেছে, তার পিছনে আমার কোনও হাত ছিল না। লোকের বাজে কথা দূর করে দাও মন থেকে। আমার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করো। আজ যদি আমার ভাই লায়োনেল হাজির হতো এখানে, তোমার আর তোমার পরিবারের নামে মিথ্যে অভিযোগ এনে বলে দিত—কিছুতেই তোমার-আমার বিয়ে হতে দেবে না... তা হলে কেমন লাগত তোমার? মেনে নিতে পারতে ওসব? নাইট আমি, নিজের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রতিবাদ করতে হয়েছে। সত্যি করে বলো, আসলেই কি অন্যায় করেছি আমি? জবাব দাও!'

মুখ তুলে তাকাল রোজামুণ্ড। দু'চোখে পানি চিকচিক করছে। 'যা বলেছ, তার মধ্যে একবিন্দু মিথ্যে নেই তো?'

'ঈশ্বর সাক্ষী, মিথ্যে বললে যেন আমার উপর গজব নামে।'

'ঠিক আছে, তোমার কথা বিশ্বাস করলাম আমি। না, দোষ করোনি তুমি নিজের সম্মান বাঁচাতে গিয়ে। কিন্তু... ব্যাপারটা এখানেই শেষ হবে না। আগামীতে কী করবে তুমি?'

'পিটারের কথা ভাবছ, তাই না?' একটু হাসল অলিভার। 'ভয় নেই, আমার হাতে ওর কোনও ক্ষতি হবে না। আমাকে যতই

অপমান করুক না কেন!'

'নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে নিজেকে? তুমি নিশ্চিত?'

'অবশ্যই! আজ করেছি না? তোমাকে তো বলিনি, আজ আমাকে ছড়ি দিয়ে আঘাত করবার চেষ্টা করেছে পিটার। কিচ্ছু বলিনি ওকে।'

বিস্ফারিত হয়ে গেল রোজামুণ্ডের দৃষ্টি। 'ও তোমার গায়ে হাত তুলেছে?'

'চেষ্টা করেছে,' বলল অলিভার। 'সফল হয়নি। আগামীতেও হবে না। আমি ওকে এড়িয়ে চলব, রোজামুণ্ড। আমাকে এ-বাড়িতে আসতে নিষেধ করেছে পিটার... তা-ও মেনে নেব। আসলে, এ অসুবিধে সাময়িক। আর এক বছর পরেই সাবালিকা হয়ে যাবে তুমি। তখন আর কেউ বাধা দিতে পারবে না আমাদের দেখা-সাক্ষাতে। ততদিন পর্যন্ত নাহয় একটু কষ্ট করলাম। কী বলো?'

'কষ্টটা মুখ্য নয়,' মাথা নাড়ল রোজামুণ্ড। 'আমার ভাই ও। আমাকে যেমন তুমি ভালবাসো, আমি চাই ওকেও একই রকম ভালবাসা দাও তুমি।'

'আমার তরফ থেকে চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না,' কথা দিল অলিভার। 'কিন্তু ও যদি আমার স্নেহ-ভালবাসা অগ্রাহ্য করে, তা হলে কিছু করার নেই।'

'তাই বলে তুমি ওকে ঘৃণা করবে না তো?'

'কক্ষণো না, রোজামুণ্ড।'

হাসি ফুটল রোজামুণ্ডের ঠোঁটে। হাত বোলাল অলিভারের গালে। বলল, 'তুমি বড্ড ভালমানুষ, অলিভার। লোকে ভুল কথা বলে... না, নিষ্ঠুর নও তুমি, একগুঁয়েও নও।'

'হয়তো ছিলাম এককালে,' অলিভার বলল, 'কিন্তু তুমি

আমাকে বদলে দিয়েছ, রোজামুণ্ড। আর আমি সেই মানুষটি নেই।' রোজামুণ্ডের হাতে চুমো খেয়ে উঠে দাঁড়াল ও। 'এবার আমাকে যেতে হয়। ট্রেফুসিস পয়েন্টের নদীতীরে কাল সকালে হাঁটতে আসব আমি। যদি সুযোগ মেলে তো দেখা কোরো ওখানে।'

হাসল রোজামুণ্ড। 'থাকব আমি ওখানে।'

'তা হলে বিদায়, প্রিয়তমা,' মাথা নুইয়ে বলল অলিভার। উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল।

একদৃষ্টে ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল রোজামুণ্ড। শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় ভরে উঠেছে অন্তর।

তিন

কামারশালা

আগেভাগে রোজামুণ্ডকে সবকিছু জানিয়ে দিয়ে ভাল করেছে অলিভার। কারণ বাড়ি ফিরেই বোনের কাছে ছুটে গেল পিটার গডলফিন—অলিভারের ব্যাপারে ওর কানে বিষ ঢালবার জন্য।

'রোজামুণ্ড, সার অলিভারের কাণ্ড শুনেছিস?' কামরায় ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠল সে। 'সার জনকে ভয়ানকভাবে জখম করেছে... ওঁর এখন মরার দশা।'

'জানি,' শান্ত কণ্ঠে বলল রোজামুণ্ড। 'এবং যদ্দূর বুঝতে

পেরেছি, কৃতকর্মের উপযুক্ত ফল-ই পেয়েছেন তিনি। উল্টোপাল্টা কাজের পরিণাম সম্পর্কে ভাবা উচিত ছিল তাঁর।'

থমকে গেল পিটার। চরম অবিশ্বাস নিয়ে কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল বোনের দিকে। তারপর ফেটে পড়ল রাগে। শুরু করল গালাগাল—রোজামুণ্ডকে, সেইসঙ্গে অলিভারকেও।

'গাল দিয়ে লাভ হবে না,' রূঢ় গলায় বলল রোজামুণ্ড, 'তুমি আসার আগেই অলিভার আমাকে আসল ঘটনা জানিয়ে দিয়ে গেছে।'

'ও! ব্যাটা তা হলে এরই মধ্যে তোকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছে!' বলল পিটার। 'আগেই বোঝা উচিত ছিল, তোকে জাদুটোনা করে রেখেছে লোকটা।'

'প্লিজ, পিটার... ওভাবে বোলো না,' অনুনয় করল রোজামুণ্ড। 'সার জনের অমঙ্গল আমিও চাই না। ঘটনাটা শুনে খারাপ লেগেছে খুব। কিন্তু এ-ও সত্যি, অলিভারকে বাধ্য করা হয়েছে এমন পদক্ষেপ নিতে।'

'বাধ্য করা হয়েছে?' মুখ খিঁচিয়ে বলল পিটার। 'কাকে বাধ্য করা বলে, তা টের পাবে এবার। যদি ভেবে থাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেব ওকে...'

তাড়াতাড়ি ভাইয়ের হাত চেপে ধরল রোজামুণ্ড। নরম গলায় বোঝাতে চেষ্টা করল, রাগের মাথায় যেন বোকার মত কিছু না ঘটিয়ে বসে। অলিভারের হয়ে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করল, বোঝাতে চাইল—আজ যা ঘটেছে, তাতে ওর কোনও দোষ নেই।

'হাহ্! ওসব কথায় তুই ভুলতে পারিস, আমি না।' বলল পিটার। 'সার অলিভারকে খোলা বইয়ের মত পড়তে পারি আমি। আপাদমস্তক বদমাশ, মানুষের আবেগ নিয়ে খেলতে জানে।

প্রতিটা পদক্ষেপ নেয় হিসেব করে। আজ আমার গায়ে হাত তোলেনি, কারণ আমার কিছু হলে বিগড়ে যেতি তুই। কিছুতেই বিয়ে করতি না ওকে। তাই হামলা চালিয়েছে সার জনের উপরে... আমাকে শিক্ষা দেবার জন্য। ঝি-কে মেরে বউকে শেখানোর মত একটা ব্যাপার আর কী! কিন্তু ওসবে ভয় পাই না আমি; জেনে রাখিস, যদি সার জনের কিছু হয়...'

বেশ কিছুক্ষণ হম্বিতম্বি চালিয়ে গেল ও। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল রোজামুণ্ড। পিটারকে বোঝানোর চেষ্টা করে লাভ নেই কোনও। একটাই আশা, অলিভার তার কথা রাখবে। যা-ই করুক পিটার, তার প্রতিশোধ নেবে না। আসল সমস্যা ওর ভাইকে নিয়ে। যদি সত্যিই ভালমন্দ কিছু ঘটে যায় সার জনের, তা হলে ওকে সামলানো যাবে না। শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে, তা শুধু ঈশ্বরই বলতে পারেন!

মরলেন না সার জন কিলিগ্রু, সপ্তাহখানেক পড়ে রইলেন বিছানায়, তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তবে শরীর-স্বাস্থ্য শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেল—রক্তপাতের কুফল।

একটা সুফলও পাওয়া গেল এর ফলে। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসার পর আচার-আচরণে পরিবর্তন এল তাঁর। সবকিছু বিচার করতে পারলেন নিরপেক্ষভাবে। বুঝতে পারলেন, সত্যিই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন অলিভারের বিষয়ে। কেন করেছিলেন, তাও অনুধাবন করলেন। পিতার কারণে ভূলুণ্ঠিত পারিবারিক গৌরবকে আবার ফিরিয়ে আনতে শুরু করেছে তরুণ নাইট। স্প্যানিশ আর্মাডার সঙ্গে যুদ্ধে বীরোচিত ভূমিকা, সেইসঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনসম্পদ অর্জন করে আস্তে আস্তে আবার ও পুরনো আসনে বসিয়ে দিচ্ছে ট্রেসিলিয়ান নামটাকে।

এর ফলে কিলিগ্রু পরিবারের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব হতে চলেছে, সেটাই আসলে সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি। অন্যায় পথে চেষ্টা করছিলেন বীর নাইটকে কলঙ্কিত করতে। একদম উচিত হয়নি কাজটা।

মনে মনে নিজের ভুলত্রুটি স্বীকার করে নিলেও রোজামুণ্ডের জন্য অলিভারকে মোটেই উপযুক্ত পাত্র ভাবতে পারছেন না সার জন। র‍্যালফ ট্রেসিলিয়ানের স্মৃতি এখনও জ্বলজ্বল করছে তাঁর মনে—মদ্যপ, জুয়াড়ি ছিল লোকটা। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না, পিতার রক্তের সেই বাজে দোষগুলো বিসর্জন দিতে পারবে অলিভার। পরিবেশ-পরিস্থিতি বদলে গেলে তরুণ নাইটও হয়তো ও-পথেই পা বাড়াবে, ডেকে আনবে স্ত্রী আর পরিবারের জন্য দুর্দশা। জেনেশুনে রোজামুণ্ডকে এমন একটা ছেলের হাতে তুলে দেয়া যায় না।

সুস্থ হবার পর গডলফিন কোর্টে গেলেন সার জন। দুই ভাই-বোনের সামনে তুলে ধরলেন তাঁর এ-সব যুক্তি। বলা বাহুল্য, গলা চড়িয়ে একমত হলো পিটার। কিন্তু রোজামুণ্ড মেনে নিল না তাঁর কথা।

'আমি মানি না,' সোজাসাপ্টা ভাষায় জানিয়ে দিল ও। 'সার জন, পূর্বপুরুষের পাপের দায় সন্তান কেন ভোগ করবে?'

'অলিভারের বাবার ব্যাপারে তো জানো না...' বলতে চাইলেন সার জন।

'বাবার কথা শুনতে চাই না,' বাধা দিয়ে বলল রোজামুণ্ড। 'আপনি আমাকে ছেলের কথা বলুন।'

কাঁধ ঝাঁকালেন সার জন। 'একরোখা স্বভাবের ছেলে অলিভার, ঠিক ওর বাবার মত। বাপের বাকি বদভ্যাসগুলোও রপ্ত করে কি না, সেটা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে

আমাদেরকে।'

'কতদিন অপেক্ষা করবেন? ও কবরে যাওয়া পর্যন্ত? তার আগে তো নিশ্চিত হবার উপায় নেই, আমার জন্য ও সঠিক পাত্র কি না!'

'ঠাট্টা করছ?' একটু যেন রুষ্ট হলেন সার জন।

'ঠাট্টা না,' রোজামুণ্ড বলল, 'আপনার বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিচ্ছি।'

'বেশ, তা হলে এখন পর্যন্ত যতটা প্রকাশ পেয়েছে অলিভারের স্বভাব-চরিত্র, তার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেব আমরা।'

'সেক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পাচ্ছে। আমি জানি, অলিভারকে আপনি দু'চোখে দেখতে পারেন না।'

'দৃষ্টিভঙ্গিটা কেবল আমার নয়। দুনিয়া ওকে কী চোখে দেখছে, সেটাই বড় কথা।'

'অন্যের মতামত নিয়ে কেন মাথা ঘামাব আমি, বলতে পারেন? ওরা অলিভারকে কী চোখে দেখছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; আমি ওকে কীভাবে দেখছি, সেটাই আসল কথা। আপনারা সারাক্ষণই দুর্নাম করে বেড়াচ্ছেন ওর, কিন্তু আমি কোনোদিন অলিভারের মধ্যে খারাপ কিছু দেখতে পাইনি।'

'এখনও তো দূরে দূরে আছ, তাই টের পাচ্ছ না কিছু। আমি চাই না বিয়ের পরে তোমার হৃদয় ভেঙে যাক।'

'ভাঙলে ভাঙুক। ওকে আমি ভালবাসি, বিয়ে করতে চাই। লোকের কথায় নিজের প্রেমকে বিসর্জন দিতে পারব না।'

বিরক্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন সার জন, চলে গেলেন জানালার কাছে। পিছন থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরল রোজামুণ্ড, ঠিক যেভাবে বাবাকে জড়িয়ে ধরে মেয়ে। গত দশ বছরে পিতা-কন্যার মতই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওদের ভিতর।

'কী চাও?' রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করলেন সার জন।

হাসল রোজামুণ্ড। 'আপনার অবস্থা দেখে মায়া লাগছে। একটা মেয়ের সঙ্গে যুক্তিতে পেরে উঠছেন না!'

'যুক্তি না,' ঘুরে দাঁড়ালেন সার জন। 'পেরে উঠছি না তোমার গোঁয়ার্তুমির সঙ্গে। চোখে ঠুলি পরে বসে আছ, কিছুই দেখতে চাইছ না।'

'আপনি কিন্তু কিছুই দেখাচ্ছেন না আমাকে, সার জন,' রোজামুণ্ড বলল। 'শুধু বলছেন ধারণার কথা... আশঙ্কার কথা। অলিভারের শরীরে দূষিত রক্ত বইছে, ও খারাপ পথে চলে যেতে পারে... এ-সবই হলো মুখের কথা। একটা প্রমাণও কি আছে আপনার হাতে? স্বীকার করতে দোষ নেই, আমার মঙ্গলের জন্য বলছেন এসব; তাই বলে কথাগুলো যুক্তিসঙ্গত নয়। প্লিজ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করুন ব্যাপারটা। একটা... শুধু একটা উদাহরণ দেখান অলিভারের কুকীর্তির। প্রমাণ করে দিন, আপনার ধারণা আর বাস্তবতার মধ্যে মিল কতখানি।'

মুখের ভাষা হারালেন সার জন। চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারলেন না। শেষে হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। 'নাহ্, তোমার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা আমার কম্মো নয়। স্বীকার করছি, পরিস্থিতির বিচারে এ-মুহূর্তে সার অলিভার একজন সুপাত্রই বটে!'

তাঁর গালে চুমো খেল রোজামুণ্ড। 'সত্যি কথা বলবার জন্য ধন্যবাদ। এখন আপনি কী করবেন?'

'আমার দায়িত্ব পালন করব।' বলে গডলফিন কোর্ট থেকে বেরিয়ে এলেন সার জন। চলে গেলেন পেনারো হাউসে। অলিভারের সঙ্গে দেখা করে দুঃখ প্রকাশ করলেন তাঁর অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য। প্রস্তাব দিলেন শত্রুতা মিটিয়ে ফেলবার।

যথার্থ ভদ্রলোকের মত আচরণ করল অলিভার, রাগ আর

ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলে হাত মেলাল সার জনের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতেই বেঁকে বসলেন তিনি। জানিয়ে দিলেন, আজকের এই সাক্ষাৎ-টাকে তাঁর সম্মতি ভেবে বসবার কিছু নেই। এখনও তিনি রোজামুণ্ডের সঙ্গে অলিভারের বিয়ের ব্যাপারে রাজি নন।

'আমি বাধা দেব না এ-বিয়েতে,' বললেন তিনি, 'কিন্তু সমর্থনও জানাব না। বয়স হোক রোজামুণ্ডের, তারপর ওর ভাই-ই নেবে সিদ্ধান্ত। একটা ব্যাপারে শুধু নিশ্চয়তা দিতে পারি, পিটারকে কোনোভাবে প্রভাবিত করব না আমি।'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল অলিভার। 'আশা করি ইতিবাচক সিদ্ধান্তই নেবে ও। না নিলেও ক্ষতি নেই। থাক সে-কথা, স্পষ্টবাদিতার জন্য ধন্যবাদ, সার জন। ভাবতে ভাল লাগছে যে, বন্ধু না হলেও আপনি অন্তত আমার শত্রু নন।'

ওর সঙ্গে আরেক দফা করমর্দন করে বিদায় নিলেন সার জন।

সার জনের নিরপেক্ষ আচরণের কোনও প্রভাব পড়ল না পিটার গডলফিনের উপর। দিনে দিনে সে বরং আরও বৈরি হয়ে উঠল অলিভারের প্রতি। তবে সেটা নিয়ে চিন্তিত হলো না তরুণ নাইট। বছরখানেক সময় আছে হাতে, সময়-সুযোগমত ছেলেটার মন জয় করবার চেষ্টা চালানো যাবে। আপাতত ওর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে ওকে।

লায়োনেল বলতে গেলে রোজই মালপাসে আসা-যাওয়া করছে... এবং তার পিছনের কারণটাও জানে অলিভার। খারাপ স্বভাবের এক মেয়েলোক থাকে ওখানে, উঠতি যুবকদের জালে ফাঁসানোই তার পেশা। ওদের কাছ থেকে পয়সাকড়ি হাতিয়ে আয়েশ করে বেড়ায়। মেয়েটার ব্যাপারে কয়েকবারই ভাইকে

সতর্ক করে দিয়েছে অলিভার, কিন্তু লাভ হয়নি। কিছু বলতে গেলে খেপে যায়, শুরু করে দুর্ব্যবহার। উপায়ান্তর না দেখে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে তরুণ নাইট, দূর থেকে লক্ষ রাখছে লায়োনেলের উপর, প্রথম সুযোগেই ওকে মুক্ত করবে মেয়েটার কবল থেকে।

এরই মাঝে শরৎ পেরিয়ে শীতকাল এল। বিরূপ আবহাওয়ার কারণে দেখা-সাক্ষাৎ কমে এল অলিভার আর রোজামুণ্ডের। ভারী তুষারপাত আর ঝোড়ো বাতাসের কারণে ঘর থেকে বেরুনোই দায়, দেখা করবে কীভাবে? গডলফিন কোর্টে গিয়ে প্রেমিকাকে দেখবার ইচ্ছে জাগে অলিভারের মনে, কিন্তু গলা টিপে মারে সে-ইচ্ছেকে। ওখানে যাওয়া মানেই সেধে পিটারের সঙ্গে ঝগড়া বাধানো। শত্রুতা বেড়ে যাবে আরও। কদাচিৎ রাস্তাঘাটে দেখা মেলে ছেলেটার, তখন চরম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় সে। সামান্য সৌজন্যও প্রদর্শন করে না। ওর বাড়িতে গেলে আগুনে ঘি ঢালা হবে। তাই কী আর করা, বিচ্ছেদের কষ্ট সহ্য করে নিঃসঙ্গ সময় কাটাতে থাকল তরুণ নাইট।

আশার কথা একটাই—প্রতিদিনই কমছে প্রতীক্ষার প্রহর, ঘনিয়ে আসছে রোজামুণ্ডের আঠারোতম জন্মদিন। খুব শীঘ্রি পেনারো হাউসে পা পড়বে নতুন এক বধূর। এর জন্যে যত পরীক্ষাই দিতে হোক না কেন, তার জন্য প্রস্তুত অলিভার। দুঃখের পরে সুখ আসে—এ তো চিরন্তন সত্য। কিন্তু সবকিছুর পরেও কেন যেন নিশ্চিন্ত হতে পারে না ও। কেবলই মনে হয় একটা কালো মেঘ ঝুলছে ওর ভাগ্যাকাশে, যে-কোনও মুহূর্তে তা নেমে আসবে কালবৈশাখীর মত, তছনছ করে দেবে সব। তরুণ নাইটের জানা নেই, এই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে।

এক দিন, ক্রিসমাসের তখনও এক সপ্তাহ বাকি, ছোট্ট একটা

কাজে হেলস্টন গেল অলিভার। আগের সপ্তাহের অর্ধেকটা জুড়ে চলেছে তুষারঝড়, গৃহবন্দির মত কাটাতে হয়েছে ওকে। রাস্তায় নেমে দেখল, পুরো এলাকা ঢাকা পড়ে গেছে কয়েক ফুট বরফের তলায়। সকালে রওনা হলো ও, কাজ সেরে আবার বিকেল নাগাদ ধরল বাড়ির পথ। কিন্তু হেলস্টন ছেড়ে মাইলদুয়েক আসতেই খোঁড়াতে শুরু করল ওর ঘোড়া, এক পায়ের নাল খুলে গেছে ওটার।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল অলিভার, লাগাম ধরে হাঁটতে শুরু করল। যতক্ষণ না কোনও কামারশালা পাচ্ছে, এভাবেই এগোতে হবে ওকে। খুব একটা খারাপ লাগল না অবশ্য হাঁটতে। বিকেলের সূর্যের তির্যক কিরণ প্রতিফলিত হচ্ছে বরফে ছাওয়া প্রকৃতির গায়ে, সৃষ্টি করেছে মোহনীয় পরিবেশ। আনমনে একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে হাঁটতে থাকল ও।

আধঘণ্টা পরে স্মিথিক গাঁয়ে পৌঁছুল অলিভার, সরাসরি চলে গেল ওখানকার কামারশালায়। স্থানীয় লোকজন জটলা করছে উঠানে। ওর জানা আছে, গাঁয়ে কোনও সরাইখানা না থাকায় এখানেই নিয়মিত আড্ডা দেয় তারা। কয়েকজন সওদাগরও আছে, বিশ্রাম নেবার জন্য থেমেছে; কাছেই পিঠভর্তি মালামাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওদের গাধার পাল। ভিড়ের মধ্যে পরিচিত দু'জন মানুষও পেয়ে গেল অলিভার। সার অ্যাণ্ড্রু ফ্ল্যাক—পেনরিনের যাজক; এবং মাস্টার গ্রেগরি বেইন—ট্রুরো গাঁয়ের বিচারক। কামারকে ডেকে ঘোড়ার নাল লাগাতে দিয়ে ওঁদের সঙ্গে গল্পে মেতে উঠল অলিভার।

মন্দ কপাল বলতে হবে... একটু পরেই আরওয়েনাকের দিককার পাহাড়ি ঢাল ধরে ওখানে হাজির হলো পিটার গডলফিন। সার জনের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজের দাওয়াত ছিল, ওখান থেকে

ফিরছে। মদ গিলেছে ইচ্ছেমত, মাথা এলোমেলো। কামারশালায় কোনও কাজ নেই, তারপরেও দূর থেকে অলিভারকে দেখতে পেয়ে ঘোড়ার রাশ টানল। স্যাডল থেকে নেমে টলতে টলতে এগিয়ে গেল সেদিকে। ওকে দেখতে পেয়েই প্রমাদ গুনল অলিভার, কিন্তু চেহারায় উদ্বেগ ফুটতে দিল না। গল্প করতে থাকল সার অ্যাণ্ড্রু আর মাস্টার বেইনের সঙ্গে।

ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল পিটার। অভিবাদন জানানোর ধার ধারল না। জড়ানো গলায় অলিভারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আরওয়েনাক থেকে আসছি আমি। এতক্ষণ আপনাকে নিয়েই ওখানে কথা হচ্ছিল।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওকে দেখে নিল অলিভার—দু'চোখ টকটকে লাল হয়ে আছে। চাহনিতে গোলমালের আভাস। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি ফোটাল ও। বলল, 'খুব ভাল। আলোচনার জন্য এরচেয়ে ভাল বিষয় আর কিছু হতে পারে না।'

'তা তো বটেই। বড়ই মুখরোচক বিষয়—আপনি আর আপনার চরিত্রহীন বাপ!'

'একই কথা আমি তোমার বাবার ব্যাপারে বলতে পারি,' শান্ত গলায় বলল অলিভার।

উঠানে জড়ো হওয়া লোকজনের মনোযোগ এখন ওদের দিকে; কথাটা শোনামাত্র উচ্চস্বরে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল পিটার। হাতে ঘোড়ার চাবুক ছিল, সেটা সজোরে ঘোরাল অলিভারের দিকে। অপ্রত্যাশিত আঘাত, ঠেকানার আগেই তরুণ নাইটের গালে পড়ল চাবুকের বাড়ি, চামড়া কেটে গেল অনেকখানি। দরদর করে বেরিয়ে এল রক্ত।

থমকে গেল দর্শকরা। উঠানে নেমে এল পিনপতন নীরবতা। গালের রক্ত মুছল অলিভার, চেহারায় দানা বাঁধতে শুরু করেছে

ক্রোধ। এখুনি বুঝি বিস্ফোরণ ঘটে! কিন্তু না, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখল ও। কিচ্ছু করল না, শুধু অগ্নিদৃষ্টি হানল পিটারের দিকে।

'মাস্টার গডলফিন!' হাহাকারের সুরে বলে উঠলেন যাজক। 'এ কী করেছেন আপনি?'

'ঠিকই করেছি,' খ্যাপাটে গলায় বলল পিটার। 'কুত্তাটা ওর নোংরা মুখে আমার বাবাকে অপমান করেছে! না, এখানেই শেষ নয় এর। আজ একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব!'

'ভাল চান তো চলে যান এখান থেকে, মাস্টার গডলফিন,' বললেন যাজক। 'আমি মিনতি করছি!'

'যাব না আমি,' বলল পিটার। 'কী, সার অলিভার, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আজ আর দোষ চাপাতে পারবেন না সার জনের উপরে। প্রতিশোধ নিতে চাইলে আমার উপরেই নিতে হবে। আসুন, আমি তৈরি।'

নড়ল না অলিভার। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পিটারের দিকে। শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে উঁচু গলায় হেসে উঠল পিটার। বলল, 'ও! লোকের সামনে লড়তে ভয় পাচ্ছেন? কোনও অসুবিধে নেই। ওরা চলে গেলেই নাহয় আসুন। আমি অপেক্ষা করব।'

হাসতে হাসতে নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়ল ও। লাগাম টেনে মুখ ঘোরাল বাহনের। সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল অলিভারের। ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে এগোতে গেল, কিন্তু দু'পাশ থেকে ওকে ধরে ফেললেন সার অ্যাণ্ড্রু আর মাস্টার বেইন।

'যেতে দিন,' বললেন বেইন। 'বদ্ধ মাতাল... কী করছে, তা নিজেও জানে না।'

ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল অলিভার, সরে এল তাঁদের কাছ থেকে।

'কী মনে হয় আপনার?' পিটারের অপসৃয়মাণ অবয়বের দিকে তাকিয়ে সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলেন যাজক। 'এখানেই ব্যাপারটা চুকে-বুকে যাবে?'

'অসম্ভব!' মাথা নাড়লেন মাস্টার বেইন। 'এই কামারশালায় নতুন একটা তলোয়ার তৈরি হলো আজ—শত্রুতার তলোয়ার! কারও না কারও রক্তে ভিজবে ওটার ফলা... আমি নিশ্চিত।'

চার

খুন

নাল লাগানো হয়ে যেতেই ঝটপট ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল অলিভার, পিটার যে-দিকে গেছে, সে-দিকেই ছোটাল নিজের বাহনকে। চেহারায় খুনের নেশা ভর করেছে, প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হবে না। ওর পিছু নিতে চাইলেন সার অ্যান্ড্রু, খারাপ কিছু ঘটে যাবার আগেই তরুণ নাইটকে নিরস্ত করবার ইচ্ছে; কিন্তু কিছুতেই তাঁর সঙ্গী হতে রাজি হলেন না মাস্টার বেইন। ট্রেসিলিয়ানদের বদমেজাজের ব্যাপারে জানা আছে তাঁর, বাধা দিতে গিয়ে নিজেকেই না জখম হতে হয়! সোজাসাপ্টা ভাষায় জানিয়ে দিলেন, খাল কেটে কুমির ডেকে এনেছে পিটার গডলফিন; তাকেই সামলাতে হবে বিপদ। খামোকা তার ভিতরে নাক গলিয়ে ঝামেলায় জড়াবার মানে হয় না। ভদ্রলোকের

এ-কথা শুনে দমে গেলেন সার অ্যাণ্ড্রু-ও, সাহস পেলেন না একাকী অলিভারের পিছু নিতে।

নদীর ধার ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে তখন ঘোড়া ছোটাচ্ছে তরুণ নাইট। প্রতিহিংসার চিন্তা ছাড়া আর কিছু মাথায় নেই। সবার সামনে ওকে আঘাত করেছে পিটার, তার উপযুক্ত জবাব দিতে না পারলে আর মান থাকবে না ওর। চুপচাপ যদি মেনে নেয় ব্যাপারটা, লোকে ওকে কাপুরুষ বলবে। কপাল ভাল পিটারের, ঘোড়ার নাল লাগাতে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে অলিভারের, সহসা ওর নাগাল পেল না। পেলে কী ঘটত বলা যায় না।

যত সময় গেল, ততই উত্তেজনা কমতে থাকল অলিভারের—মানুষের স্বভাবই তাই। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে এল চিন্তা-ভাবনা। খতিয়ে দেখতে শুরু করল সবকিছু। মনে পড়ে গেল রোজামুণ্ডকে দেয়া প্রতিশ্রুতি। পিটারের কোনও ক্ষতি করবে না বলে কথা দিয়েছে ও। তা হলে কী করতে চলেছে এখন? কী লাভ হবে প্রতিশোধ নিয়ে? অর্বাচীন এক যুবককে হয়তো শায়েস্তা করা হবে তাতে, লোকের সামনে বাহাদুরি দেখানো যাবে... কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ তো তার চেয়ে অনেক বেশি! রোজামুণ্ড ওর উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলবে, এমনকী দূরেও সরিয়ে নিতে পারে নিজেকে। লোকের ক্ষণিক হাসিঠাট্টার চেয়ে ওটা কি অনেক বড় ঝুঁকি নয়?

ভাবতে ভাবতে শান্ত হয়ে এল অলিভার। আপাতত মাফ করে দিল পিটারকে। ওর সঙ্গে পরে কখনও বোঝাপড়া করা যাবে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ও, একটা ফেরি ধরে নদী পার হলো, ছোট এক পাহাড়ের নির্জন ঢাল ধরে বাড়ির পথে চলল। এ-পথে সাধারণত চলাচল করে না অলিভার; যেখানেই যাক, ট্রেফুসিস পয়েন্ট হয়ে গডলফিন কোর্টের সামনে দিয়ে যায়। রোজামুণ্ডকে

দেখা না যাক, তার আবাসের দিকে তাকিয়ে মনকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু আজ ওদিকে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। পিটারের সঙ্গে যদি আবার দেখা হয়ে যায়, নিজেকে হয়তো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। তারচেয়ে জায়গাটা এড়িয়ে চলাই ভাল। আজ যা ঘটেছে, সেটা নাহয় চিঠি লিখে জানিয়ে দেবে রোজামুণ্ডকে। ও বুঝতে পারবে, কতটা ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে অলিভার।

বাড়ি পৌঁছে নিজেই ঘোড়াকে আস্তাবলে ঢোকাল অলিভার। দু'জন সহিস আছে ওর, কিন্তু এ-মুহূর্তে তারা কাজ করছে না। একজন অসুস্থ, অন্যজনকে ছুটি দিয়েছে পরিবারের সঙ্গে বড়দিন উদ্‌যাপনের জন্য। ঘোড়া রেখে বাড়িতে ঢুকল ও, ডাইনিং হলে গিয়ে দেখল, ইতোমধ্যে নৈশভোজ সাজিয়ে রেখেছে নিকোলাস। ফায়ারপ্লেসে জ্বালিয়ে দিয়েছে আগুন, আরামদায়ক উষ্ণতা বিরাজ করছে বিশাল কামরাটায়। কাঁপা কাঁপা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দেয়ালে ঝোলানো ট্যাপেস্ট্রি আর ওর পূর্বপুরুষদের পোর্ট্রেটগুলো।

মনিবের পায়ের আওয়াজ শুনে মোমবাতি হাতে হাজির হলো নিকোলাস। 'ফিরতে অনেক দেরি করে ফেললেন, সার অলিভার,' বলল সে। 'অবশ্য, মাস্টার লায়োনেলও ফেরেননি এখনও।'

বিরক্তিতে মুখ বাঁকাল অলিভার। নিশ্চয়ই আবার মালপাসে গেছে লায়োনেল... ওই মেয়েটার কাছে। কোট আর হ্যাট খুলে ফেলল ও, ফায়ারপ্লেসের পাশে একটা চেয়ারে বসল। নিকোলাস এগিয়ে এল মনিবকে বুট খোলায় সাহায্য করতে।

'আশা করি শীঘ্রি এসে যাবে লায়োনেল,' বলল অলিভার। 'আমাকে একটা ড্রিঙ্ক দাও, নিকোলাস।'

'জী, এখুনি আনছি,' বলে উঠে দাঁড়াল নিকোলাস। ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার গালে কী হয়েছে?'

আনমনে একটা হাত তুলল অলিভার, স্পর্শ করল ক্ষতটা। খুব বড় নয় ওটা, রক্ত শুকিয়ে গেছে ইতোমধ্যে, সেরে যাবে দু'চারদিনের মধ্যে।

'কিছু না,' বলল ও। 'ড্রিঙ্ক আনো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল নিকোলাস, মদের বোতল আর গ্লাস নিয়ে ফিরে এল একটু পর। ততক্ষণে অলিভার টেবিলে গিয়ে বসেছে। ওকে মদ পরিবেশন করল ভৃত্য। অসুস্থ সহিসের কথা জানতে চাইল অলিভার, নিকোলাস জানাল—তার অবস্থা উন্নতির দিকে।

'একটু মদ ওকেও দিয়ে এসো,' অলিভার বলল। 'গা গরম হলে চাঙা বোধ করবে।'

'জী, সার,' সায় দিল নিকোলাস।

এমন সময় বাইরে থেকে ভেসে এল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

'মাস্টার লায়োনেল এলেন বুঝি!' বলল নিকোলাস।

'আসুক,' নিস্পৃহ গলায় বলল অলিভার। 'তোমার এখানে থাকবার দরকার নেই। খাবার-দাবার তো টেবিলেই আছে, আমরা নিজেরাই নিয়ে নিতে পারব। যাও, টমের কাছে যাও।' সহিসের কাছে তাকে পাঠিয়ে দিল ও।

নিকোলাস চলে গেলে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল অলিভারের। ভাইকে কড়া কয়েকটা কথা শোনাবে বলে ঠিক করেছে। যথেষ্ট সহ্য করেছে ওর উচ্ছৃঙ্খলতা, আর না।

একটু পরেই ত্রস্ত পদশব্দ হলো, তারপর ঝট্ করে খুলে গেল ডাইনিং হলের দরজা। সেদিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়ে থমকে গেল তরুণ নাইট। এমন দৃশ্য আশা করেনি। নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে গেল ও, বিস্ফারিত হলো দৃষ্টি।

লায়োনেলকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ঝড় বয়ে গেছে তার উপর দিয়ে। পোশাক-আশাক আর চুল অবিন্যস্ত। চেহারা ফ্যাকাসে, মুখ থেকে সরে গেছে রক্ত। একটা হাতের দস্তানা খুলে পড়ে গেছে, হাতটা রক্তে ভেজা। পোশাকের একপাশেও বিশাল এক কালচে-খয়েরি ছোপ।

'হা ঈশ্বর!' আঁতকে উঠল অলিভার। ছুটে গেল ভাইয়ের কাছে। 'এ কী হয়েছে, লায়োনেল! কে করেছে এসব?'

তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করল লায়োনেল। ঘুরে মুখোমুখি হলো বড় ভাইয়ের। দুর্বল একটা হাসি হেসে বলল, 'পিটার গডলফিন।'

'কী!' চমকে উঠল অলিভার। বদমাশটা তা হলে লায়োনেলের পিছনেও লেগেছে? ভীষণ রাগ হলো ওর, বাড়াবাড়ির একটা সীমা থাকা উচিত। নিজের মান-অপমান সহ্য করা যায়, কিন্তু ভাইয়ের গায়ে হাত তুললে সেটা বরদাশত্ করা মুশকিল।

কাঁপা কাঁপা পদক্ষেপে ফায়ারপ্লেসের কাছে এগিয়ে গেল লায়োনেল। ধপ্ করে বসে পড়ল অলিভারের চেয়ারে। ওর পিছু পিছু এল তরুণ নাইট।

'তুমি কি আহত?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল অলিভার। 'বেশি জখম হওনি তো?'

'না,' মাথা নাড়ল লায়োনেল। 'সামান্য কাটাছেঁড়া। ভয় পাবার কিছু নেই। তবে রক্ত পড়েছে অনেক। বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুতে পারব কি না, সেটাই ছিল দুশ্চিন্তা। এসে যখন পড়েছি, আর ভাবনা নেই।'

'দেখতে দাও আমাকে।' হাঁটু গেড়ে ওর সামনে বসে পড়ল অলিভার। নিজের ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল লায়োনেলের কোর্তা, ভাল করে দেখল আঘাতের অবস্থা। গভীর ক্ষত হয়েছে, তবে গুরুতর নয়। রক্তপাতও কমে এসেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল

ও।

'বলেছিলাম না?' ভুরু নাচাল ল্যায়োনেল। 'আমাকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। পিটারের অবস্থায় এরচেয়ে অনেক খারাপ।'

উঠে দাঁড়িয়ে ভাইয়ের মুখোমুখি হলো অলিভার। থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে ঘটল এসব?'

একটু জড়োসড়ো হয়ে গেল লায়োনেল। বলল, 'আমার কোনও দোষ নেই। বাড়ি ফিরছি, এমন সময় পথে দেখা হয়ে গেল পিটারের সঙ্গে। আমি কিচ্ছু করিনি, ও-ই গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে এল। এমন সব নোংরা কথা বলতে শুরু করল যে, আত্মসচেতন একজন মানুষের পক্ষে সেসব সহ্য করা অসম্ভব...'

'থাক, পরে শুনব ওসব,' বাধা দিল অলিভার। 'আগে তোমার ক্ষতের পরিচর্যা দরকার।'

'নিকোলাসকে ডেকো না,' তাড়াতাড়ি বলল লায়োনেল।

ভুরু কুঁচকে গেল অলিভারের। 'কেন?'

'ইয়ে...' ইতস্তত করল লায়োনেল, 'ব্যাপারটা যত কম জানাজানি হয়, ততই ভাল। অন্ধকারে লড়েছি আমরা, আশপাশে কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না। যা ঘটেছে, তার কোনও সাক্ষী নেই...'

'হেঁয়ালি কোরো না, লায়োনেল!' কড়া গলায় বলল অলিভার। 'যা বলার সরাসরি বলো। লড়াই করেছ তোমরা, দু'জনেই আহত হয়েছ... সাক্ষীর প্রশ্ন আসছে কেন?'

'পিটার আহত নয়, অলিভার,' নিচুকণ্ঠে বলল লায়োনেল। 'নিহত!'

বজ্রাহতের মত স্থির হয়ে গেল অলিভার। কী শুনছে ও! পিটার মারা গেছে?

'বোঝার চেষ্টা করো, অলিভার!' অনুনয় করল লায়োনেল।

'আর কোনও বিকল্প ছিল না আমার হাতে। বদ্ধ মাতাল ছিল পিটার, তলোয়ার বের করে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমি প্রথম লড়তে চাইনি, তখন শুরু করল গালাগাল। কাপুরুষ বলল আমাকে, বলল লড়াই না করলে তলোয়ারের ফলা দিয়ে পিটিয়ে পাছা লাল করে দেবে... এসবের পর আর চুপ করে থাকা যায়, বলো? তলোয়ার বের করতে বাধ্য হয়েছি আমি, কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী—ওকে খুন করার কোনও ইচ্ছে ছিল না আমার মনে। ওটা ঘটনাচক্রে হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল অলিভার। পাশ ফিরে চলে গেল কামরার একপ্রান্তে, ওখানে একটা লোহার বেসিন আছে। এক টুকরো কাপড় ভিজিয়ে ফিরে এল ভাইয়ের কাছে, পরিষ্কার করতে শুরু করল ওর পাঁজরের পাশের ক্ষত। মুখে কিচ্ছু বলছে না, মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে নানা ধরনের চিন্তা। খুব একটা দোষারোপ করতে পারছে না লায়োনেলকে। বিকেলে তো নিজ চোখেই দেখেছে পিটার গডলফিনের অবস্থা। অলিভারের গালে চাবুক মেরেছে... এরপর লায়োনেলের উপরে তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। সমস্যা শুধু রোজামুণ্ডকে নিয়ে—এই ঘটনায় ও কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাবে, সেটা নিয়ে শঙ্কিত অলিভার। সন্দেহ নেই, বড় ধরনের একটা ঝামেলার সূচনা হয়েছে।

টেবিল থেকে বড় বড় কয়েকটা হাত-মুখ মোছার রুমাল নিয়ে এল ও। সেগুলো ফালি ফালি করে বেঁধে দিল লায়োনেলের আঘাতগুলো। তারপর জানালা খুলে বাইরে ফেলে দিল রক্ত-মেশা পানি। যে-কাপড়গুলো দিয়ে ক্ষত পরিষ্কার করেছে, সেগুলো ছুঁড়ে দিল ফায়ারপ্লেসের আগুনে। নিকোলাসের চোখে কিছু পড়তে দেয়া যাবে না। না, একান্ত ভৃত্যের বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনও সন্দেহ

সেই ওর মনে, তাই বলে ওকে মিথ্যে বলতে বাধ্য করা সাজে না। কারণ অলিভার পরিষ্কার বুঝতে পারছে—যতই যুক্তি দেখাক লায়োনেল, সাক্ষী না থাকায় ওকে পিটারের খুনের দায়ে ফাঁসতে হবে।

লায়োনেলের জন্য নতুন জামাকাপড় আনার জন্য একটু পর ডাইনিং হল থেকে বেরুল অলিভার। সিঁড়ির দিকে এগোতেই নিকোলাসের দেখা পেল—ফিরে আসছে সে অসুস্থ সহিসের কামরা থেকে। ওকে থামিয়ে ছেলেটার খোঁজখবর নিল অলিভার, তারপর অন্য একটা কাজ দিয়ে নিকোলাসকে পাঠিয়ে দিল আরেকদিকে। এর ফলে বেশ কিছুক্ষণ সে ডাইনিং হলে ফিরতে পারবে না।

জামাকাপড় নিয়ে খানিক পর আবার ভাইয়ের কাছে ফিরল অলিভার। ওগুলো পরতে সাহায্য করল তাকে। রক্তে ভেজা পোশাকগুলো টুকরো টুকরো করে ফায়ারপ্লেসে পোড়াল। বেশ কিছুটা সময় পর নিকোলাস যখন ডাইনিং হলে ঢুকল, তখন দু'ভাই টেবিলে বসে নৈশভোজ সারছে। কী ঘটে গেছে, তা বোঝার উপায় নেই।

লায়োনেলের ফ্যাকাসে চেহারা খেয়াল করল না ভৃত্য, শুধু জানতে চাইল, ওদের কিছু লাগবে কি না। নেতিবাচক জবাব দিয়ে তাকে রাতের মত ছুটি দিল অলিভার। মাথা নুইয়ে চলে গেল নিকোলাস।

খাওয়া মুখে রুচছে না দুই ভাইয়ের। রুচবার কথাও নয়। ব্যথায় বার বার মুখ কোঁচকাল লায়োনেল, তা চাপা দেবার জন্য ঘন ঘন চুমুক দিল মদে। ব্যাপারটা কিছুক্ষণ অগ্রাহ্য করল অলিভার, শেষে বলতে বাধ্য হলো—এত মদ গেলা উচিত হচ্ছে না ওর। কাঁধ ঝাঁকাল লায়োনেল তা শুনে।

খাওয়া শেষে টেবিল ছাড়ল অলিভার। ম্যান্টেলশেলফের কাছে গিয়ে পাইপ আর তামাকের কৌটা নিল, তারপর ফিরে এল নিজের আসনে। পাইপ ধরিয়ে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল ও, তারপর প্রশ্ন ছুঁড়ল ভাইয়ের দিকে।

'কী নিয়ে ঝগড়া ছিল তোমাদের?'

'কী?' একটু যেন থতমত খেয়ে গেল লায়োনেল। ঢোক গিলে বলল, 'না... ঝগড়া তো ছিল না কোনও। কেন যে আমার উপর হামলা করে বসল...'

'মিথ্যে বোলো না, লায়োনেল,' জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলল অলিভার। 'আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। কিছু একটা তো হয়েছিল বটেই! সব খুলে বলো আমাকে।'

দ্বিধা ফুটল লায়োনেলের চেহারায়, যেন কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারছে না। চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর বুঝতে পারল—ভাইয়ের কাছে কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখলে তারই ক্ষতি। এ-মুহূর্তে অলিভারই ওর একমাত্র আশ্রয়স্থল। ও ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না তাকে।

'ইয়ে... মালপাসের মেয়েটাই সমস্ত নষ্টের গোড়া,' আমতা আমতা করে বলল লায়োনেল। অলিভারের চোখ জ্বলে উঠেছে দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'ওকে অন্যরকম ভেবেছিলাম আমি... বোকামি করেছিলাম।' কণ্ঠ আটকে গেল উদ্গত আবেগে। 'ভালবেসে ফেলেছিলাম ওকে, বিয়ে করব বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু...'

'তা-ই?' চরম বিদ্রূপ প্রকাশ পেল অলিভারের কণ্ঠে।

'ভাল মেয়ে ভাবতাম ওকে... অবশ্য, এখনও খারাপ বলতে পারছি না। মনে হয় না ওর কোনও দোষ আছে। বদমাশ গডলফিন-ই ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছে। যতদিন না ও

আমাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে, ততদিন কোনও সমস্যা ছিল না। সব ঠিকঠাকই ছিল...'

'হুম,' বলল অলিভার, 'আর কিছু না হোক, পিটার একটা উপকার করে দিয়ে গেছে। মেয়েটার সত্যিকার রূপ দেখিয়ে দিয়েছে তোমাকে। ওর ব্যাপারে বহু আগেই আমি তোমাকে সতর্ক করেছি, লায়োনেল।'

'আমার সে-সব বিশ্বাস হয়নি...'

'হওয়া উচিত ছিল! কী মনে হয় তোমার, খামোকাই একটা মেয়ের নামে বাজে কথা বলেছি? তোমার ভাই কি সে-ধরনের মানুষ?'

মাথা তুলল লায়োনেল। 'আমি এখনও জানি না কী বিশ্বাস করব। সন্দেহের দোলায় দুলছে আমার মন।'

'সন্দেহ দূর করো, লায়োনেল। আমার কথা মেনে নাও।' হাসল অলিভার। 'আচ্ছা! তলে তলে তা হলে এ-সব করে বেড়াত পিটার? ভণ্ডামি আর কাকে বলে! আসলেই... মানুষের চরিত্রের তল পাওয়া কঠিন।'

মুখে হাসি ফোটালেও তিক্ততায় ভরে যাচ্ছে অন্তর। সার র‍্যালফ ট্রেসিলিয়ানের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে অনেক কথা শুনিয়েছে ওকে পিটার, তার উপযুক্ত একটা জবাব পেয়েছে বটে, কিন্তু এখন আর ছেলেটাকে শোনাবার উপায় নেই। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই, ওই মেয়েটা কতদূর জানে, লায়োনেল? ও কি আন্দাজ করতে পারবে, পিটারের মৃত্যুতে তোমার হাত আছে?'

'সম্ভবত,' মলিন মুখে বলল লায়োনেল। 'আজ পিটারকে নিয়ে ঝগড়া হয়েছে আমাদের মধ্যে। বেরুনোর সময় রাগের মাথায় বলে দিয়ে এসেছি, শয়তানটার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাচ্ছি।

সত্যি বলতে কী, গডলফিন কোর্টের দিকেই যাচ্ছিলাম আমি; পথে দেখা হয়ে গেছে পিটারের সঙ্গে।'

'তুমি আমাকে মিথ্যে বলেছ, লায়োনেল,' অভিযোগ ফুটল অলিভারের গলায়। 'তুমি তো বলেছ, ও-ই তোমার উপর হামলা করেছে!'

'আসলেই তা-ই,' জোর গলায় বলল লায়োনেল। 'যখন দেখা হলো ওর সঙ্গে, কথাই বলতে দেয়নি আমাকে। তলোয়ার বের করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমার উপর।'

'আমি নাহয় বিশ্বাস করলাম, কিন্তু লোকে তো করবে না,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল অলিভার। 'ওই মেয়েটা যদি মুখ খোলে...'

'খুলবে না,' বলল লায়োনেল। 'খুললে ওর-ই ক্ষতি।'

'হয়তো ঠিকই বলছ,' মাথা ঝাঁকাল অলিভার। 'যদি জানাজানি হয় যে, তোমাদের দুজনের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখছিল ও, তা হলে ঢি ঢি পড়ে যাবে পুরো এলাকায়। নিজের মান-সম্মান বাঁচাবার জন্যেই মুখ বন্ধ রাখতে হবে ওকে। তুমি নিশ্চিত, আর কেউ তোমাকে যেতে বা আসতে দেখেনি?'

'অবশ্যই!'

স্বস্তির সঙ্গে পাইপের ধোঁয়া ছাড়ল অলিভার। 'তা হলে আর ভয়ের কিছু নেই। চলো, এবার তোমার বিশ্রাম দরকার। আমি তোমাকে কামরায় পৌঁছে দিচ্ছি।'

পাইপ নামিয়ে ভাইকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল ও। দোতলার কামরায় নিয়ে গিয়ে সযত্নে শুইয়ে দিল বিছানায়। তারপর ফিরে এল নীচে। নতুন করে পাইপ ধরিয়ে বসল আগুনের সামনে, ডুবে গেল চিন্তার সাগরে।

হ্যাঁ, ভয়ের কিছু নেই—তবে সেটা লায়োনেলের জন্য; কারণ পিটারের খুনের সঙ্গে কেউ তাকে জড়াতে পারবে না। কিন্তু ওর

নিজের কী হবে? কীভাবে সহ্য করবে এমন একটা গোমর রক্ষার চাপ? একজন মানুষ খুন হয়েছে... হয়তো মৃত্যুই প্রাপ্য ছিল তার... তাই বলে তার পরিবারের কি অধিকার থাকবে না জানার—কেন, কীভাবে খুন হয়েছে সে? চাপটা আরও বড়, কারণ মানুষটা রোজামুণ্ডের ভাই। অলিভারের চেয়ে কোনও অংশে তাকে কম ভালবাসত না মেয়েটা, ঠিক যেভাবে লায়োনেলকে ভালবাসে ও নিজে। ভাই আর প্রেমিকার মধ্যকার দায়িত্ব নিয়ে টানাপড়েনে আক্রান্ত হলো তরুণ নাইট।

এক পর্যায়ে উঠে দাঁড়াল ও। শুরু করল পায়চারি। বিড়বিড় করে অভিশাপ দিল মালপাসের ওই দুশ্চরিত্রা মেয়েটিকে। তার জন্যেই এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এমনিতেই যথেষ্ট ঝামেলায় আছে অলিভার, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাড়তি উপদ্রব। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত, ভাইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না ও। তারমানে চুপ করে থাকতে হবে ওকে, ধোঁকা দিতে হবে রোজামুণ্ডকে। যতই কষ্ট হোক না কেন।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অলিভারের বুক চিরে। পাইপ নিভিয়ে নিজের কামরায় চলে গেল ও। শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমাতে পারল না। সারারাত এপাশ-ওপাশ করল বিছানায়।

পাঁচ

অপবাদ

সকালবেলা নিকোলাস নিয়ে এল খবরটা।

দু'ভাই তখন নাশতা করতে বসেছে। লায়োনেলের অবশ্য বিছানায় থাকা দরকার ছিল, তলোয়ারের আঘাত আর রক্তক্ষরণের ফলে জ্বর এসেছে ওর, কিন্তু কামরায় থাকার সাহস পায়নি। তাতে সন্দেহ জাগবে লোকের মনে। ভাইয়ের কাঁধে ভর দিয়ে ডাইনিং হলে নেমে এসেছে, একসঙ্গে বসেছে নাশতা সারতে। চেহারায় ফ্যাকাসে ভাব বেড়েছে, কিন্তু তা নিয়ে করবার কিছু নেই।

খাবার মুখে তুলতে না তুলতে ঝড়ের মত ডাইনিং হলে প্রবেশ করল নিকোলাস—উত্তেজিত অবস্থায়। কাঁপতে কাঁপতে শোনাল, কোথায়-কীভাবে পিটার গডলফিনের লাশ পাওয়া গেছে। কিন্তু শেষে যে-কথা যোগ করল, তা আরও ভয়ঙ্কর।

'সবাই বলছে, আপনি ওকে খুন করেছেন, সার অলিভার!'

'কী!' আঁতকে উঠল তরুণ নাইট। আচমকা টের পেল, বড্ড ভুল হয়ে গেছে—কাল রাতে এই সম্ভাবনাটা একবারও মাথায় খেলেনি ওর। 'এমন একটা মিথ্যে কথা কোথায় শুনলে তুমি?'

ও যা ভেবেছিল, সে-জবাবই পাওয়া গেল ভৃত্যের মুখ থেকে।

কামারশালার ঘটনা সবার মুখে মুখে ফিরছে। ওখান থেকে ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে অলিভার যে পিছু নিয়েছিল পিটারের, তার-ও সাক্ষীর অভাব নেই। দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছে সবাই। ধরে নিচ্ছে, তরুণ গডলফিনকে খুন করে অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে ও।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল অলিভার। রোজামুণ্ডের মাথায় এ-ধারণা বদ্ধমূল হবার আগেই ভাঙাতে হবে ওকে। ইতোমধ্যে দেরি হয়ে গেছে কি না কে জানে।

দ্রুত পোশাক পাল্টে নিল ও। আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে ছুটল গডলফিন কোর্টের দিকে। ওখানে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। সদর ফটকে কেউ অভ্যর্থনা জানাল না ওকে। আঙিনায় ঢুকে দেখতে পেল দাস-দাসীদের একটা ছোট জটলা, অলিভারকে দেখে বিস্ময় ফুটল তাদের চেহারায়। শুরু হলো গুঞ্জন।

স্যাডল থেকে নামল তরুণ নাইট, কিন্তু ঘোড়ার লাগাম ধরবার জন্য এগিয়ে এল না কেউ। বিরক্ত গলায় ও বলল, 'ব্যাপার কী, তোমরা নিয়ম-কানুন সব ভুলে গেছ নাকি? অ্যাই, এদিকে এসো!' কাছে দাঁড়ানো একটা ছেলেকে ডাকল ও।

একটু ইতস্তত করল ছেলেটা, কিন্তু অলিভারের কর্তৃত্বপূর্ণ দৃষ্টির সামনে হার মানতে বাধ্য হলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল কাছে। তার হাতে লাগাম ধরিয়ে দিয়ে বাড়ির দিকে এগোল অলিভার, সিঁড়ি ধরে তরতর করে উঠে গেল সদর দরজার দিকে।

টোকা দেবার আগেই খুলে গেল পাল্লা। বয়স্ক এক ভৃত্যকে দেখা গেল দোরগোড়ায়। থমথমে চেহারা।

'তোমার মালকিন কোথায়?' জানতে চাইল অলিভার।

'দুঃখিত, সার অলিভার,' বলল ভৃত্য। 'উনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন না। চলে যেতে বলেছেন আপনাকে।'

'রোজামুণ্ডের সঙ্গে দেখা না করে কোথাও যাচ্ছি না আমি,' রাগী গলায় বলল অলিভার। 'সরো, ভিতরে যেতে দাও আমাকে।'

'আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, সার।'

মুখ খরচ করা বৃথা। খপ্ করে ভৃত্যের কলার চেপে ধরল তরুণ নাইট। তাকে ছুঁড়ে দিল মেঝেতে। তারপর ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতর।

'প্লিজ, সার!' চেঁচিয়ে উঠল ভৃত্য। 'যাবেন না আপনি!'

তার কথায় কান দিল না অলিভার। ছুটল রোজামুণ্ডের কামরার দিকে। ওখানেই পাওয়া গেল মেয়েটাকে। বিধ্বস্তের মত দাঁড়িয়ে আছে কামরার মাঝখানে, পরনে সাদা রঙের পোশাক, চুল অবিন্যস্ত, সুন্দর মুখটা ভাই হারানোর বেদনায় ক্লিষ্ট। চোখদুটো লাল হয়ে আছে অবিরাম কান্নাকাটির কারণে। পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল অলিভারের দিকে। ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক হলো, বোধহয় কিছু বলবে, তারপর আবার সিদ্ধান্ত পাল্টাল। ঘৃণার ভঙ্গিতে অলিভারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল ও।

'রোজামুণ্ড!' দু'পা এগোল অলিভার। 'মিথ্যে কথা বলছে লোকে। তুমি ওসব বিশ্বাস কোরো না।'

'চলে যাও তুমি,' ওর দিকে না তাকিয়েই শীতল গলায় বলল রোজামুণ্ড, তাতে ভালবাসা বা শ্রদ্ধার ছিটেফোঁটা নেই।

'চলে যাব? তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ? শুনবে না আমার কথা?'

'বোকার মত বহুবার তোমার কথা শুনেছি আমি... অন্যদের কথা না শুনে। তা হলে এ-দিন দেখতে হতো না। আর কিছু শুনতে চাই না আমি। চাই তোমার বিচার... যেন ফাঁসিতে ঝোলানো হয় তোমাকে!'

অবর্ণনীয় এক ব্যথায় ভরে গেল অলিভারের হৃদয়। 'যদি তা-ই তুমি চাও, ফাঁসিতে ঝুলতে আপত্তি নেই আমার,' ভাঙা গলায় বলল ও। 'ভুল বুঝে যে-কষ্ট তুমি আমাকে দিচ্ছ, তারচেয়ে মরে যাওয়া ভাল। আমার উপর তোমার আস্থা যে এত ঠুনকো, তা আমার জানা ছিল না। লোকের কথায় যে-আস্থা চুরমার হয়ে যায়, সে-আস্থার কী মূল্য?'

'লোকের কথা?' ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রোজামুণ্ড। 'এখনও ধোঁকা দিতে চাইছ আমাকে? তোমার মিথ্যের বেসাতির কি কোনও শেষ নেই?'

'কখনোই তোমাকে ধোঁকা দিইনি আমি। বিশ্বাস করো, পিটারের মৃত্যুতে কোনও হাত নেই আমার। মিথ্যে বললে যেন ঈশ্বরের গজব নেমে আসে আমার উপর।'

'বাহ্! বাহ্!' পিছন থেকে ভেসে এল বিদ্রূপাত্মক একটা কণ্ঠ। 'সার অলিভার দেখছি এবার ঈশ্বরের নাম নিয়ে ছলনা শুরু করেছে!'

ঘাড় ফিরিয়ে সার জন কিলিগ্রুকে দেখতে পেল অলিভার। কামরায় এসে ঢুকেছেন তিনি। দু'চোখ জ্বলে উঠল ওর। অভিযোগের সুরে বলল, 'এসব আপনার ষড়যন্ত্র!'

'আমার ষড়যন্ত্র?' হেসে উঠলেন সার জন। 'তোমার ধৃষ্টতা দেখে অবাক হতে হয়, বাছা। নির্লজ্জতা আর অভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে গেছ তুমি...'

'চুপ করুন!' গর্জে উঠল অলিভার। 'যারা গালাগালে ভয় পায়, তাদেরকে গালি দিন। আমি ওসবের উপযুক্ত জবাব দিতে জানি। ভাল চান তো...'

'হ্যাঁ, রক্তপিপাসু খুনির মতই কথা বলছ বটে!' মিছরির ছুরি চালাচ্ছেন সার জন। 'একজনকে খুন করে সাধ মেটেনি; এখন

আবার তারই বাড়িতে এসে হুমকি দিচ্ছ আরেকজনকে খুন করবার!'

'জিভের লাগাম টানুন, সার জন,' ফুঁসে উঠল অলিভার। 'নইলে সত্যিই খুনোখুনি হয়ে যাবে এখানে।'

'অলিভার!' চাবুকের মত সপাং করে উঠল রোজামুণ্ডের কণ্ঠ।

সঙ্গে সঙ্গে সংবিৎ ফিরে পেল অলিভার। তাড়াতাড়ি রোজামুণ্ডের দিকে ফিরে বিব্রত গলায় ক্ষমা চাইল। 'দুঃখিত, আমি আসলে ওভাবে বলতে চাইনি। মিথ্যে অপবাদ শুনে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। প্লিজ, বিশ্বাস করো, পিটারকে আমি খুন করিনি। তোমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। হয়তো শুনেছ, গতকাল আমার মুখে চাবুক মেরেছে পিটার... এই দেখো, এখনও তার দাগ আছে। অন্য কেউ হলে তখুনি খুন করত ওকে। কিন্তু আমি করিনি। হ্যাঁ, রাগ হয়েছিল খুব... ওর পিছুও নিয়েছিলাম, তবে শেষ পর্যন্ত তোমার কথা ভেবে নিজেকে সংযত করেছি। ভাগ্যের পরিহাসে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে ও, কিন্তু আমার হাতে নয়! বিশ্বাস করো... বিশ্বাস করো!'

'তোমার কথায় বিশ্বাস করবার কোনও প্রশ্নই আসে না!' বলে উঠলেন সার জন।

ঝট্ করে তাঁর দিকে মুখ ঘোরাল অলিভার। 'সার জন, এর মধ্যে আপনি নাক না গলালেই খুশি হব আমি। আমাকে খুনি ভেবে বোকামির পরিচয় দিচ্ছেন আপনি, আর বোকার পরামর্শ প্রয়োজন নেই রোজামুণ্ডের।'

'এর মধ্যে বোকামির কী আছে?'

'বোকামি নয়? সবার সামনে আমাকে আক্রমণ করেছে পিটার, এমন একটা ঘটনার প্রতিশোধ আমি চোরাগোপ্তাভাবে নেব কেন? সাক্ষী রেখে... জনসমক্ষে নেয়াই কি যুক্তিসঙ্গত ছিল না?

তাতে কেউ অভিযোগের আঙুল তুলতে পারত না আমার দিকে। মান-ইজ্জতও রক্ষা পেত। কী ধারণা আপনার—জেনেশুনে ফাঁসিতে ঝোলার মত একটা কাজ করেছি আমি?'

গম্ভীর হয়ে গেলেন সার জন। ভাল একটা যুক্তি খাড়া করেছে বটে অলিভার। আর যাই হোক, খামোকা নিজের ঘাড়ে বিপদ নেবার মত মানুষ সে নয়।

কিন্তু ওর এই যুক্তি প্রভাব ফেলল না রোজামুণ্ডের মধ্যে। থমথমে গলায় বলল, 'এখনও তুমি মিথ্যে কথা বলছ, অলিভার। পিটারের লাশের পাশে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের রেখা পাওয়া গেছে বলে জানানো হয়েছে আমাকে... ওটা চলে গেছে একেবারে পেনারো হাউস পর্যন্ত! তুমি যদি ওকে খুন করে না থাকো, তা হলে কোত্থেকে এল ওই রক্তের রেখা?'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল অলিভারের। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, এবার কাঁধ ঝুলে পড়ল। পরিবর্তনটা দৃষ্টি এড়াল না বাকি দুজনের।

'রক্ত?' নিচু গলায় বলল ও।

'হ্যাঁ, অলিভার... জবাব দাও!' দৃঢ় গলায় বললেন সার জন। দ্বিধা কেটে গেছে তাঁর।

'এর জবাব দিতে পারব না আমি,' শান্ত গলায় বলল অলিভার। 'হয়তো পাওয়া গেছে রক্তের দাগ, কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে, আমিই খুন করেছি পিটারকে।'

বড়ই খোঁড়া শোনাল যুক্তিটা। হতাশায় মাথা নাড়ল রোজামুণ্ড, ধপ্ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। সন্দেহের শেষ রেখাও মিলিয়ে গেছে ওর মন থেকে। দু'হাতে মুখ ঢাকল।

'তা হলে কী প্রমাণ হয় ওতে?' প্রশ্ন করলেন সার জন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অলিভার। 'দুঃখিত, এ-ব্যাপারে কিছুই

বলতে পারব না আমি। বলে কোনও লাভও হবে না। রোজামুণ্ড কিছুতেই বিশ্বাস করবে না আমাকে। ও মনস্থির করে ফেলেছে।'

ভেজা চোখে ওর দিকে তাকাল রোজামুণ্ড। 'আর কী বিকল্প-ই বা আছে আমার? তুমি আমার হৃদয় ভেঙে দিয়েছ, অলিভার। তোমার যে-কোনও অপরাধ, যে-কোনও ভুল আমি মেনে নিতে পারতাম, কিন্তু তা-ই বলে আমার ভাইয়ের খুন... না, এ ক্ষমা করা যায় না।'

'তা হলে তুমি আমাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইছ?'

'অবশ্যই। খুন করেছ তুমি... তার বিচার হতেই হবে!'

'কীসের বিচার? প্রমাণ কোথায়? রক্তের দাগ? ওটার কথা শুনে তুমি বিভ্রান্ত হতে পারো, কিন্তু বুদ্ধিমান কোনও বিচারক হবে না।'

'সেটা যথাসময়ে দেখা যাবে, অলিভার,' কঠিন হয়ে উঠল রোজামুণ্ডের গলা। 'আমি তোমাকে এত সহজে পার পেতে দেব না।'

'ঈশ্বর তোমার সহায় হোন,' বিড়বিড় করল অলিভার। তারপর বেরিয়ে এল গডলফিন কোর্ট থেকে।

ভারী হৃদয় নিয়ে বাড়ি ফিরল ও। কেমনতরো ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে ওর জন্যে, তা জানে না। কিন্তু এটুকু নিশ্চিত, ভুল ভেঙে যাবার পর আবার ওর কাছে ফিরে আসবে রোজামুণ্ড, ক্ষমা চাইবে। সেই সময়েরই এখন প্রতীক্ষা। এরমাঝে কেউ যদি ওকে ফাঁসিতে চড়াতে আসে, তার উপযুক্ত জবাব দেবে অলিভার। ততদিন পর্যন্ত খেয়াল রাখতে হবে লায়োনেলের দিকে—ওর কোনও ক্ষতি হতে দেয়া যাবে না। সুস্থ হবার পর ওকে বোঝাতে হবে নিজের সমস্যা—তাতে হয়তো শুভবুদ্ধির উদয় হবে ছেলেটার

মাথায়। বিবেকের তাড়নায়... স্বেচ্ছায় হয়তো রাজি হবে জবানবন্দি দিতে, নির্দোষ প্রমাণ করবে বড় ভাইকে।

রাতে বিছানায় শুয়ে খামোকাই গড়াগড়ি করল অলিভার, কিছুতেই ঘুমাতে পারল না। মন অস্থির হয়ে আছে। বার বার ভাবছে রোজামুণ্ডের কথা। না, ওকে ভুল বোঝার জন্য মেয়েটাকে দোষ দিতে পারছে না। কামারশালার ঘটনা, তারপর আবার পেনারো হাউস পর্যন্ত লায়োনেলের রক্তের দাগ... এ-দুইয়ে মিলে ওর সন্দেহ জোরালো হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। সত্যি কথা না বলে অলিভারও তো অন্যায় করেছে ওর সঙ্গে। দিনের পর দিন লোকমুখে ওর বদনাম শুনেছে মেয়েটা, কিন্তু ওকে ভালবাসে বলে উড়িয়ে দিয়েছে সব অভিযোগ। সেই বিশ্বাসের কী প্রতিদান দিল আজ অলিভার? জানাল না ওকে ভাইয়ের খুনির পরিচয়—এ কি এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা নয়?

কিন্তু কিছুই করার নেই অলিভারের। লায়োনেল অসুস্থ, ওর মতামত না নিয়ে সত্যি ঘটনা ফাঁস করে দিলে আরেক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করতে হয় ওকে। সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। ভুল বুঝুক প্রেমিকা, কিন্তু রক্তের সম্পর্কের সঙ্গে বেঈমানী করতে পারবে না ও কিছুতেই।

ধীরে ধীরে গড়াতে থাকল সময়। কয়েকদিন পরে খবর পেল অলিভার—ট্রুরো-তে গিয়ে ওর নামে মামলা করতে চেয়েছেন সার জন। কিন্তু ওখানকার বিচারক, মাস্টার গ্রেগরি বেইন, রাজি হননি সেটা লিপিবদ্ধ করতে। কামারশালার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। সোজাসাপ্টা ভাষায় বলে দিয়েছেন—অলিভার যদি পিটারকে খুন করে থাকে, তা হলে অন্যায় কিছু করেনি। নিজের সম্মান বাঁচিয়েছে। এর জন্য ওর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করবেন

না তিনি কিছুতেই।

খবরটা নিয়ে এলেন সার অ্যাণ্ড্রু ফ্ল্যাক, পেনরিনের যাজক—ওই ঘটনার আরেক প্রত্যক্ষদর্শী। সঙ্গে এ-ও জানালেন, বিচারকের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন তিনি। পিটার গডলফিনের উদ্ধত আচরণ তো তিনি নিজ চোখে দেখেছেন।

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানাল অলিভার তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল মাস্টার বেইনের প্রতিও। কিন্তু এ-ও জানিয়ে দিল, পিটারের হত্যাকাণ্ডে ওর কোনও হাত নেই, আপাতদৃষ্টিতে ঘটনা যা-ই দেখাক না কেন।

ব্যাপারটা তখনকার মত ওখানেই চুকেবুকে গেল। কিন্তু কয়েকদিন পরেই নতুন খবর এল অলিভারের কাছে—পুরো এলাকাবাসী নাকি খেপে গেছে মাস্টার বেইনের উপর, একজন খুনির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছেন বলে। মিছিল-মিটিং করে বেড়াচ্ছে তারা, জায়গা-জায়গায় বিচারকের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছে। দাবি তুলছে তাঁর পদত্যাগের।

এ-পরিস্থিতিতে চুপ করে থাকার কোনও মানে হয় না। সার অ্যাণ্ড্রুকে ডেকে পাঠাল অলিভার, তাঁর সঙ্গে রওনা হলো ট্রুরো-র দিকে। ওখানে পৌঁছে সরাসরি দেখা করল মাস্টার বেইনের সঙ্গে। বিচারকের বাড়ির লাইব্রেরিতে একসঙ্গে বসল সবাই।

'মাস্টার বেইন,' শুরু করল অলিভার, 'প্রথমেই আপনার সৎসাহসের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমার পক্ষ নেয়ায়... পিটার গডলফিন আমার সঙ্গে কী ধরনের অসদাচরণ করেছিল, সেটা সবার সামনে প্রকাশ করায়। কিন্তু আপনার এই বদান্যতার সুযোগ নিতে চাই না আমি। আজ এখানে এসেছি সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করবার জন্য। প্রমাণ করে দিতে—আমি পিটারকে খুন করিনি।'

'আপনি করেননি?' বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন মাস্টার বেইন।

'জী না, সার।'

'তা হলে কে?'

'এ প্রশ্নের জবাব আমি এ-মুহূর্তে দেব না। ভবিষ্যতে কোনোদিন হয়তো জানবেন আপনারা। আজ আমি শুধু নিজের নির্দোষিতার প্রমাণ দেব।'

'কিছু মনে করবেন না, সার অলিভার,' বললেন বেইন। 'আপনি যদি মাস্টার গডলফিনকে খুন করেও থাকেন, আইন কিছু বলবে না। সেদিনকার ঘটনা আমি নিজ চোখে দেখেছি।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু সত্যিই খুন করিনি আমি। সেটা এখুনি বুঝতে পারবেন।' গলা খাঁকারি দিল অলিভার। 'আমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে রক্তের দাগ—পিটারের লাশের পাশ থেকে ওটা নাকি পেনারো হাউস পর্যন্ত এসেছে, তাই না? সবাই ধরে নিচ্ছে ওটা খুনির রক্ত, পিটারের হাতে জখম হয়েছে সে।' একটু থেমে সবার চেহারা জরিপ করে নিল ও। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে শ্রোতারা। 'হ্যাঁ, আমিও মানছি ওটা খুনিরই রক্ত। আর সেক্ষেত্রে আরও একটা ব্যাপার মেনে নিতে হয়—লড়াইয়ে ভালরকম জখম হয়েছে মানুষটা, নইলে এত রক্ত ঝরবার কথা না। এখন... আমিই যদি পিটারের খুনি হয়ে থাকি, তা হলে ধরে নিতে হবে জখমটা আমার শরীরে রয়েছে। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতে চাই আমার গায়ে একটাও আঘাত নেই। কাজেই আমি পিটারের খুনি নই... হতে পারি না।'

নিচু স্বরে সার অ্যাণ্ড্রু-র সঙ্গে কথা বলে নিলেন মাস্টার বেইন। তারপর সায় জানালেন, 'আপনার প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত। ঠিক আছে, দেখান।'

অন্তর্বাস ছাড়া বাকি সব পোশাক খুলে ফেলল অলিভার। ওর পুরো শরীর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন দুই বৃদ্ধ। বলা বাহুল্য, গালের সামান্য কাটা-টুকু ছাড়া আর কোনও ক্ষত পেলেন না। শেষে একটা কাগজে লিখে নিলেন পরীক্ষার ফলাফল। সেটাই সই করলেন দু'জনে।

'মনে হচ্ছে সত্যি কথাই বলেছেন আপনি,' বললেন মাস্টার বেইন। 'আপনার শরীরে কোনও জখম নেই, তারমানে লাশের পাশ থেকে রক্তের যে-দাগ গেছে পেনারো হাউস পর্যন্ত, তা আপনার নয়।'

'আপনি তো সন্তুষ্ট হলেন, এবার বাকিদেরকে সন্তুষ্ট করবার পালা।' পোশাক পরে দুই বৃদ্ধের সই করা কাগজটা পকেটে নিয়ে নিল অলিভার। খুব শীঘ্রি ওটা মেলে ধরবে রোজামুণ্ড আর সার জনের চোখের সামনে। দেখা যাক, তখন ওরা কী বলে।

ছয়

জ্যাসপার লেই

শোক এবং কষ্টের মধ্য দিয়ে পার হলো সে-বারের বড়দিন। পেনারো হাউস কিংবা গডলফিন কোর্টে কেউ কোনও আনন্দ করল না।

দিনগুলো গম্ভীর হয়ে কাটাল অলিভার। বেশিরভাগ সময়

কাটাল ডাইনিং হলে, ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা, জ্বলন্ত অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে মগ্ন হয়ে রইল আপন চিন্তায়। ইতোমধ্যে কয়েক দফা রোজামুণ্ডের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছে ও, সফল হয়নি। গডলফিন কোর্টের ফটকে বাধা দিয়েছে ওকে ভৃত্যরা। ওদের সঙ্গে জোর-জবরদস্তি করবার রুচি হয়নি, তাতে পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যাবে। ধৈর্য ধরে ও এখন অপেক্ষা করছে রোজামুণ্ডের রাগ পড়বার। তারপর নাহয় মাস্টার বেইনের স্বাক্ষর করা প্রমাণপত্রটা দেখাবে তাকে।

হাঁটাচলা করবার মত সুস্থ হয়ে উঠেছে লায়োনেল—বাইরে যায় না, তবে বাড়ির ভিতরে হাঁটাহাঁটি করে। ভাইকে বিরক্ত করবার সাহস হয় না তার, দূর থেকে দেখে অলিভারের করুণ দশা। পিটারের খুনের দায়ে বেচারাকে যে সন্দেহ করছে সবাই, তা কানে এসেছে ওর। এ-ও জেনেছে, তরুণ নাইটের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে রোজামুণ্ড। ও-ই দায়ী এসবের জন্য... না জানি কী ভাবছে অলিভার ওকে নিয়ে। তাই সামনে যাবার সাহস হয় না।

ইদানীং দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছে লায়োনেলকে, কেন যেন আস্থা রাখতে পারছে না অলিভারের উপর। গডলফিন কোর্টের তরুণীটিকে তার ভাই কতটা ভালবাসে, সেটা ভাল করেই জানে ও। তাই আশঙ্কা করছে, বিরহের যাতনা অসহনীয় হয়ে উঠলে হয়তো ভেঙে পড়বে অলিভার। ফাঁস করে দেবে সত্যি ঘটনা। এ ছাড়া তো নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের আর কোনও উপায় নেই ওর! কিন্তু তার ফলে যে লায়োনেলের গলায় ফাঁসির দড়ি পড়বে, সেটা কি ভাববে সে? না ভাবারই তো কথা। কে লায়োনেল? আপন নয়, সৎ ভাই। তার জন্য কেন নিজের প্রেমকে বিসর্জন দেবে অলিভার? দিনে দিনে আশঙ্কাটা জেঁকে বসতে থাকল লায়োনেলের

মাথায়।

সন্দেহের বীজ এমনই এক জিনিস, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মহীরুহে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে ডালপালা বিস্তার করে, কিছুতেই মরে না। লায়োনেলের বেলাতেও তা-ই ঘটল। কিছুদিন পর ও আপনাআপনি নিশ্চিত হয়ে গেল, অলিভার বিশ্বাসঘাতকতা করবে ওর সঙ্গে, মুখ বন্ধ রাখবে না কিছুতেই। ধারণাটা বদ্ধমূল হবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা এলোমেলো হয়ে গেল লায়োনেলের, একদিন বিস্ফোরণও ঘটল ভাইয়ের সামনে।

বিকেলবেলা ফায়ারপ্লেসের সামনে চুপচাপ বসে ছিল অলিভার, ওখানে হাজির হলো লায়োনেল। রুক্ষ গলায় বলল, 'সারাদিন তুমি এখানে বসে থাকো কেন, বলো তো?'

চোখ তুলে অনুজের দিকে তাকাল অলিভার, তারপর ডাইনিং রুমের জানালার দিকে।

'বৃষ্টি হচ্ছে,' মৃদুস্বরে বলল ও।

'বৃষ্টির দোহাই দিয়ো না। রোদ উঠলেও তোমাকে এখানেই পাওয়া যাবে। বাইরে যাও না কেন?'

'গিয়ে কী লাভ?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল অলিভার। 'সন্দেহের চোখে তাকায় সবাই আমার দিকে, উল্টো ঘুরলেই পিছনে ফিসফিসিয়ে কথা বলে। ওসব ভাল লাগে না আমার।'

'অ! ব্যাপার তা হলে এ-ই?' হিসিয়ে উঠল লায়োনেল। 'ওসব তো আমার প্রাপ্য, তুমি কেন সইবে... এটাই তোমার যুক্তি, তাই না?'

'কী!' বিস্মিত হলো অলিভার। ভাইয়ের মুখে এমন কথা আশা করেনি।

'ঠিকই বলছি। তোমাকে বুঝতে বাকি নেই আমার। উপরে উপরে ভালমানুষি, কিন্তু অন্তরে বিষ!'

'মনে হচ্ছে অসুখের কারণে তোমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে, লায়োনেল,' ভুরু কুঁচকে বলল অলিভার। 'কী বলছ তা নিজেও জানো না।' উঠে দাঁড়াল ও। কাছে গিয়ে হাত রাখল ভাইয়ের কাঁধে। 'শান্ত হও। কী হয়েছে বলো তো? আমার উপর আস্থা রাখতে পারছ না? শোনো, একটা বুদ্ধি বের করেছি তোমাকে বাঁচাবার। একটা জাহাজ কিনব আমি, সেটায় চেপে দু'ভাই বেরিয়ে পড়ব সমুদ্রযাত্রায়। যতদিন ভাল লাগে, ঘুরে বেড়াব সাগরের বুকে। তারপর দূরে কোথাও নেমে পড়ব—এমন জায়গায়, যেখানে তোমাকে-আমাকে চেনে না কেউ। নতুন করে আবার জীবন শুরু করব আমরা।'

জ্বলজ্বলে চোখে অলিভারের দিকে তাকাল লায়োনেল। হঠাৎ একটা চিন্তা খেলল মাথায়... বাজে চিন্তা, লজ্জিত হলো ও; তাই বলে এড়াতে পারল না সেটাকে। পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিচ্ছে তরুণ নাইট, তাতে লায়োনেল হয়তো খুনের দায়ে অভিযুক্ত হবে না, কিন্তু সবাই ভেবে নেবে—পিটারের মৃত্যুতে ওরও হাত আছে। কেন যেন মেনে নিতে পারল না সেটা। হতে পারে সে খুনি, কিন্তু কেউ তো জানে না সত্যটা। বরং পুরো এলাকার লোকজন ওকে নম্র-ভদ্র ছেলে হিসেবে জানে, সম্মান করে। পালিয়ে যাওয়া মানে নিজেকে কলঙ্কিত করা!

ভাইয়ের অন্তরের টানাপড়েন বুঝতে পারল না অলিভার, ধরে নিল প্রস্তাবটা মেনে নিয়েছে সে। তাই বলল, 'শোনো, স্মিথিকের ওদিকে একটা জাহাজ নোঙর করেছে... হয়তো দেখেছ ওটাকে। ক্যাপ্টেনের নাম জ্যাসপার লেই, দুঃসাহসী এক অভিযাত্রী সে। প্রতিদিন বিকেলেই পেনিকামওয়াইকের পানশালায় পাওয়া যায় ওকে। পুরনো পরিচয় আছে আমাদের, এরই মধ্যে একদিন কথাও বলে এসেছি। অভিযানে বেরুনোর জন্য ছটফট করছে সে,

টাকার অভাবে পারছে না। খরচাপাতি দিলেই জাহাজটা আমাদের হয়ে যাবে, কর্নওয়াল ছেড়ে চলে যেতে পারব আমরা। মানে... তোমার যদি আপত্তি না থাকে আর কী।'

'ভেবে দেখি,' নীরস গলায় বলল লায়োনেল, অলিভারের উৎসাহে পানি ঢেলে দিল। বেরিয়ে গেল ডাইনিং রুম থেকে।

আনমনে মাথা নাড়ল তরুণ নাইট। বসে পড়ল আবার ফায়ারপ্লেসের সামনে।

উৎসাহ না দেখালেও অলিভারের প্রস্তাব পুরোপুরি অগ্রাহ্য করছে না লায়োনেল। শরীরে আরেকটু শক্তি ফিরে পেতেই ঘোড়ায় চড়ে পেনিকামওয়াইকে আসা-যাওয়া শুরু করল। পানশালায় গিয়ে সখ্য গড়ে নিল ক্যাপ্টেন জ্যাসপার লেইয়ের সঙ্গে। তার মুখে শুনল বিভিন্ন অতীত অভিযানের কাহিনি। আসলে বুঝে নিতে চাইছে, সমুদ্রযাত্রায় যাওয়া উচিত হবে কি না। তাতে সুবিধে-অসুবিধে কতখানি।

তবে একদিন ক্যাপ্টেনের মুখে অন্য এক খবর পেল লায়োনেল। উদ্বিগ্ন হবার মত খবর। ঘণ্টাখানেক আড্ডা দেবার পর ঘোড়ায় চড়ছিল ও, এমন সময় জ্যাসপার লেই বলল, 'কিছু মনে করবেন না, মাস্টার ট্রেসিলিয়ান। আপনার ভাই কী ধরনের গাড্ডায় পড়তে যাচ্ছে, সে-সম্পর্কে জানেন কিছু?'

'কীসের কথা বলছেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল লায়োনেল।

'মাস্টার পিটার গডলফিনের খুনের কথা। এলাকার বিচারক কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না দেখে গডলফিন পরিবার থেকে আর্জি জানানো হয়েছে কর্নওয়ালের লর্ড লেফটেন্যান্টের কাছে। কিন্তু তাঁর হুকুমও মানতে রাজি হননি মাস্টার বেইন। জানিয়ে

দিয়েছেন, লর্ড লেফটেন্যান্টের অধীনে নয়, সরাসরি ব্রিটেনের রানির অধীনে কাজ করেন তিনি। কিছুতেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করবেন না। আঁতে ঘা লেগেছে লর্ডের। শুনেছি বিষয়টা নিয়ে এবার রানির কাছে চিঠি লিখেছেন তিনি, তাঁর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। পরিস্থিতি সুবিধের নয়, রানি আদেশ দিলে কিছুতেই সেটা অমান্য করতে পারবেন না মাস্টার বেইন।'

গম্ভীর হয়ে গেল লায়োনেল। কিছু বলল না।

'ভাবলাম সার অলিভারকে সতর্ক করে দিই,' যোগ করল ক্যাপ্টেন। 'চমৎকার মানুষ তিনি, দুর্ধর্ষ নাবিক। এমন নাবিক সচরাচর দেখা যায় না।'

পকেট থেকে কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে তার হাতে গুঁজে দিল লায়োনেল। বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটাল ও।

আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে লায়োনেল। চরম বিপদে পড়তে চলেছে ও। অলিভারকে এবার সত্য প্রকাশ করতেই হবে। আর তার অর্থ—ওর মরণ! বাড়িতে ঢুকে আতঙ্ক আরেক পরত বাড়ল। অলিভার নেই। নিকোলাসের কাছে শুনল, সে গডলফিন কোর্টে গেছে। তারমানে খবরটা ইতোমধ্যে পেয়ে গেছে তরুণ নাইট। ঝামেলা দেখা দেবার আগেই একটা মীমাংসায় পৌঁছুতে চাইছে রোজামুণ্ডের সঙ্গে। নইলে ও-বাড়িতে যাবার দরকার কী?

লায়োনেলের জানা নেই, ওর আশঙ্কা অমূলক। রোজামুণ্ডের সঙ্গেই দেখা করতে গেছে বটে অলিভার, তবে কোনও ধরনের মীমাংসা করবার জন্য নয়। পরিস্থিতি একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে ওর জন্য, তাই ঠিক করেছে—আজই মাস্টার বেইনের সই করা প্রমাণপত্রটা দেখাবে রোজামুণ্ডকে। ভেঙে দেবে ওর ভুল ধারণা। অবশ্য ওর মনের আশা পূরণ হলো না। গডলফিন

কোর্টের ফটকই পেরুতে পারল না, ভিতর থেকে খবর পাঠাল রোজামুণ্ড—ওর সঙ্গে দেখা করবে না। বিফল মনোরথ হয়ে ঘণ্টাখানেক পর পেনারো হাউসে ফিরে এল ও।

বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল লায়োনেল। অভিবাদনের ধার ধারল না। হন্তদন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এবার... এবার তুমি কী করবে, অলিভার?'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল তরুণ নাইট। 'কী করব মানে? কীসের কথা বলছ?'

'কেন, খবর শোনোনি তুমি?' লর্ড লেফটেন্যান্টের ব্যাপারটা খুলে বলল লায়োনেল। শুনতে শুনতে মেঘ জমল অলিভারের চেহারায়।

'হুম,' ভাইয়ের কথা শেষ হলে মাথা ঝোঁকাল ও। 'তা হলে এ-কারণেই বোধহয় আমার সঙ্গে দেখা করেনি রোজামুণ্ড। নিশ্চয়ই ভেবেছে আমি ক্ষমা চাইতে গেছি।' সখেদে মেঝেতে বুট ঠুকল। 'নাহ্! চুপ থেকে দেখি আরও খারাপ আকার ধারণ করেছে সমস্যাটা!'

'কী করবে তুমি?' ভয়ার্ত কণ্ঠে জানতে চাইল লায়োনেল।

'কী করব?' ভাইয়ের দিকে ঘাড় ফেরাল অলিভার। 'আর বাড়তে দেব না ব্যাপারটাকে। সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করে ওদেরকে লজ্জায় ফেলব।'

'তু... তুমি ওদেরকে আসল ঘটনা বলে দেবে?'

ভাইয়ের কাঁপা কাঁপা কণ্ঠ কান এড়াল না অলিভারের। বিরক্ত হয়ে ও বলল, 'তুমি বুঝি এখনও ভয় পাচ্ছ? বলেছি তো, তোমার গায়ে আঁচড় পড়তে দেব না। সত্য ঘটনা বলব বটে, তবে শুধু আমার অংশটা। তোমার নাম উচ্চারণ করব না একবারও।'

'কীভাবে সেটা সম্ভব?'

প্রমাণপত্রের ব্যাপারে ভাইকে সব খুলে বলল অলিভার। কিন্তু তাতে একটুও স্বস্তি পেল না লায়োনেল। অলিভার নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করলে সমস্যা মিটছে না। বরং তাতে আরও জোরেশোরে প্রশ্ন উঠবে—কে তা হলে খুন করেছে পিটারকে? বিষয়টা নিয়ে তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসবে ওর নাম। জানাজানি হবে মালপাসের ওই মেয়েটির সঙ্গে ওর আর পিটারের সম্পর্কের কথা, আঘাতের চিহ্নও পাওয়া যাবে ওর গায়ে।

বাঁচার পথ একটাই—অভিযোগের তীর সরতে দেয়া যাবে না অলিভারের দিক থেকে। কিছুতেই ওকে ওই প্রমাণপত্র দাখিল করতে দেয়া যাবে না। কিন্তু কীভাবে? ভাবতে শুরু করল লায়োনেল। ধীরে ধীরে কুটিল এক পরিকল্পনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ওর ভিতরে। নীচ, ঘৃণ্য এক পরিকল্পনা... কিন্তু প্রাণ বাঁচানোর জন্য এর কোনও বিকল্পও নেই।

পরদিনই আবার পেনিকামওয়াইকের পানশালায় চলে গেল ও, দেখা করল জ্যাসপার লেইয়ের সঙ্গে। তাকে দিয়েই সারতে হবে কাজটা। গত কিছুদিনে বুঝে গেছে, টাকা পেলে যে-কোনও কাজ করবে লোকটা। ন্যায়-অন্যায় নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তবে যা করবার দ্রুত করতে হবে। হাতে বেশি সময় নেই। রোজামুণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে পারছে না অলিভার, কিন্তু সার জন কিলিগ্রুর মাধ্যমেও প্রমাণপত্রটা পাঠিয়ে দিতে পারে মেয়েটার কাছে। কপাল ভাল যে ভদ্রলোক এ-মুহূর্তে এলাকায় নেই, কী এক কাজে যেন লণ্ডনে গেছেন। সপ্তাহখানেকের মধ্যে ফিরে আসবার কথা। তার আগেই কার্যোদ্ধার করতে হবে লায়োনেলকে।

জ্যাসপার লেইয়ের সঙ্গে দেখা করল বটে ও, কিন্তু শুরুতেই কাজের কথা পাড়তে পারল না। সাহস হারিয়ে ফেলল, বোধ

করল সংকোচ। চুপচাপ ক্যাপ্টেনের গালগল্প শুনল অনেকক্ষণ, মদ গিলল গ্লাসের পর গ্লাস। শেষ পর্যন্ত যখন হাল ছেড়ে দিতে যাবে, তখুনি প্রসঙ্গটার অবতারণা করল লেই।

'সার অলিভারকে সতর্ক করে দিয়েছেন তো?'

ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল যেন লায়োনেল, দেখতে পেল আশার আলো। মাথা ঝাঁকিয়ে ও বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কতটা কাজ হবে বলতে পারি না। অলিভার খুবই একরোখা স্বভাবের মানুষ।'

মুখভর্তি লাল দাড়িতে হাত বোলাল লেই। 'তা হলে বলব, জেনেশুনে ফাঁসিতে ঝুলতে যাচ্ছেন তিনি। মানে... যদি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে না পারেন আর কী।'

'হ্যাঁ, যদি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে না পারে!' প্রতিধ্বনি করল লায়োনেল। বুক ধক ধক করছে ওর। 'ক্যাপ্টেন, চলুন একটু বাইরে যাই।'

চোখদুটো ছোট হয়ে এল লেইয়ের। লায়োনেলের কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন কান এড়ায়নি। তাড়াতাড়ি সামনে রাখা মদের গ্লাস খালি করল। তারপর বলল, 'চলুন!'

পানশালা থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। হাঁটতে শুরু করল সাগরপারের দিকে। জোর হাওয়া বইছে, বড় বড় ঢেউ উঠেছে সাগরের বুকে। মাথায় ফেনার মুকুট নিয়ে তীরে এসে আছড়ে পড়ছে ওগুলো। দূরে চোখে পড়ছে ক্যাপ্টেন লেইয়ের জাহাজ *সোয়ালো*-র কালচে অবয়ব, ঢেউয়ের দোলায় দুলছে ওটা।

পানির কিনারে গিয়ে কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল লায়োনেল। কথা গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। শেষ পর্যন্ত লেই সাহায্য করল তাকে।

'মনে হচ্ছে আপনি আমাকে বিশেষ কিছু বলতে চান, মাস্টার ট্রেসিলিয়ান,' বলল ক্যাপ্টেন। 'নিঃসংকোচে বলতে পারেন, আমি

শুনছি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লায়োনেল। লেইয়ের দিকে ফিরল। নিচু গলায় বলল, 'আ... আমি একটা সমস্যায় পড়েছি, ক্যাপ্টেন।'

'যে-কোনও ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য আপনি আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন। বলুন কী করতে হবে।'

'সমস্যাটা অলিভারকে নিয়ে। একরোখামির কারণে সবার বিপদ ডেকে আনছে ও। আপনাকে বলে দেয়া প্রয়োজন, যদি বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় ওকে, নিঃসন্দেহে হেরে যাবে। পরাজয়টা ওর একার নয়, আমারও। পরিবারের একজন সদস্যের ফাঁসি হওয়া মানে বাকিদের মুখেও চুনকালি পড়া। মাথা তুলে আর দাঁড়াতে পারব না আমি কোনোদিন।'

'খাঁটি কথা,' একমত হলো লেই।

'আমি চাই না অমন কিছু ঘটুক,' বলল লায়োনেল। 'আর সেটা ঠেকাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, অলিভারকে সরিয়ে ফেলতে হবে এখান থেকে। কিছুতেই ওকে গ্রেফতার হতে দেয়া যাবে না। তারমানে এই নয় যে, ওর শাস্তি চাইছি না আমি। নিরীহ একজন মানুষকে হত্যা করবার ফল পেতেই হবে ওকে, কিন্তু আমি চাই—তাতে যেন আমি কলঙ্কিত না হই।'

'তারমানে আপনিও সার অলিভারের শাস্তি চাইছেন?' বিস্মিত হলো লেই।

'হ্যাঁ। কারণ পিটার আমার বন্ধু ছিল। তাকে কাপুরুষের মত খুন করেছে অলিভার... আমার সৎ-ভাই! শাস্তি ওকে পেতেই হবে। কিন্তু বিচারের কাঠগড়ায় নয়। অন্যভাবে।'

'কীভাবে সেটা সম্ভব?'

'আশা করছি আপনি একটা পরামর্শ দেবেন আমাকে।'

কুটিল হাসি ফুটল ধুরন্ধর ক্যাপ্টেনের মুখে। 'ঠিক লোকের

কাছেই এসেছেন আপনি, মাস্টার ট্রেসিলিয়ান। শাস্তি দিতে চান সার অলিভারকে? আপনি বললে আমি তাকে তুলে আনতে পারি। জাহাজে করে নিয়ে যাব প্রাচ্যের কোনও প্ল্যানটেশনে, শ্রমিক হিসেবে বিক্রি করে দেব! ওসব জায়গায় সার অলিভারের মত তাগড়া জোয়ানের বড় অভাব।'

'কিন্তু ও যদি টাকা জমিয়ে ওখান থেকে ফিরে আসে?' সন্দিহান দেখাল লায়োনেলকে।

'হুম! তা হলে অন্য কিছু ভাবা যাক। বারবারি সওদাগরদের কাছে দাস হিসেবে বেচে দিলে কেমন হয়? বেতন-টেতন কিচ্ছু দেয় না ওরা, লোক হিসেবেও খুবই নিষ্ঠুর। আমার জানামতে, আজ পর্যন্ত ওদের জাহাজ থেকে কোনও দাস প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি।'

'সেটা বড্ড নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে না?'

'মানুষ খুন করেছে সার অলিভার, নিষ্ঠুরতাই তো তার প্রাপ্য। তা ছাড়া ফাঁসির চেয়ে ভাল পরিণতি ওটা। এতে আপনার উপরেও সন্দেহ সৃষ্টি হবে না কারও। সবাই ভাববে, প্রাণদণ্ডের ভয়ে পালিয়ে গেছেন তিনি।'

লেইয়ের বক্তব্য খতিয়ে দেখল লায়োনেল। বুঝতে পারল, যুক্তি আছে লোকটার কথায়। তাই মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনার কথাই সই। খরচাপাতি কেমন পড়বে?'

দাড়িতে হাত বোলাল লেই। 'বেশি না, আপনি আমার বন্ধু মানুষ। একশ' পাউণ্ড দেবেন আমাকে... আরও একশ' আমার ক্রু-দের জন্য। মোট দুইশ' পাউণ্ডে চিরদিনের জন্য মিটে যাবে আপনার সমস্যা।'

একটু ভাবল লায়োনেল। 'এ-মুহূর্তে অত টাকা নেই আমার কাছে। দেড়শ' পাউণ্ড দিতে পারব নগদ, বাকিটা অলঙ্কারে।

ঠকবেন না ওতে, আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, কাজ শেষ হবার খবর যখন নিয়ে আসবেন, তখন বাড়তি কিছু টাকাও দেব।'

রাজি হয়ে গেল লেই। এবার কর্মপদ্ধতি ঠিক করবার পালা। ক্যাপ্টেন জানতে চাইল, অলিভারকে লায়োনেল পানির ধারে কোনও নির্জন জায়গায় নিয়ে আসতে পারবে কি না। লোক আর নৌকা তৈরি থাকবে তার, বন্দিকে ঝটপট জাহাজে তুলে সাগরে পাড়ি জমাবে সেক্ষেত্রে।

আশপাশে নজর বুলিয়ে হাসি ফুটল লায়োনেলের ঠোঁটে। পেয়েছে জায়গা। গডলফিন কোর্টের কাছে... ট্রেফুসিস পয়েন্টের নদীতীর বিকেলের রোদে ঝলমল করছে। ওখানে খুব সহজে ফাঁদ পাতা যাবে তার বোকা ভাইটির জন্য।

দ্রুত সবকিছু ঠিক করে নিল দু'জনে। তারপর ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরল লায়োনেল। কয়েক ঘণ্টা আগেকার ভীত মানুষটির ছায়াও আর অবশিষ্ট নেই তার মধ্যে। সম্পূর্ণ বদলে গেছে সে।

সাত

অন্তর্ধান

কেনাকাটার নাম করে পরদিন সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল

লায়োনেল। সারাদিন বাইরে কাটিয়ে ফিরে এল সন্ধ্যায়। বাড়িতে ঢুকে চলে গেল হলঘরে, অলিভারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

'গডলফিন কোর্ট থেকে খবর নিয়ে এসেছি,' বলল ও। 'ফটকের সামনে দিয়ে যাবার সময় একটা ছেলে বেরিয়ে এসে বলল, রোজামুণ্ড নাকি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

চমকে উঠল অলিভার, দ্রুততর হয়ে গেল হৃৎস্পন্দন। ওকে ডেকেছে রোজামুণ্ড! হঠাৎ করে মত বদলাল কেন মেয়েটা, এর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা আছে কি না... এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইল না।

'খুব ভাল খবর এনেছ, ভাই,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল ও। 'আমি এখুনি যাচ্ছি।'

ঝড়ের বেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল অলিভার, বাইরে শোনা গেল ওর ঘোড়ার খুরের টগবগানি, একটু পর মিলিয়ে গেল তা। বড় করে শ্বাস ফেলল লায়োনেল। ঠোঁট কামড়াল। বিবেকের দংশনে জর্জরিত হচ্ছে। একবার ইচ্ছে হলো পিছু নেয় ভাইয়ের... থামায় তাকে। কিন্তু শক্তহাতে দমন করল ইচ্ছেটা। পরিকল্পনামত ঘটতে হবে সব। এর উপরে নির্ভর করছে নিজের জীবন।

টেবিলে রাতের খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু সেদিকে গেল না লায়োনেল। চলে গেল আগুনের কাছে, অলিভারের চেয়ারে বসল। হাত-পা কাঁপছে—উত্তেজনা, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডায়। দু'হাত মেলে দিল আগুনের দিকে।

নিকোলাস উদয় হলো একটু পর। জানতে চাইল লায়োনেল এখন খাবে কি না। নেতিবাচক জবাব দিল লায়োনেল, বলল অপেক্ষা করবে অলিভারের জন্য।

'সার অলিভার কি বাইরে গেছেন?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল নিকোলাস।

'হ্যাঁ,' বলল লায়োনেল। তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'কোথায় যাচ্ছে, তা বলে যায়নি আমাকে। আশা করি শীঘ্রি ফিরে আসবে।'

কথাটা ডাহা মিথ্যে। নিকোলাসকে বিদায় করে দিয়ে চিন্তার সাগরে ডুবে গেল ও। মনের টানাপড়েনে আক্রান্ত হয়েছে। ভাইয়ের মহত্ত্বের ব্যাপারে সচেতন লায়োনেল, জানে ওকে নিরাপদ রাখবার জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছে অলিভার। সেই ভাইয়ের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছে ও। নিজেকে নীচ, স্বার্থপর আর ইতর বলে মনে হলো; জাগল ঘৃণা। বোধহয় তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই পাল্টা যুক্তি খাড়া করতে শুরু করল। ত্যাগ স্বীকার করেছে অলিভার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি সত্য ঘটনা ফাঁস করে দেয়, এসব ত্যাগের কী মূল্য আছে? মরতে হবে লায়োনেলকে... জীবন বাঁচাবার অধিকার কি ওর নেই? দুনিয়া বড়ই কঠিন জায়গা—শক্তের ভক্ত, নরমের যম। টিকে থাকতে হলে তাই শক্ত হওয়া প্রয়োজন ওর... হোক সেটা নিজের ভাইকে দমিয়ে। যে-সমীকরণের ফলাফল নির্ধারিত হবে জীবন বা মৃত্যু দিয়ে, সেটাকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার জন্য যে-কোনও পদক্ষেপ নিতে পারে ও, তার জন্য কেন অপরাধবোধে ভুগবে?

কিন্তু যত যুক্তিই দেখাল লায়োনেল, কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারল না। হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত মেনে নিল, ও একজন স্বার্থান্বেষী খলনায়ক। কিছুতেই এ-সত্যকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। বেশ, তবে তা-ই হোক। হলোই নাহয় খল, কিন্তু তাতে লাভ বৈ ক্ষতি তো হচ্ছে না। ফাঁসির দড়ি থেকে গলাটাই কেবল বাঁচছে না, সেই সঙ্গে মালিকানা পাচ্ছে অলিভারের অগাধ ধনসম্পদের।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল লায়োনেলের মন থেকে। মন্দ কাজের সঙ্গে কিছু ভাল ব্যাপারও তো ঘটে!

রাতভর ফিরল না অলিভার। ভোর হতেই বাড়ির চাকর-বাকরদেরকে পাঠিয়ে দিল লায়োনেল, ওর খোঁজ বের করবার জন্য। বলা বাহুল্য, পুরো এলাকা চষেও মালিকের সন্ধান পেল না তারা। চারদিকে খবর রটে গেল—সার অলিভার ট্রেসিলিয়ান নিখোঁজ!

সূর্যাস্তের আগেভাগে লায়োনেল নিজেই বেরুল। চলে গেল সার জন কিলিগ্রুর সঙ্গে দেখা করতে, তাঁকে জিজ্ঞেস করবে—অলিভারের অন্তর্ধান সম্পর্কে কিছু জানেন কি না। ইতোমধ্যে লণ্ডন থেকে ফিরে এসেছেন ভদ্রলোক।

লায়োনেলের কথা শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন সার জন। জানালেন, অলিভারের সঙ্গে বেশ কিছুদিন থেকে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি তাঁর। লায়োনেলের সঙ্গে বেশ নম্র ব্যবহারও করলেন তিনি। এমনিতে ওকে বেশ পছন্দ করেন ভদ্রলোক, অলিভারের মত গোঁয়ার আর উদ্ধত বলে ভাবেন না। লায়োনেল ভাল ছেলে বলেও এক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা আছে তাঁর মধ্যে।

'আমার কাছে এসেছ, এটাই স্বাভাবিক,' বললেন সার জন। কিন্তু নিশ্চিত থাকো, বাছা, সার অলিভারের গায়েব হয়ে যাওয়ায় আমার হাত নেই। আর যা-ই করি, রাতের আঁধারে শত্রুর উপর হামলা চালাবার মত কাপুরুষ নই আমি।'

'দুঃখিত, আমি তেমন কিছু বোঝাতেও চাইনি,' বলল লায়োনেল। 'যদি অপ্রীতিকর প্রশ্ন করে আপনাকে বিব্রত করে থাকি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি। আসলে... কী যে করব, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। এমনিতেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তায় ভুগছি বহুদিন থেকে; তার ওপর আজকের এই কাণ্ড! বোঝেনই তো, একজন খুনির সঙ্গে বাস করতে গেলে যা হয় আর কী। হতে

পারে অলিভার আমার ভাই, কিন্তু যে-অন্যায় ও করেছে, তা বিবেকবান কারও পক্ষে মেনে নেয়া খুব কষ্টকর।'

'কী!' চমকে উঠলেন সার জন। 'তা হলে তোমারও ধারণা, অলিভারই পিটারকে খুন করেছে? এ-ব্যাপারে কিছু শুনেছ ওর মুখে?'

'এক ছাদের তলায় থাকি আমরা,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল লায়োনেল। 'মুখে না বললেও অনেক কিছু এমনিতেই বোঝা যায়।'

'হুম!' গম্ভীর হয়ে গেলেন সার জন। একটু সময় নীরব থেকে বললেন, 'একটা ব্যাপার... ট্রুরোর বিচারকেরা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে বলে আমরা রানির কাছে চিঠি পাঠিয়েছি। আশা করছি খুব শীঘ্রি তিনি সার অলিভারকে গ্রেফতারের জন্য আদেশ পাঠাবেন। আচ্ছা, এ-খবর কি তোমার ভাই জানে?'

'অবশ্যই! আমিই খবরটা দিয়েছি ওকে।' বোকা বোকা চেহারা করল লায়োনেল। 'কিন্তু এ-প্রশ্ন কেন করছেন?'

ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটল সার জনের ঠোঁটে। 'সার অলিভারের উধাও হয়ে যাবার একটা চমৎকার ব্যাখ্যা হতে পারে না ওটা? এমন ভাবলে কি দোষ আছে—বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার ভয়ে...'

'হা যিশু!' চমকে ওঠার ভান করল লায়োনেল। 'আপনি বলতে চাইছেন, ও পালিয়ে গেছে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন সার জন। 'আর কী-ই বা ভাবা যেতে পারে?'

পরাজিতের মত মাথা নামিয়ে ফেলল লায়োনেল। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।' উঠে দাঁড়াল ও। অস্ফুট কণ্ঠে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল আরওয়েনাক থেকে। ভিতরে ভিতরে খুশিতে ডগমগ করছে। যা চেয়েছিল, তা-ই ঘটেছে। এরচেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে?

পেনারো হাউসে ফিরে নিকোলাসকে সব বলল লায়োনেল। সার জনের সন্দেহের কথাও জানাল। তবে ওদের পুরনো ভৃত্য এত সহজে মেনে নিল না ব্যাখ্যাটা।

'আপনার কি মাথা খারাপ হলো, মাস্টার লায়োনেল?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'অমন আজগুবি একটা কথা বিশ্বাস করলেন?'

'আর কী বিশ্বাস করব, বলো?' তেতে উঠল লায়োনেল। 'গ্রেফতার হবার সময় ঘনিয়ে এসেছে... এমন সময় ও উধাও হয়ে গেল! পালানো ছাড়া আর কী হতে পারে?'

'অসম্ভব!' জোর গলায় বলল নিকোলাস। 'আমার মনিব আর যা-ই হোন, পালাবার মত ভীরু কাপুরুষ নন। যদি সত্যি সত্যি মাস্টার গডলফিনকে খুন করেও থাকেন, বীরের মত মুখোমুখি হবেন বিচারের। কাউকে ভয় পান না সার অলিভার। খোদ শয়তানকেও না।'

'তা হলে কোথায় গেছে ও?'

'আমি জানি না, মাস্টার লায়োনেল। হয়তো খারাপ কিছু ঘটেছে তাঁর ভাগ্যে। কিন্তু আমি নিশ্চিত, বেঁচে থাকলে ঠিকই ফিরে আসবেন তিনি।'

'কচু ফিরবে!' বিড়বিড় করে ভৃত্যকে গাল দিল লায়োনেল। হাসল মনে মনে।

বলে রাখা ভাল, নিকোলাসের মত মনোভাব এলাকার অন্যান্য লোকজন পোষণ করে না। খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল গুজব—পালিয়ে গেছে অলিভার। ফলে লায়োনেলের মনের ইচ্ছে বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করল।

সেদিনই বিকেলে ক্যাপ্টেন লেই হাজির হলো পেনারো হাউসে, সার অলিভারের ব্যাপারে নাকি খোঁজ নিতে এসেছে। লায়োনেল তাকে ডেকে পাঠাল হলঘরে। ভৃত্য চলে গেলে

খেঁকিয়ে উঠল, 'আপনি এখনও এখানে কেন? জাহাজ নিয়ে না চলে যাবার কথা?'

কুৎসিত হাসি দেখা দিল লেইয়ের ঠোঁটে। 'আপনাকে খবর দিতে এলাম, সব ঠিকঠাকমত ঘটেছে। রাস্তায় ওঁত পেতে ছিলাম আমরা, সার অলিভারকে থামাতে একটুও অসুবিধে হয়নি। হাত-পা বেঁধে নিয়ে গেছি জাহাজে। এখন উনি ওখানেই আছেন।'

'অলিভার ফেরেনি দেখেই ওটা আন্দাজ করে নিয়েছি আমি। আপনার এখানে না আসলেও চলত।'

'না... মানে... আরেকটা কাজ আছে। হিসেবের চেয়ে খরচাপাতি একটু বেশি পড়ে গেছে। বজ্জাত ক্রু-দের কথা আর বলবেন না... সুযোগ পেয়ে বাড়তি টাকা দাবি করে বসেছে। ওদেরকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে।'

লায়োনেলকে দেখে মনে হলো, এক চামচ তেতো ওষুধ তাকে খাইয়ে দিয়েছে কেউ। কোমরের থলে থেকে কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে ছুঁড়ে দিল ধুরন্ধর ক্যাপ্টেনের দিকে। বলল, 'আপাতত এর বেশি নেই আমার কাছে।'

'না, না! এতেই চলবে।' মুদ্রাগুলো পোশাকের ভিতরে চালান করে দিল লেই।

'এখন যান এখান থেকে। আর আপনার ছায়াও দেখতে চাই না পেনারো হাউসের আশপাশে। কখন রওনা হচ্ছেন?'

'পরের জোয়ারেই নোঙর তুলবে সোয়ালো।'

'খুব ভাল। একটুও যেন দেরি না হয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ক্যাপ্টেন লেই। সে-রাতেই কর্নওয়াল ত্যাগ করল তার জাহাজ। অলিভারের ভাগ্যে কী ঘটল, তা জানতে পারল না কেউই।

*

যত দিন গেল, জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এল লায়োনেলের। কেটে গেল মনের অস্থিরতা। যা হবার তা হয়ে গেছে, ও-নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছে সে—মন্দ মানুষেরা কেন যেন সেটা সবসময়েই পায়। দুর্ভাগ্যের শিকার হয় শুধু ভাল মানুষেরা। লায়োনেলের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক।

অলিভার উধাও হবার ছ'দিন পর রাজকীয় দূত হাজির হলো ওদের এলাকায়। মাস্টার বেইনের কাছে হস্তান্তর করল স্বয়ং রানির সিলমোহর করা সমন। ফলে লণ্ডনে ছুটে যেতে হলো তাঁকে। জবাবদিহি করতে হলো নিজের কর্মকাণ্ডের—কেন তিনি একজন খুনিকে সময় থাকতেই গ্রেফতার করলেন না। কেন তাকে পালাবার সুযোগ দিলেন। বলা বাহুল্য, অলিভারের হয়ে সাফাই গাইলেন তিনি। জানালেন, কীভাবে তরুণ নাইট তাঁর সামনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছে। কিন্তু কপাল খারাপ তাঁর, কয়েকদিন আগেই অসুখে পড়ে মারা গেছেন সার অ্যাণ্ড্রু ফ্ল্যাক; কাজেই তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করবার মত কেউ রইল না। এর ফলে পক্ষপাতিত্ব এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে অভিযুক্ত হলেন মাস্টার বেইন। পদচ্যুত করা হলো তাঁকে, দিতে হলো মোটা অঙ্কের জরিমানা। সবার চোখে অলিভার রয়ে গেল নিষ্ঠুর এক খুনি হিসেবে। কপাল বটে লায়োনেলের!

যা হোক, সেদিন থেকে জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করল তরুণ ট্রেসিলিয়ান। এলাকাবাসী সহানুভূতি দেখাল ওকে, ভাইয়ের কারণে *বেচারা*-র দুর্দশায় ব্যথিত হলো তারা, বাড়িয়ে দিল সাহায্যের হাত। সার র‍্যালফ ট্রেসিলিয়ানের দ্বিতীয় ঘরের পুত্রের মত নয়, বরং তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে মর্যাদা

দেয়া হলো ওকে। মাথা গরম স্বভাবের অলিভার অদৃশ্য হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সার জনের বিরূপ মনোভাবও অদৃশ্য হলো। লায়োনেল তথা ট্রেসিলিয়ান পরিবারের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলবার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখলেন তিনি।

যা পাবার নয়, তা-ই পেল লায়োনেল। সম্মান, ধনসম্পদ আর প্রভাব-প্রতিপত্তি। দিনে দিনে এলাকার গুরুত্বপূর্ণ এক মানুষে পরিণত হলো ও। আর অলিভার? সে আর এক কাহিনি।

আট

স্প্যানিয়ার্ডের কবলে

বিস্কে উপসাগর পেরুনোর সময় ঝড়ের কবলে পড়ল সোয়ালো। তবে পুরনো জাহাজটা যথেষ্ট মজবুত, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরকে পরাস্ত করে নিরাপদে ফিনিস্টার অন্তরীপ পেরুল, বেরিয়ে এল শান্ত পানিতে। আকাশে হেসে উঠল সূর্য, দূর হয়ে গেল বাতাসের উপদ্রব। নীল পানি চিরে পুবের বাতাসের ধাক্কায় এগিয়ে চলল তরতর করে।

আরও আগেই বন্দির সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছে ছিল জ্যাসপার লেইয়ের, কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় জাহাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে, সময় করে উঠতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত অলিভারকে যখন সে ডেকে পাঠাল, তখন সোয়ালো পর্তুগাল

উপকূলের কাছে পৌঁছে গেছে।

পিছমোড়া করে হাত বেঁধে ক্যাপ্টেনের খুপরির মত কেবিনে নিয়ে আসা হলো তরুণ নাইটকে। তেল চিটচিটে একটা টেবিলে বসে লেই তখন সবে দুপুরের খাওয়া শেষ করেছে, আয়েশ করে টানতে শুরু করেছে পাইপ। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে কেবিনের অভ্যন্তর। কামরাটায় সূর্যের আলো পৌঁছে না বললেই চলে, মাথার উপর তাই একটা লণ্ঠন ঝুলছে, জাহাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এদিক-ওদিক দুলছে ওটা।

কাঁপা কাঁপা আলোয় বন্দিকে পর্যবেক্ষণ করল ক্যাপ্টেন। গর্তে বসে গেছে অলিভারের চোখ, মুখভর্তি এক সপ্তাহ না কামানো দাড়ি। সারা গায়ে ময়লার আস্তর, পোশাক ছিঁড়ে গেছে এখানে-সেখানে... বন্দি হবার সময় লড়াইয়ের কারণে। পুরোপুরি বিধ্বস্ত চেহারা। তবে আশ্চর্যরকম শান্ত দেখাচ্ছে ওকে, আচরণে আক্রোশের চিহ্নমাত্র নেই। ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে লেইয়ের মুখোমুখি বসানো হলো, তারপরেও টুঁ শব্দ করল না। শুধু শীতল চোখে তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে, তাতেই ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেল লেই।

ইশারা পেয়ে চলে গেল অলিভারের সঙ্গে আসা দুই নাবিক। দরজা টেনে দিল। কেবিনে এখন শুধু ওরা দু'জন। দাড়িতে হাত বুলিয়ে লেই বলল, 'দুঃখিত, সার অলিভার। মনে হচ্ছে আমার লোকজন ঠিকমত আপনার যত্ন নেয়নি।'

চোয়াল একটু যেন শক্ত হয়ে উঠল অলিভারের। বলল, 'মায়াকান্না না কাঁদলেও চলবে। অন্য কিছু বলার থাকলে বলো।'

'বলব তো বটেই,' মাথা ঝাঁকাল মাস্টার লেই। 'বলার জন্যই ডেকেছি। শুনুন, সার অলিভার, হয়তো ভাবছেন বিরাট অন্যায় করেছি আমি আপনার সঙ্গে; কিন্তু সে-ধারণা ভুল। আসলে আমি

আপনার উপকারই করেছি। আমার কাজের ফলে আপনি শত্রুকে চিনতে শিখবেন, বুঝবেন বন্ধুবেশে কে আপনার সর্বনাশ ডেকে এনেছে। ভবিষ্যতে কাকে বিশ্বাস করবেন না করবেন, সে-সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে আপনার জন্য।'

'বাহ্!' তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল অলিভারের ঠোঁটে। 'তারমানে তুমি বলতে চাইছ, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত আমার?'

'আমি না, ওটা আপনিই বলবেন... সব কথা শোনার পর। আন্দাজ করতে পারেন, আপনাকে অপহরণ করবার নির্দেশ এবং টাকা কে দিয়েছে? কী করতে বলা হয়েছে আপনাকে নিয়ে?'

'যদি আষাঢ়ে গল্প শুনিয়ে আমার মন ভোলাবার ফন্দি এঁটে থাকো, তা হলে এখুনি তাতে ক্ষান্ত দিতে পারো,' বিরক্ত গলায় বলল অলিভার। 'তোমার মত লোকের কথা শুনবারই ইচ্ছে নেই আমার, বিশ্বাস করা তো অনেক দূরের ব্যাপার।'

'তবু আপনাকে শুনতে হবে, সার অলিভার!' জোর দিয়ে বলল লেই। 'বারবারি উপকূলে নিয়ে গিয়ে মূর-দের কাছে আপনাকে বিক্রি করে দিতে বলা হয়েছে আমাকে। আপনাকে সাহায্য করবার জন্যেই তাতে রাজি হয়েছি আমি।'

'তা-ই? সত্যি সত্যি দেখছি আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছ!'

'বিশ্বাস করুন! আপনাকে নিয়ে এতদূর দক্ষিণে আসবার ইচ্ছে ছিল না আমার। ঝড়ের কবলে পড়ায় এদিকে আসতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু সাগর এখন আবার শান্ত হয়েছে। আপনি চাইলেই উল্টো ঘুরে এক সপ্তাহের মধ্যে আবার আপনাকে কর্নওয়ালে পৌঁছে দেব।'

'বিনে-পয়সায় সমুদ্র-ভ্রমণ করাচ্ছ আমাকে? এত উদার হয়েছ কবে?'

অস্বস্তিতে মাথা চুলকাল লেই। 'ইয়ে... খরচাপাতি কিছুটা

তো হয়েছেই। আশা করছি সেগুলো মিটিয়ে দেবেন আপনি। উপকারের বিনিময়ে পুরস্কার-টুরস্কারও দেবেন...'

হেসে উঠল অলিভার। 'হ্যাঁ, এবার নিজের আসল চেহারা দেখিয়েছ তুমি, দু'মুখো সাপ! আমাকে অপহরণ করবার জন্য টাকা নিয়েছ, আবার আমার কাছেও টাকা চাইছ ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। বেঈমানীর একটা সীমা থাকা উচিত!'

একটু যেন আহত হলো লেই। বলল, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন, সার। সৎ লোকের সঙ্গে সৎ থাকা যায়, কিন্তু মন্দ লোকের উপর বিশ্বাস রাখাটা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। তা ছাড়া... এ কাজ আমি করেছি আপনার শত্রুর পরিচয় ফাঁস করবার জন্য। সঙ্গে যদি একটু টাকাপয়সা আসে, মন্দ কী? খুব বেশি দাবি করছি না, আপনার ভাই দুইশ' পাউণ্ড দিয়েছে, আপনিও নাহয় তা-ই দিন...'

কথাটা শোনামাত্র চমকে উঠল অলিভার। নির্বিকার মুখোশটা খসে পড়ল চেহারা থেকে, পিঠ খাড়া হয়ে গেল ওর, সামনের দিকে একটু ঝুঁকল, দু'চোখ জ্বলে উঠল রাগে।

'কী বললে?' তীক্ষ্নস্বরে, প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ও।

পাইপে টান দিয়ে ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়ল লেই। 'বলছিলাম যে, আপনার ভাই আমাকে যে-টাকা দিয়েছে, ওই একই পরিমাণ টাকা যদি...'

'আমার ভাই?' তাকে বাধা দিয়ে গর্জে উঠল তরুণ নাইট। 'আমার ভাইয়ের কথা বলছ তুমি?'

'ঠিক তাই।'

'মাস্টার লায়োনেল?' যেন নিশ্চিত হতে পারছে না অলিভার।

'আর ক'টা ভাই আছে আপনার?' হাসল লেই।

কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এল ক্যাপ্টেনের

কেবিনে। থম মেরে বসে রইল অলিভার, যেন হজম করবার চেষ্টা করল লেইয়ের কথা। শেষে বলল, 'তুমি বলতে চাইছ, আমাকে অপহরণ করবার জন্য লায়োনেল তোমাকে টাকা দিয়েছে? মানে, আমার এই দুর্দশার জন্য ও-ই দায়ী?'

'আর কাউকে সন্দেহ করেছিলেন নাকি?' বিরস গলায় বলল লেই। 'নাকি ভেবেছেন, শখের বশে আপনাকে তুলে এনেছি আমি?'

'কথা ঘুরিয়ো না!' হিসিয়ে উঠল অলিভার। 'সরাসরি জবাব দাও আমার প্রশ্নের।'

'জবাব তো প্রশ্ন করবার আগেই দিয়েছি। তারপরেও যদি আবার শুনতে চান, তা হলে বলি—দুইশ' পাউণ্ডের বিনিময়ে মাস্টার লায়োনেল আপনাকে অপহরণ করিয়েছে আমার মাধ্যমে, নির্দেশ দিয়েছে আপনাকে বারবারি উপকূলে নিয়ে গিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে। জবাবটা যথেষ্ট সরাসরি হয়েছে তো?'

'মিথ্যে বলছ তুমি, কুকুর!' চেঁচাল অলিভার।

'শান্ত হোন, সার।'

'কীসের শান্ত! আমার ভাইয়ের নামে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছ তুমি!'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল লেই। ভাবল কিছু। তারপর বলল, 'বেশ, তা হলে দেখছি সত্য-মিথ্যে প্রমাণ করে দিতে হয়!'

উঠে দাঁড়াল সে। চলে গেল কেবিনের একপাশে, মেঝেতে রাখা কাঠের সিন্দুক খুলে একটা কাপড়ের থলে হাতে নিল, ওটা-সহ ফিরে এল টেবিলে। থলের ভিতর থেকে কয়েকটা অলঙ্কার বের করল লেই, সেগুলো বিছিয়ে দিল অলিভারের সামনে।

'দুইশ' পাউণ্ডের পুরোটা নগদ দিতে পারেনি মাস্টার

লায়োনেল,' বলল ক্যাপ্টেন। 'ঘাটতি পুরণ করেছে এসব অলঙ্কার দিয়ে। ভাল করে দেখুন, সার অলিভার, চিনতে পারছেন কোনোটা?'

হেলাফেলার দৃষ্টিতে টেবিলের উপর দৃষ্টি ফেলল অলিভার, কিন্তু পরমুহূর্তেই হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেল। প্রথমেই চিনতে পারল একটা আংটি, তারপর একজোড়া পুরুষালি কানের দুল—দুটোই লায়োনেলের। এরপর চিনল একটা চেইন-সহ লকেট—ও নিজের হাতে উপহার দিয়েছিল ভাইকে। শুধু তাই নয়, সামনে ছড়িয়ে থাকা প্রতিটি অলঙ্কার ওর পরিচিত... কোনও ভুল নেই।

বুকের কাছে মাথা ঝুঁকে গেল অলিভারের। বাজ পড়া মানুষের মত স্থবির হয়ে রইল কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত হাহাকার করে উঠল, 'হা ঈশ্বর! লায়োনেলও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল? তা হলে কে রইল আমার এ দুনিয়ায়?' চোখ থেকে দু'ফোঁটা অশ্রু বেরিয়ে এল ওর, বুক ভরে গেল চরম বিষাদে। বিড়বিড় করল, 'অভিশপ্ত আমি... অভিশপ্ত!'

চোখের সামনে এসব প্রমাণ না দেখলে ব্যাপারটা কিছুতেই বিশ্বাস করত না অলিভার। বরং এতদিন রোজামুণ্ডকেই দায়ী বলে ভেবেছে ও। মনে করেছে, আইনের স্বাভাবিক পন্থায় ভাইয়ের মৃত্যুর বিচার না পেয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে মেয়েটা। ওকে গডলফিন কোর্টে ডেকে পাঠানোর নাম করে ফাঁদে ফেলেছে, অপহরণ করিয়েছে দুষ্ট ক্যাপ্টেনের মাধ্যমে। খারাপ লেগেছে রোজামুণ্ডকে দোষী ভাবতে, কিন্তু কিছুটা হলেও সান্ত্বনা ছিল তাতে... মেয়েটাকে আবেগের কাছে পরাজিত বলে ভাবতে পারছিল। অথচ এখন? লায়োনেলের ব্যাপারে কীভাবে প্রবোধ দেবে নিজেকে?

অকল্পনীয় একটা ব্যাপার... এতদিনের স্নেহ, ভালবাসা আর মায়ার প্রতিদান ছেলেটা এভাবে দিতে পারে! কী না করেছে অলিভার ভাইটির জন্য। ওকে আগলে রেখেছে বিপদে-আপদে, ওর অপরাধের দায় টেনে নিয়েছে নিজের কাঁধে... অথচ তার বিনিময়ে নির্মম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে লায়োনেল। কেন? নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য? নাকি ওর ধন-সম্পদের জন্য? কারণ যা-ই হোক, একটা বিষয় পরিষ্কার—অপাত্রে ভালবাসা দান করেছে অলিভার। দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছে নিজের ঘরে। সেই সাপ দংশন করেছে ওকে সবচেয়ে দুর্বল মুহূর্তে। কিন্তু না, মুখ বুজে সেই দংশন সহ্য করবে না অলিভার। যোদ্ধা ও, সত্যিকার বীর... জবাব দেবে এই বিশ্বাসঘাতকতার।

যেমন হঠাৎ করে দুঃখে ভরে গিয়েছিল অন্তর, ঠিক সেভাবেই আবার চলেও গেল তা। সে-জায়গা দখল করল ক্রোধ আর প্রতিহিংসা। ঝট্ করে মাথা তুলল অলিভার—বদলে গেছে মুখের ভাব, দু'চোখে রুদ্র আগুন। তাকাল ক্যাপ্টেন লেইয়ের দিকে, লোকটা চুপ করে ওর প্রতিক্রিয়া দেখছে।

'মাস্টার লেই,' বলল অলিভার, 'আমাকে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কত টাকা চাও তুমি?'

'ওটা তো বলেই দিয়েছি—দুইশ' পাউণ্ড,' জবাব দিল লেই। 'উঠিয়ে আনার জন্যও তা-ই পেয়েছিলাম। দুটোয় কাটাকাটি হয়ে যাবে।'

'দুইশ' না, আমাকে ট্রেফুসিস পয়েন্টে নামিয়ে দিতে পারলে তার দ্বিগুণ দেব আমি তোমাকে।'

চোখ পিটপিট করল লেই, সরু হয়ে এল দৃষ্টি। সন্দিহান হয়ে উঠেছে। নিজ থেকে এত টাকা দিতে চায় না কেউ। নিশ্চয়ই এর পিছনে অন্য কিছু আছে।

'কী মতলব ভাঁজছেন, সত্যি করে বলুন তো?'

'মতলব? কিছুই না?' বলল অলিভার। 'অন্তত তোমার কোনও ভয় নেই। ঈশ্বরের দিব্যি, যা কিছু ঘটে গেছে, তাতে তোমার ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য। তা ছাড়া তোমাকে এ-মুহূর্তে আমার প্রয়োজনও বটে। নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ নেই।'

একটু ভাবল লেই। যুক্তি দেখতে পেল ওর কথায়। ঠিকই বলেছে তরুণ নাইট—মাস্টার লায়োনেলের তুলনায় সে একটা দুগ্ধপোষ্য শিশু বৈ আর কিছু নয়। মশা মেরে হাত গন্ধ করবার মানুষও নয় সার অলিভার। বরং উপকার করতে চলেছে লেই, সেজন্যে কৃতজ্ঞ হবার কথা।

'কথা দিন, আমার কোনও ক্ষতি করবেন না,' তবু নিশ্চিত হবার জন্য বলল ক্যাপ্টেন।

'ধরে নাও পেয়ে গেছ,' অলিভার বলল। 'আমাকে ট্রেফুসিস পয়েন্টে পৌঁছে দেয়ামাত্র প্রতিশ্রুত টাকা পেয়ে যাবে তুমি। ওতে কোনও চালাকি থাকবে না। সন্তুষ্ট? তা হলে এবার আমার হাতদুটো খুলে দাও। এভাবে থাকতে আর ভাল লাগছে না।'

মাথা ঝাঁকাল লেই। 'আপনার সুবিবেচনার প্রশংসা করছি, ব্যাপারটা এত সহজভাবে নিয়েছেন বলে। আমার আসলে কোনও দোষ নেই, স্রেফ হাতিয়ার হিসেবে আমাকে ব্যবহার করেছে মাস্টার লায়োনেল...'

'হাতিয়ারই বটে তুমি, নোংরা হাতিয়ার,' বলল অলিভার। 'সে যা-ই হোক, হাতদুটো খুলে দাও তো। বোঝাপড়া হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে, এখন আর কয়েদির মত থাকতে চাই না।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন লেই। কোমর থেকে ছোরা বের করে কেটে দিল অলিভারের হাতের

বাঁধন।

মুক্তি পেয়েই ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল তরুণ নাইট। কেবিনের নিচু ছাতে ঠুকে গেল মাথা, ব্যথা পেয়ে আবার বসে পড়ল ও। আর তখুনি বাইরে থেকে ভেসে এল উত্তেজিত চিৎকার। দ্রুত দরজার কাছে ছুটে গেল লেই, পাল্লা খুলে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। তার পিছু নিল অলিভার। দু'জনে পা রাখল পুপ-ডেকে।

পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘামাল না তরুণ নাইট। আগে বুক ভরে টেনে নিল সমুদ্রের তাজা বাতাস। তারপর দৃষ্টি ফেরাল চেঁচামেচির কারণ জানবার জন্য। নীচে, জাহাজের পাটাতনে ভিড় জমিয়েছে কালিঝুলি মাখা একদল নাবিক। বুলওঅর্কের পাশে দাঁড়িয়ে খোলা সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। একই রকম জটলা রয়েছে ফোক্যাসলে-ও। সবার দৃষ্টি একই দিকে। রোকা অন্তরীপের কাছাকাছি তখন চলছে জাহাজ, তীরের অনেকটাই কাছ ঘেঁষে। এত কাছ দিয়ে যাবার কথা ছিল না। ঝট্ করে হুইল ধরে থাকা সারেং-এর দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন, শাপশাপান্ত করতে শুরু করল তাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার কারণ দেখতে পেল অলিভার। উপকূলের কিনারায় উঁকি দিতে থাকা একটা নদীমুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে এল ভীমদর্শন এক স্প্যানিশ রণতরী, তীরের কাছে এসে পড়া নিঃসঙ্গ জাহাজের অপেক্ষায় ওখানেই ঘাপটি মেরে পড়ে রয়েছিল ওটা। বড় বড় পালে হাওয়ার ধাক্কায় দ্রুত এগিয়ে আসছে জাহাজটা সোয়ালোর দিকে।

চকিতে হিসেব সেরে নিল লেই। অন্তত পাঁচ নট গতিতে এগোচ্ছে অচেনা শত্রু, অথচ ওদের গতি এক নটের বেশি নয়। শীঘ্রি ধরা পড়ে যাবে। রাগে মুখ বিকৃত হয়ে উঠল তার। কনুইয়ের ধাক্কায় হুইল থেকে সরিয়ে দিল সারেং-কে, নিজেই

ধরল ওটা।

'সর্ ব্যাটা, অকর্মার ধাড়ি কোথাকার!' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'এই কোর্স আপনিই ঠিক করে দিয়েছেন!' প্রতিবাদ জানাল সারেং।

'তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু! তীর থেকে দূরে থাকতে বলেছিলাম, নাক বরাবর গিয়ে ওটাকে চুমু খেতে বলিনি!' বন বন করে হুইল ঘোরাল লেই।

মুখ ঘুরিয়ে বাতাসের ভাটির দিকে চলল সোয়ালো। ফুলে উঠল পাল। গতি বাড়ল একটু। সারেং-এর হাতে হুইল আবার তুলে দিল ক্যাপ্টেন। নির্দেশ দিল, 'এইভাবেই ধরে রাখ্। খবরদার, নাক যেন না ঘোরে।' এরপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল বাকি নাবিকদেরকে আদেশ-নির্দেশ দেয়ায়।

দড়িদড়া নিয়ে ছোটাছুটি শুরু করল সোয়ালোর ক্রু-রা। মাস্তুল বেয়ে উঠে গেল বেশ ক'জন। দ্রুত খুলে দিল সবক'টা পাল, বাড়তি কয়েকটাও খাটানো হলো। জাহাজ এখন সামর্থ্যের সর্বোচ্চ গতিতে ছুটছে উপকূলের সবুজ পানি চিরে।

পুপ ডেক থেকে স্প্যানিয়ার্ড জাহাজের দিকে তাকাল অলিভার। স্টারবোর্ডের দিকে একটু সরে গেছে ওটা—সামনে এসে ওদের পথ আটকে দেবার পাঁয়তারা। সোয়ালোর গতি একটু বাড়লেও ওটার তুলনায় এখনও কিছুই নয়। খুব দ্রুত কমে আসছে দুই জাহাজের মধ্যকার দূরত্ব।

নীচে চলে গিয়েছিল লেই, ফিরে এল একটু পর। চঞ্চল চোখে যাচাই করে নিল অবস্থা। মুখ দিয়ে অবিরাম বেরুচ্ছে অভিশাপ—এমন একটা ফাঁদের ভিতর পা দিয়ে বসায়। বলা বাহুল্য, অভিশাপের বেশিরভাগটাই তার সারেং-কে উদ্দেশ করে।

এই ফাঁকে সোয়ালোর দৃশ্যমান অস্ত্রশস্ত্রগুলোর ব্যাপারে

একটা ধারণা নেবার চেষ্টা করল অলিভার। খুব বেশি কিছু দেখা যাচ্ছে না। আন্দাজ করল, মেইন-ডেকের নীচে হয়তো আরও কিছু থাকতে পারে। এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিক্ত চেহারা বানাল ক্যাপ্টেন লেই।

'অস্ত্র থাকলে এভাবে লেজ তুলে পালাই?' বলল সে। 'নচ্ছাড় স্প্যানিয়ার্ডের ভয়ে আমাকে পিঠটান দেবার বান্দা ভেবেছেন? বরং ব্যাটাদের লড়াইয়ের সাধ জন্মের মত মিটিয়ে দিতাম না?'

বুঝে গেল অলিভার, যুদ্ধ করে জয়ের আশা বৃথা। কতক্ষণ ওদের প্রতিরোধ টিকবে, সেটাই এখন দেখবার বিষয়। ডেকের দিকে নজর ফেরাল ও। মাস্তুলের তলায় জড়ো করে রাখা কাটলাস আর ক্ষুদ্রাস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে নাবিকদের মধ্যে। হাতাহাতি লড়াইয়ে ওগুলোই ওদের ভরসা। দূর থেকে যুদ্ধ করবার জন্য কামান আছে মাত্র দুটো—প্রথমটার গোলন্দাজ কাফ্রি এক পালোয়ান, মুখভর্তি দাড়ি, মাথায় পাগড়ি পরে। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে দু'জন সহকারী নিয়ে তাকে ছুটে যেতে দেখল জাহাজের বামদিকে।

নীচ থেকে একজন নাবিককে ডেকে হুইলে দাঁড় করাল লেই, সারেং-কে পাঠিয়ে দিল ফোক্যাসলে, ওখানে বসানো দ্বিতীয় কামানটা চালাবার জন্য।

পরের কিছুটা সময় ধরে চলল দৌড় প্রতিযোগিতা। ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেল সোয়ালো প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেবার, কিন্তু ধীরে ধীরে কাছে চলে এল স্প্যানিশ জাহাজটা। পিছনে হারিয়ে যেতে শুরু করল সমুদ্রতট, ধূসর একটা রেখায় পরিণত হলো খুব শীঘ্রি। হঠাৎ স্প্যানিশ জাহাজের সামনে ধোঁয়ার একটা সাদা মেঘ উদয় হলো, তার পিছু পিছু শোনা গেল কামান দাগার আওয়াজ। সোয়ালোর বো-র এক কেইবল সামনে ছিটকে উঠল সাগরের

পানি, ওখানে আছড়ে পড়েছে ওদের ছোঁড়া গোলা।

হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে কাফ্রি গোলন্দাজকে স্থির থাকতে দেখল অলিভার, ক্যাপ্টেনের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। বো-র দলটাও একই ভঙ্গিতে রয়েছে। হুকুম না পেলে সলতেয় আগুন ধরাবে না।

আরেকবার গর্জে উঠল স্প্যানিশ জাহাজের কামান, আবারও পানি ছিটকাল সোয়ালোর বো-র সামনে।

'পাল্টা আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ওরা,' বলল অলিভার।

দাড়িতে হাত বোলাল লেই। 'জানাক। ব্যাটাদের রেঞ্জ অনেক বেশি। খামোকা বারুদ খরচ করবার কোনও মানে হয় না। আমাদের স্টক খুব সামান্য।'

তার কথা শেষ হতেই তৃতীয়বারের মত গোলা ছুঁড়ল স্প্যানিশ জাহাজ। এবার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না ওটা। সোজা এসে পড়ল সোয়ালোর গায়ে। কাঠভাঙার বিচ্ছিরি মড়মড় আওয়াজ উঠল, হুড়মুড় করে জাহাজের মূল মাস্তুল আছড়ে পড়ল পাটাতনের উপরে। ভারী জিনিসটার তলায় চাপা পড়ল দু'জন নাবিক... ভর্তা হয়ে গেল। হায় হায় করে উঠল তাদের সঙ্গীরা। কিন্তু আশ্চর্যরকম শান্ত রইল লেই।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল সে। উত্তেজনার বশে সলতের দিকে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে গিয়েছিল কাফ্রি গোলন্দাজ—তার উদ্দেশেই এই চিৎকার। থমকে গেল লোকটা।

মাস্তুল ভেঙে পড়ায় থেমে যাবার দশা হলো সোয়ালোর, এই সুযোগে শিকারী বাজের মত ধেয়ে এল স্প্যানিশ জাহাজ। ওটাকে রেঞ্জের মধ্যে আসতে দিল লেই, তারপরেই গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, 'ফায়ার!'

গর্জে উঠল সোয়ালোর প্রথম কামান। পুরো লড়াইয়ে ওই

দাগা গেল ওটা। বিস্ফারিত চোখে গোলাটাকে স্প্যানিশ জাহাজের বো-র উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখল লেই। পরমুহূর্তে শুরু করল গালাগাল, গোলন্দাজ কামানকে বড্ড উঁচুতে তাক করেছে। তাড়াতাড়ি অস্ত্রের মুখ নামাতে শুরু করল কাফ্রি লোকটা।

সারেং-কে উদ্দেশ করে চেঁচাল এবার লেই, স্প্যানিশ জাহাজের পাশ লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়তে বলল। কিন্তু তার এই ইচ্ছের কথা আঁচ করতে পেরেছে শত্রুরা। লক্ষ্যস্থির করবার আগেই ঘুরে গেল জাহাজের মুখ। চতুর্থবারের মত গর্জে উঠল তাদের কামান। সোয়ালোর বামদিকের খোলে আঘাত করল সেই গোলা।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো জাহাজ। কাঠ ভাঙল, লাফ দিয়ে মাথা তুলল আগুনের শিখা, সেইসঙ্গে পাক খেয়ে উঠে এল কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ভাঙা খোলের ফোকর দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকতে শুরু করল পানি। চোখের পলকে বামদিকে কাত হয়ে গেল আহত সোয়ালো।

'হায় যিশু!' হাহাকার করে উঠল ক্যাপ্টেন লেই। 'আমরা ডুবছি!'

আসলেই তা-ই। মরণ-আঘাত হেনেছে স্প্যানিশ জাহাজ। কায়দামত এক গোলা ছুঁড়েই ইতি ঘটিয়েছে যুদ্ধের। দ্বিতীয়বার কামান দাগতে পারেনি সোয়ালো। পানির ভারে কাত হয়ে গেছে জাহাজ, দুটো কামানের নলই এখন সমুদ্রের দিকে। প্রতিপক্ষের কোনও ক্ষতি করা আর সম্ভব নয়।

গানেল আঁকড়ে ধরে স্প্যানিশ জাহাজের দিকে তাকাল অলিভার। আর এগোচ্ছে না ওটা। এগোবার দরকারও নেই। দাঁড়িয়ে পড়েছে সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে। অপেক্ষা করছে সোয়ালোর ডুবে

যাবার। তারপর কাছে এসে তুলে নেবে হাবুডুবু খেতে থাকা অসহায় নাবিকদেরকে। তাদেরকে নিয়ে যাবে দাস হিসেবে বিক্রি করবার জন্য। অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করল ও বুকে—শারীরিক নয়, মানসিক যন্ত্রণা। ফেরা হলো না দেশে। নেয়া হলো না প্রতিশোধ ওর বিশ্বাসঘাতক ভাইয়ের বিরুদ্ধে। এ-জ্বালা সইবে কী করে?

কিন্তু অলিভারের জানা নেই, নিয়তি ওকে নিয়ে অন্য এক নাটক সাজিয়েছে। মনোবাসনা ঠিকই পূর্ণ হবে ওর, তবে বহু জল গড়াবার পরে... বেশ কিছুদিন কেটে গেলে। আর তাতে ভূমিকা থাকবে ক্যাপ্টেন লেইয়েরও।

সে-কাহিনি যথাসময়ে জানবেন পাঠক।

দ্বিতীয় পর্ব
শাকের-আল-বাহার

এক

বন্দি

স্পারটেল অন্তরীপের একটা পাহাড়ি চাতালে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে শাকের-আল-বাহার, অর্থাৎ সাগরের বাজপাখি। দুর্ধর্ষ এক কর্সেয়ার... মানে, মুসলিম জলদস্যু সে। ভূমধ্যসাগরের ত্রাস বলা হয় তাকে, সেইসঙ্গে খ্রিস্টান স্পেনের জন্য এক ভয়ানক আতঙ্ক।

ওর মাথার উপরে, পাহাড়ের ডগায় শোভা পাচ্ছে আরাইশের বিখ্যাত কমলা-বাগিচার সারি সারি সবুজ গাছ। মাইলখানেক পুবে রয়েছে বেদুঈন এক গোত্রের বেশকিছু কুঁড়েঘর আর তাঁবু, উপর থেকে ছোট ছোট বিন্দুর মত দেখাচ্ছে ওগুলোকে। আবাসগুলোর ওপাশে, যতদূর দৃষ্টি যায়, রয়েছে একের পর এক ফসলি জমি। চলে গেছে একেবারে সিউটা পর্যন্ত। পাহাড়ের গোড়ায় ন্যাড়া এক পাথরের উপর দু'পা মেলে বসে আছে এক রাখালবালক, আনমনে বাজিয়ে চলেছে বাঁশের বাঁশি। সেই সুরে আন্দোলিত হয়ে উঠছে আকাশ-বাতাস... নেচে উঠছে সাগরের ঢেউ, ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে সৈকতের বুকে।

পাহাড় বেয়ে চাতালে উঠে এসেছে শাকের-আল-বাহার। তারপর উটের পশমে তৈরি একটা চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে আরাম করে। দু'জন কাফ্রি ভৃত্যও এসেছে ওর সঙ্গে--বিশালদেহী

পালোয়ান ওরা, কোমরে একপ্রস্থ কৌপিন ছাড়া আর কিছু নেই, তেল-চকচকে পুরো গায়ে কিলবিল করছে পেশি। চাতালের দু'পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে এরা। হাতে একটা করে তালপাতার পাখাও ধরে রেখেছে, পালা করে বাতাস দিচ্ছে মনিবকে, সেইসঙ্গে তাড়াচ্ছে মাছি।

জীবনের স্বর্ণ-সময় চলছে এখন শাকের-আল-বাহারের। লম্বা, মেদহীন, একহারা দেহ। চওড়া বুকের ছাতি আর হাতের পেশিতে অমিতশক্তির আভাস। নাকটা বাজপাখির ঠোঁটের মত তীক্ষ্ণ, কালো দাড়িতে ঢাকা মুখটা সুদর্শন, মায়াময়। কিন্তু তারপরেও তাতে ফুটে থাকে অদ্ভুত এক রুক্ষতা। মাথায় রয়েছে সাদা একটা পাগড়ি, পরনে সাদা একটা শার্ট, তার উপরে দীর্ঘ সবুজ রেশমের টিউনিক—কিনারাগুলো সোনালি সুতোয় কারুকাজ করা। খাটো একটা পাজামা পরেছে, হাঁটুর তলায় গিয়ে শেষ হয়ে গেছে ওটা, পায়ের নিম্নাংশ উন্মুক্ত। পায়ের পাতা ঢেকে রেখেছে নকশাদার একজোড়া নাগরা জুতো—লাল চামড়ায় তৈরি, ডগাদুটো খুবই চোখা। অস্ত্র বলতে বড় একটা ছোরা রয়েছে শুধু শাকের-আল-বাহারের কাছে—কোমরে গোঁজা, বেরিয়ে আছে ওটার রত্নখচিত হাতল।

কয়েক গজ বাঁয়ে আরেকজন মানুষ রয়েছে—এ-ও সুঠামদেহী, উপুড় হয়ে আছে, কনুই-দুটো মাটিতে, চোখের উপর হাত দিয়ে রেখেছে রোদ থেকে বাঁচার জন্য। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে সাগরের দিকে। শাকেরের মতই একহারা এবং শক্তিমান সে। বুকের উপর পরেছে একটা লোহার বক্ষাবরণ। মাথায়ও রয়েছে একটা শিরোস্ত্রাণ। তার শরীরের পাশে মাটিতে পড়ে আছে একটা প্রমাণ আকারের খাপবদ্ধ তলোয়ার, দেখলেই ভয় জাগে। সে-ও সুদর্শন, তবে শাকেরের চেয়ে চেহারা অনেক

বেশি হিংস্র। গায়ের চামড়া রোদে পোড়া, তামাটে।

সঙ্গীর দিকে মনোযোগ নেই শাকের-আল-বাহারের। তার দৃষ্টি পড়ে আছে পাহাড়ি ঢালের উপর, ওটা নানা প্রজাতির চিরহরিৎ গাছপালায় ছাওয়া। মেঘের ফাঁকফোকর দিয়ে তার উপর আছড়ে পড়ছে সূর্যের সোনালি রশ্মি। পাহাড়ের একটা অংশ নেমে গিয়ে মিশেছে সাগরের বুকে। সেখানে রয়েছে বড় বড় গুহা। গুহামুখের সম্মুখে অবারিত জলরাশি... টগবগ করে ফেনাময় নীলচে-সবুজ ঢেউ ভাঙছে সবখানে। ছোট একটা খাঁড়ির মত আছে, তাতে নোঙর করে আছে তিনটে পালতোলা জাহাজ। প্রথম দুটো বেশ বড়—একেকটায় পঞ্চাশটা দাঁড়; তৃতীয়টা একটু ছোট—ত্রিশটা দাঁড় আছে ওতে। এ-মুহূর্তে সবগুলো দাঁড় তুলে রাখা হয়েছে, জাহাজগুলোকে দেখাচ্ছে পাখা-মেলা রাজহাঁসের মত। এক নজরেই বোঝা যায়, জাহাজগুলো ওখানে ঘাপটি মেরে আছে শিকারের আশায়।

পানির উপর দিয়ে তারিফা প্রণালীতে চোখ বোলাল শাকের-আল-বাহার। গ্রীষ্মের আর্দ্র বাতাস ভেদ করে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ইয়োরোপের তটরেখা। এই পটভূমির মাঝখানে রয়েছে একটা সাদা পালতোলা সওদাগরি জাহাজ, প্রণালীর চার মাইল দূর দিয়ে সাবলীল গতিতে ভেসে চলেছে ওটা। পুব দিক থেকে ধেয়ে আসা হাওয়ায় ফুলে উঠেছে পাল। সন্দেহ নেই, চোখে দূরবীন লাগিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে আফ্রিকান উপকূল পর্যবেক্ষণ করছে জাহাজের ক্যাপ্টেন। এদিকটায় এলেই যে খ্রিস্টান জাহাজগুলোকে স্থানীয় জলদস্যুদের কবলে পড়তে হয়, তা অজানা থাকার কথা নয় তার। নিশ্চয়ই সতর্ক হয়ে আছে লোকটা।

মুচকি হাসি ফুটল শাকের-আল-বাহারের ঠোঁটের কোণে। যত

সতর্কই হোক ক্যাপ্টেন, অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ-কে ঠেকাবার কোনও উপায় নেই তার। দূরবীন দিয়ে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও খাঁড়িতে লুকানো জাহাজগুলোকে দেখতে পাবে না সে। বুঝতেই পারবে না, ফাঁদের ভিতর পা দিতে চলেছে। উঁচু পাহাড় থেকে এখন তাই বাজপাখির মত শিকারের দিকে নজর রাখছে শাকের, হামলা চালাবার উপযুক্ত দূরত্বে পৌঁছুনোর অপেক্ষায় আছে।

প্রণালীর পুবদিকে সাগরের পানি ভেদ করে উঠে এসেছে চওড়া একটা শৈলপ্রাচীর, ওটার গায়ে বাধা পায় বায়ুপ্রবাহ আর সাগরের স্রোত। উপর থেকে তাকিয়ে প্রাচীরের এই প্রভাব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও। বাড়ি খেয়ে বদলে গেছে স্রোতের গতিপথ আর তীব্রতা। বাতাসও ওখানে আটকা পড়ায় উল্টো দিকটাতে সৃষ্টি হয়েছে মন্দা হাওয়া। সোজা কথায় ওটা একটা ফাঁদ। দক্ষ নৌ-চালক ওটা দূর থেকে লক্ষ করবে, চেষ্টা করবে জায়গাটা এড়িয়ে যাবার... কিন্তু কথা হলো, সব জাহাজের চালক একই রকম দক্ষ নয়। নিজের অজান্তেই তারা পা দিয়ে বসে ফাঁদ-তুল্য জায়গাটায়। আজকের এই জাহাজও তা-ই করে কি না, সেটাই এখন দেখবার বিষয়।

কোর্স বদলাল না জলযানটা, একটু পরেই শৈলপ্রাচীরের আধমাইলের মধ্যে পৌঁছে গেল। তা দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠল দীর্ঘদেহী জলদস্যু। ঝট্ করে ফিরল শাকেরের দিকে। বলল, 'আসছে... এদিকেই আসছে জাহাজটা!'

'ইনশাল্লাহ!' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল শাকের।

উত্তেজনাকর নীরবতা নেমে এল চাতালে। আরও কাছে চলে এসেছে জাহাজটা। কালচে খোলের খুঁটিনাটি চোখে পড়ছে এবার। মাস্তুলের ডগায় পত পত করতে থাকা পতাকার দিকে তাকাল শাকের-আল-বাহার। লাল আর হলুদ রঙের পটভূমিতে

তাতে ফুটে আছে একটা দুর্গ আর সিংহের মাথার ছবি।

'স্প্যানিশ গ্যালিয়ন, বিস্কেন,' হাসিমুখে বলল ও। 'কী ভাগ্য আমাদের! আল্লাহ্‌র অশেষ দয়া!'

'এদিকে ঢুকবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল বিস্কেন।

'অবশ্যই!' নিশ্চিত শোনাল শাকেরের কণ্ঠ। 'বিপদের ভয় করছে না ওরা। এত পশ্চিমে সাধারণত আসি না আমরা। ওই তো, মুখ ঘোরাচ্ছে। স্প্যানিশ গৌরব নিয়ে আমাদের কাছেই আসছে ওরা।'

শৈলপ্রাচীরের পিছনের মন্দা বাতাসে পড়ে গেছে গ্যালিয়ন। উপায়ান্তর না দেখে প্রণালীর ভিতরে ঢুকতে বাধ্য হচ্ছে ক্যাপ্টেন। এদিক দিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যাবার ইচ্ছে।

'হামলা করা দরকার... এখুনি!' হড়বড় করে বলল বিস্কেন-আল-বোরাক। বিদ্যুৎবেগে তলোয়ার চালাবার দক্ষতার কারণে এ-নাম পেয়েছে সে। অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই,' শান্ত রইল শাকের। 'যত কাছে আসবে, ততই ওদের সর্বনাশ নিশ্চিত হবে। হামলার সঙ্কেত দেবার আগে যথেষ্ট সময় আছে।' কাফ্রি এক ভৃত্যের দিকে ফিরল। 'আমাকে কিছু পান করতে দাও, আবাইদ। গলা শুকিয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পায়ের কাছ থেকে একটা মাটির পাত্র তুলে নিল লোকটা। তালপাতা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা হয়েছে, ওটার বাঁধন খুলল। তারপর একটা ছোট কাপে ঢালল খেজুরের রস। বাড়িয়ে ধরল মনিবের দিকে। শিকারের দিক থেকে চোখ ফেরাল না শাকের-আল-বাহার, আস্তে আস্তে চুমুক দিল কাপে। একেবারে কাছে চলে এসেছে গ্যালিয়ন, খুঁটিনাটি দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। পাটাতনের উপর চলাফেরা করছে নাবিকের দল,

মাস্তুলের উপর রাখা হয়েছে পাহারাদার—বিপদের পূর্বাভাস পাবার জন্য। তবে পাথরসারির পিছনে থাকা খাঁড়িটা এখনও তাদের দৃষ্টির আড়ালে।

খাঁড়ির আধমাইলের মধ্যে জাহাজটা পৌঁছে যেতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল শাকের। গলায় বাঁধা সবুজ রুমাল খুলে নিয়েছে, ওটা উঁচু করে নাড়ল, সঙ্কেত দিল নিজের জাহাজগুলোকে। পরমুহূর্তে ওদিক থেকে ভেসে এল শিঙার আওয়াজ, মাল্লাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো ওভাবে। পানিতে একযোগে সবক'টা দাঁড় নামানোর আওয়াজ শোনা গেল। চোখের পলকে খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে এল বিশাল দুই দস্যু-জাহাজ। পাটাতনের উপরে কিলবিল করছে পাগড়ি-পরা সশস্ত্র জলদস্যুর দল। সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে তাদের হাতে ধরা তলোয়ার। মাস্তুল আর বো-র কাছে রয়েছে বিশেষ দুটো দল, তারা তীর-ধনুক তাক করে রেখেছে শিকারের দিকে। সে এক ভয়-জাগানো দৃশ্য!

আকস্মিক এই আক্রমণের জন্য একেবারেই তৈরি ছিল না স্প্যানিয়ার্ড-রা। বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ল তাদের মধ্যে। ঠিকমত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারল না। শুরু হলো মহা হট্টগোল। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করতে থাকল তারা। মরিয়া হয়ে পিঠটান দিতে চাইল ক্যাপ্টেন। কিন্তু চাইলেই কী তা হয়? সরু প্রণালীর মধ্যে মুখ ঘোরাতে গিয়ে বরং বাতাসের আনুকূল্য হারাল সে। ন্যাতানো কাপড়ের মত ঝুলে পড়ল পাল, প্রায় থেমে গেল গ্যালিয়ন। তাড়াতাড়ি দাঁড় নামানো হলো, ধীরে ধীরে উল্টো পথে চলতে শুরু করল জাহাজ। পিছু পিছু শিকারী বাঘের মত ধেয়ে এল দস্যুরা।

এতকিছু দেখবার জন্য উপরে বসে নেই শাকের-আল-

বাহার। হামলার নির্দেশ দিয়েই চাতাল থেকে নামতে শুরু করেছে ও। ঢালের গায়ে জন্মানো গাছপালার ডাল ব্যবহার করছে, বানরের মত দক্ষতায় লাফিয়ে নামছে এক পাথর থেকে আরেক পাথরে। কষ্টেসৃষ্টে ওর সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে বিস্কেন আর দুই কাফ্রি ভৃত্য। একটু পরেই ওরা নেমে এল সৈকতে। জায়গাটা ঠিক খাঁড়ির পারে। ছোট একটা নৌকা অপেক্ষা করছিল, সেটায় চড়ে দ্রুত ওরা উঠে এল পিছনে রয়ে যাওয়া ছোট জাহাজটাতে। হুকুম পেতেই খ্রিস্টান ক্রীতদাসরা দাঁড় নামাল পানিতে। শুরু করল দাঁড় টানা। পাটাতনের উঁচু একটা জায়গায় অবস্থান নিল শাকের-আল-বাহার। দু'পা ফাঁক করে, হাতে তলোয়ার নিয়ে বীরোচিত ভঙ্গিমায় দাঁড়াল। ওর পিছনে, মাস্তুলের উপরে সদর্পে উড়ছে কর্সেয়ার-দের পতাকা—লাল পটভূমিতে একটা উজ্জ্বল সবুজ কাস্তের মত চাঁদ।

সামনে তখন যুদ্ধ বেধে গেছে। তাড়াহুড়ো করে একবার কামান দাগল স্প্যানিয়ার্ড-রা, কিন্তু লাগাতে পারল না আগ্রাসী জাহাজদুটোয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের নাগাল পেয়ে গেল দস্যুরা। লোহার আঁকশি ছুঁড়ল, সেটা গিয়ে আটকাল ডানদিকের বুলওঅর্কে। দড়ি টেনে স্প্যানিশ গ্যালিয়নের গায়ে ভিড়ল জলদস্যুদের একটা জাহাজ। অবিরাম তীর ছুঁড়ে স্প্যানিয়ার্ডদের কোণঠাসা করে রাখা হলো, আর সে-সুযোগে লাফ দিয়ে ওদের জাহাজে চড়ল তলোয়ার আর ছোরাধারী দস্যুরা। প্রত্যেকের চোখে-মুখে নগ্ন আক্রোশ—এই স্প্যানিয়ার্ড-রাই আন্দালুসিয়ান মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিল মূর-দেরকে। একটু পরে দ্বিতীয় জাহাজটাও চলে এল অন্যপাশে। ওদিক থেকে হামলা চালাল আরেকদল।

লড়াইটা হলো সংক্ষিপ্ত। শুরু থেকেই বিভ্রান্ত ছিল

স্প্যানিয়ার্ডরা। আকস্মিক হামলায় হতভম্ব হয়ে পড়েছে তারা। লড়াইয়ের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নেবার সময় পায়নি। প্রাথমিক আঘাতেই বেশ কিছু লোক নিহত হলো। এরপর নিজেদের কিছুটা গুছিয়ে নিল ওরা, সাহসিকতার সঙ্গে যতটা পারে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। কিন্তু অকুতোভয় কর্সেয়ার-দের সামনে সে-সব কিছুই না। আল্লাহ্ আর নবীর নামে যুদ্ধ করছে তারা, মৃত্যুর পরোয়া নেই। বরং মরে গিয়ে শহীদ হবার প্রতিই তাদের আগ্রহ বেশি। বলা বাহুল্য, এমন পাগলাটে দস্যুদের সঙ্গে পেরে ওঠার কথা নয় কারও। অকাতরে খুন হয়ে গেল স্প্যানিশ নাবিকেরা। লোকবল যখন চারভাগের একভাগে নেমে এল, তখন বাধ্য হলো আত্মসমর্পণ করতে।

শাকের-আল-বাহার যখন ছোট জাহাজটা নিয়ে গ্যালিয়নের পাশে পৌঁছুল, তখন শেষ হয়ে গেছে লড়াই। স্প্যানিশ জাহাজের মাস্তুল থেকে খুলে নেয়া হয়েছে রাজকীয় পতাকা, আর তার তলায় ঝুলতে থাকা কাঠের ক্রুশ; সেখানে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে কর্সেয়ারদের সবুজ চাঁদঅলা ঝাণ্ডা। বিজয়ের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল দস্যুদের মাঝে। সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল তারা:

'আলহাম্‌দুলিল্লাহ্!'

গ্যালিয়নে উঠে এল শাকের-আল-বাহার। এগোল ভিড়ের মাঝ দিয়ে। ওকে দেখে ঝটপট সরে গেল দস্যুরা, বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। দু'হাতে তলোয়ার উঁচিয়ে শুরু করল স্লোগান—জয়ধ্বনি দিল সাগরের বাজপাখির নামে। যদিও আসল লড়াইয়ে অংশ নেয়নি, তারপরেও ওর-ই নিখুঁত পরিকল্পনার কারণে সফল হয়েছে আজকের অভিযান। সমস্ত প্রশংসা ওর-ই প্রাপ্য।

গ্যালিয়নের পাটাতন রক্তে মাখামাখি, সাবধানে না হাঁটলে পিছল খেতে হবে। তার মাঝে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে নিহত

স্প্যানিয়ার্ডদের লাশ। শাকেরের ইশারায় ওগুলো সাগরে ফেলে দিতে শুরু করল দস্যুরা। সুস্থ বন্দিদেরকে এনে জড়ো করা হলো মাস্তুলের গোড়ায়—নিরস্ত্র, ভয়ে কাঁপতে থাকা অবস্থায়।

ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল শাকের। গম্ভীর চোখে নিরীখ করল বন্দিদেরকে। সংখ্যায় শ'খানেকের মত হবে। অভিযাত্রীর দল... ভাগ্য গড়বার আশায় ক্যাডিয থেকে ভারতবর্ষে যাচ্ছিল। কপাল খারাপ, যাত্রা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। ভাগ্য বদলাবে ওদের ঠিকই, তবে সেটা দাস হিসেবে। আলজিয়ার্স বা তিউনিসে নিয়ে গিয়ে ধনী মূর-দের কাছে বিক্রি করে দেয়া হবে ওদেরকে।

সময় নিয়ে সবাইকে দেখল শাকের-আল-বাহার। শেষ পর্যন্ত ওর দৃষ্টি থামল গ্যালিয়নের ক্যাপ্টেনের উপরে। অধীনস্থদের চেয়ে দু'পা সামনে এগিয়ে দাঁড়িয়েছে লোকটা, এ-পরিস্থিতিতেও নিজেকে আলাদা করে দেখাতে চাইছে। পরাজয়ের গ্লানিতে চেহারা মলিন, দু'চোখে জ্বলজ্বল করছে নিষ্ফল আক্রোশ। দামি একটা পোশাক তার পরনে, রেশমের তৈরি টুপির কিনারে শোভা পাচ্ছে পাখির পালক, কপালের উপরে রয়েছে একটা সোনার ক্রুশ।

কপালের কাছে হাত তুলে তাকে ইসলামি কায়দায় সালাম জানাল শাকের। তারপর চোস্ত স্প্যানিশে বলল, 'যুদ্ধের ফসল, সেনিয়র ক্যাপিতান! আপনার নামটা জানতে পারি?'

'আমি ডন পাওলো দ্য গুযম্যান,' বুক চিতিয়ে বলল লোকটা। শত্রুর সামনে নিজের আত্মমর্যাদা বজায় রাখার ক্ষীণ প্রচেষ্টা আর কী।

'আহ্! আপনি তো তা হলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্রলোক। যদ্দূর দেখছি, শিক্ষিত এবং সবলও বটে। আলজিয়ার্সের বাজারে

দুইশ' দিনারে বেচা যাবে আপনাকে। তবে... চাইলে নিজের মুক্তি কিনে নিতে পারেন। তার জন্যে পাঁচশো দিনার খরচ করতে হবে।'

'জাহান্নামে যাও! ঈশ্বরের নামে অভিশাপ দিচ্ছি তোমাকে...' চেঁচিয়ে উঠল ডন পাওলো।

মুখ বাঁকাল শাকের। বলল, 'বেশ, তা হলে আপনার এই অভদ্রতার কারণে মুক্তিপণের পরিমাণ এক হাজার দিনার নির্ধারণ করা হলো। অ্যাই, নিয়ে যাও ওঁকে। ভালমত খাতিরদারি করো, তাতে যদি বুদ্ধি খোলে ভদ্রলোকের!'

টেনে-হেঁচড়ে ক্যাপ্টেনকে নিয়ে গেল দুই দস্যু।

বাকিদের পিছনে বেশি সময় খরচ করল না শাকের। জানিয়ে দিল, যদি কেউ চায়, ওর অধীনে কাজ করতে পারে। তাদের মুক্তিপণ ও নিজেই পরিশোধ করবে। তিনজনের সাড়া পাওয়া গেল তাতে। অবশিষ্ট বন্দিদেরকে সহকারী বিস্কেনের হাতে তুলে দিল শাকের। তার আগে গ্যালিয়নের সারেংকে জিজ্ঞাসাবাদ করল, জাহাজে কোনও ক্রীতদাস আছে কি না। জানা গেল, জনা-বারো আছে। তিনজন ইহুদি, সাতজন মুসলমান আর দু'জন নাস্তিক। লড়াই শুরু হতেই তাদেরকে পাটাতনের নীচে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

ক্রীতদাসদেরকে খুঁজে নিয়ে আসা হলো। মুসলমানরা স্বধর্মীদের দেখা পেয়ে আবেগে আপ্লুত হলো, ওখানেই বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, কৃতজ্ঞতা জানাল আল্লাহ্‌র প্রতি। তিন ইহুদিও খুশি হলো—খ্রিস্টানদের চেয়ে মুসলমানদেরকে তারা বেশি আপন ভাবে। অন্তত স্প্যানিয়ার্ডদের মত অত্যাচার চালায় না এরা। প্রতিক্রিয়াহীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকল শুধু দুই নাস্তিক। ওদের কাছে খ্রিস্টান-মুসলমান একই কথা। কারও কাছ থেকেই সাহায্য পাবার

আশা নেই। ওদের একজনকে একটু বেশিই বিতৃষ্ণ দেখাল। লোকটা সুঠামদেহী, তবে বয়স্ক। ছেঁড়া ন্যাকড়ায় পরিণত হয়েছে পরনের পোশাক। মুখ-ভর্তি চুল-দাড়ি এককালে লাল ছিল, এখন ধূসর হতে শুরু করেছে। হাতের চামড়ায় কালো কালো ফুটকি।

লোকটা শাকের-আল-বাহারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিষণ্নভাবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে—জীবনযুদ্ধে পরাজিত এক সৈনিকের মত। আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্পৃহা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই, যেন মেনেই নিয়েছে ক্রীতদাস হিসেবে তাকে মরতে হবে। কেন যেন মানুষটাকে চেনা চেনা লাগছে।

কয়েক পা এগোল শাকের, সামনে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল ক্রীতদাসটিকে। সামনে ওর উপস্থিতি টের পেয়ে লোকটাও মাথা তুলল। চোখাচোখি হলো ওদের, কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হলো দুজনের দৃষ্টি। ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হলো দু'জোড়া চোখই।

'ভুল দেখছি না তো!' চরম বিস্ময়ে বলে উঠল ক্রীতদাস, ইংরেজিতে কথা বলছে। চমক সামলাবার জন্য একটু অপেক্ষা করল সে। হঠাৎই হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। খুব পরিচিত ভঙ্গিতে লোকটা বলল, 'শুভ অপরাহ্ন, সার অলিভার। ধরে নিচ্ছি আমাকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ফাঁসিতে ঝোলাবেন আপনি।'

'ইয়া আল্লাহ্!' ফিসফিসাল শাকের-আল-বাহার।

দুই

দলত্যাগী

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, দুর্ধর্ষ জলদস্যু শাকের-আল-বাহার এবং এককালের বীর নাইট স্যার অলিভার ট্রেসিলিয়ান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু কীভাবে ঘটল এই অদ্ভুত রূপান্তর? কর্নওয়ালের সম্ভ্রান্ত পরিবারের অভিজাত এক ভদ্রলোক কেমন করে পরিণত হলো ভূমধ্যসাগরের ত্রাসে, আলজিয়ার্সের বাদশাহ্ আসাদ-আদ-দীনের প্রিয়পাত্রে, কিংবা খ্রিস্টানদের পরম শত্রুতে? সংক্ষেপে এবার সেটাই বলা যাক।

সোয়ালো ডুবে যাবার পর সাগর থেকে যাদেরকে স্প্যানিশ জাহাজটা তুলে নেয়, তাদের মধ্যে ছিল অলিভার এবং জ্যাসপার লেই। বন্দিদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় লিসবানে, হস্তান্তর করা হয় পবিত্র চার্চের আদালতের জিম্মায়। বলে রাখা ভাল, নাবিকদের বেশিরভাগই ছিল নাস্তিক; পারিবারিকভাবে খ্রিস্টান হলেও অলিভারও কোনোদিন ধর্মকর্ম নিয়ে মাথা ঘামায়নি। যা হোক, এসব ধর্মহীন মানুষদেরকে খ্রিস্টান হিসেবে দীক্ষিত করবার জন্য পাঠানো হয় সেইন্ট ডমিনিকের সন্ন্যাসীদের অধীনে। জীবন বাঁচানোর জন্য বাকিদের পাশাপাশি ওরা দু'জনও মেনে নেয় ব্যাপারটা।

পাপের পথ থেকে এতজন মানুষকে ফিরিয়ে আনতে পারার আনন্দে ক'দিন পরেই বিশাল উৎসবের আয়োজন করা হলো পবিত্র গৃহে। সেখানে হাতে প্রদীপ আর মুখে ঈশ্বরের জয়গান গেয়ে নবদীক্ষার পরীক্ষা দিতে হলো বন্দিদেরকে। চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে তাতে অংশগ্রহণ করল অলিভার আর লেই। ধর্মযাজকদেরকে সন্তুষ্ট করবার পর মুক্তি মিলল চার্চের হাত থেকে। তবে ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটল না ওখানে।

ধর্মীয় বিভাগ থেকে এবার ওদের মামলা চলে গেল আইনের আদালতে। সাগরে দস্যুতা এবং অবৈধ কার্যক্রমের অভিযোগে শুরু হলো বিচার। নামে বিচার, আসলে ওটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু না। আত্মপক্ষ সমর্থন করে বেশ ভালমতই লড়ল ক্যাপ্টেন লেই, কিন্তু বিচারকেরা সাক্ষ্য-প্রমাণ শুনবার আগেই ঠিক করে রেখেছে রায়। অলিভারও উপস্থাপন করলাম নিজের সাফাই— আদালতকে জানাল, ও সোয়ালো জাহাজের ক্রু নয়, বরং তাদের অপহরণের শিকার। নিজের আসল পরিচয়ও দিল ওখানে। তাতে বরং কয়েক গুণ বড় বিপদের মধ্যে পড়ল। স্প্যানিয়ার্ড-দের নথি-সংরক্ষণ পদ্ধতি যে কত নিখুঁত, তা জানা হয়ে গেল। চব্বিশ ঘণ্টা না যেতেই সার অলিভার ট্রেসিলিয়ানের সমস্ত কীর্তির বিবরণ হাজির করল প্রতিপক্ষের উকিল। বলা বাহুল্য, সেগুলো আসলে স্প্যানিশ আর্মাডার বিরুদ্ধে ব্রিটেনের লড়াইয়ে ওর হাতে ঘটা ক্ষয়ক্ষতির হিসেব-নিকেশ। এরপরে বিচারকদের কাছ থেকে কোনও ধরনের সহানুভূতি পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

শেষ পর্যন্ত যা ঘটবার তা-ই ঘটল। ওদেরকে দোষী বলে রায় দিল আদালত। শোনাল মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি। ফাঁসিতে ঝুলে মরণই কপালে ছিল ওদের, বেঁচে গেল স্রেফ ভাগ্যের জোরে। সে-সময়ে ভূমধ্যসাগরের স্প্যানিশ জাহাজগুলো ভীষণরকম লোক-সঙ্কটে

ভুগছিল, তাই মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করে জোয়ান-তাগড়া বন্দিদেরকে পাঠানো হলো ওসব জাহাজে ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করবার জন্য। ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে ওদেরকে পর্তুগাল থেকে স্পেন, তারপর ক্যাডিযের বন্দরে নিয়ে যাওয়া হলো। ওখানেই ক্যাপ্টেন লেইকে শেষবার দেখে অলিভার, রাজকীয় একটা গ্যালিয়নের দাঁড় টেনে বন্দর থেকে লোকটা বেরিয়ে যাবার সময়।

ক্যাডিযের এক খোঁয়াড়ের মত বন্দিশালায় মাসখানেক কাটায় অলিভার। সে এক নরকতুল্য পরিবেশ—রোগব্যাধি, ময়লা-আবর্জনা আর উচ্ছিষ্ট খাবার মিলিয়ে অসহনীয় এক অবস্থা। বুনো শূকরকেও কেউ অমন জায়গায় রাখে না। ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ল অনেকে, মারাও গেল... যারা টিকল, তারা প্রতি মুহূর্তে কামনা করল মৃত্যু। যা হোক, মাসশেষে এক অফিসার উদয় হলো ওখানে, নিজের জাহাজের জন্য দাস জোগাড় করতে এসেছে। বাছাই করে বেশ কিছু লোক নিল, তাদের মধ্যে স্থান পেল অলিভার। মনে হলো যেন ত্রাতা হিসেবে হাজির হয়েছে লোকটা।

পঞ্চাশটা দাঁড়অলা বিশাল এক জাহাজে ওঠানো হলো ওদেরকে, একেকটা দাঁড় টানতে সাতজন মানুষ লাগে। নেপলসে যাচ্ছে জাহাজটা। গ্যাঙওয়েয়ের পাশের একটা দাঁড়ের পিছনে বসানো হলো অলিভারকে। সেখানে, কাঠের তক্তার উপর বসে, শেকলপরা ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় ভয়ঙ্কর ছ'টা মাস কাটাল ও। তক্তাটা মাত্র দশফুট লম্বা, তাতে গাদাগাদি করে বসত সাতজন মাল্লা। দাঁড় টানা, খাওয়া-দাওয়া, ঘুম... সব ওই ছোট্ট জায়গাতেই করতে হতো। ছ'মাসের জন্য ওটাই ছিল ওর দুনিয়া।

জাহাজের ক্রীতদাসের জীবন্মৃতের মত জীবন বদলে দিল অলিভারকে। পোড়-খাওয়া, শক্তপোক্ত এক মানুষ হয়ে উঠল ও।

হারিয়ে গেল আবেগ-অনুভূতি। নেপলসের প্রথম যাত্রাটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন। টানা আট থেকে দশ ঘণ্টা দাঁড় টানতে হতো ওদেরকে, এক মুহূর্ত বিশ্রাম পাওয়া যেত না। সে-চেষ্টা করলে উন্মুক্ত পিঠের উপর জুটত চাবুকের আঘাত, হতে হতো রক্তাক্ত। চিকিৎসা জুটত না, মুছতে দেয়া হতো না রক্তও। একটাই কাজ ছিল ওদের—দাঁড় টানা। সামনে-পিছনে... সামনে-পিছনে। হাত আর কাঁধের পেশি টন টন করত, ঘোলা হয়ে আসত চোখের দৃষ্টি, তবু থামাথামি নেই। পানির আওয়াজ, দাঁড়ের ক্যাঁচকোঁচ, শেকলের ঝনঝনানি... এই-ই ছিল ওদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এভাবেই কাটল সময়। দিনের বেলা সূর্যের প্রখর রোদে চামড়া ঝলসাল, রাতের কুয়াশায় আবার হলো ঠাণ্ডা। সারা গায়ে পড়ল ময়লার আস্তর, মুখ ঢেকে গেল জট পাকানো চুল-দাড়িতে। মাঝে-মধ্যে বৃষ্টির পানিতে শরীর ধুয়ে যায়, নইলে দুর্গন্ধে দম আটকে মরতে হতো। খাবার বলতে শুকনো বিস্কুট বা বাসি ভাত... এমনকী পরিষ্কার পানিও মিলত না ঠিকমত। কঠোর পরিশ্রম আর খাদ্যাভাবে শরীর শুকিয়ে দড়ির মত হতে থাকল ক্রীতদাসদের।

একবারের সমুদ্রযাত্রায় স্কার্ভি ছড়াল জাহাজে, মাল্লাদের মাঝে অন্যান্য রোগব্যাধি তো আছেই। জীবন কতটা মূল্যহীন, তা সে-বারই প্রথম প্রত্যক্ষ করল অলিভার। সংক্রমণের ভয়ে মৃতদের পাশাপাশি অসুস্থদেরকেও পানিতে ছুঁড়ে ফেলল নাবিকরা। এভাবে... রোগে ভুগে কিংবা পরিশ্রমের ধকল সহ্য করতে না পেরে প্রথম মাসেই মারা গেল অনেক ক্রীতদাস। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মৃত্যুর হার আরও বাড়ল। তবে তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই স্প্যানিয়ার্ডদের। একেকটা বন্দরে থামে, আর নতুন দাস

জোগাড় করে ওরা। অসাধারণ প্রাণশক্তি যাদের আছে, তারাই কেবল টিকে রইল শেষ পর্যন্ত।

হাতে গোনা সে-সব সৌভাগ্যবানদের মধ্যে অলিভার একজন। আরেকজন হচ্ছে ওর-ই এক প্রতিবেশী, যুবক এক মূর... পাশাপাশি বসে দাঁড় টানে ওরা। সঙ্গীটি শুরু থেকেই নজর কেড়েছে ওর। বলিষ্ঠ, নির্বিকার... কোনও ব্যাপারেই অভিযোগ নেই তার মধ্যে। শান্তভাবে যেন মেনে নিয়েছে অদৃষ্টকে। শুরুতে বেশ কিছুদিন কোনও কথা হয়নি ওদের মধ্যে। হাজার হোক, সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মের দুজন মানুষ, চোখের পলকে একাত্ম হতে পারার কথা না। তবে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কমে এল ওদের মধ্যকার দূরত্ব, দুই দুর্ভাগা ভুলে গেল ধর্মের বিভেদ, হয়ে উঠল পরস্পরের সমব্যথী।

এক সন্ধ্যায় ইহুদি এক দাস অসুস্থ হয়ে পড়ল। মরণাপন্ন দশা, বাঁচার আশা নেই। ওর পিছনে সময় নষ্ট করতে রাজি হলো না স্প্যানিয়ার্ডরা। শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগেই হতভাগ্য মানুষটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হলো সমুদ্রে। দৃশ্যটা এতই মর্মান্তিক যে, দুঃখ আর ব্যথায় ভরে উঠল অলিভারের অন্তর। গাল দিয়ে বসল গোটা খ্রিস্টান জাতিকে। পাশে বসা মূরের দিকে ফিরে বলল:

'আমার ধারণা, নরক তৈরিই করা হয়েছে খ্রিস্টানদের জন্য। তাই ওরা দুনিয়াকেও নরকে পরিণত করছে।'

কপাল ভাল, ঢেউ আর দাঁড় টানার আওয়াজে চাপা পড়েছে ওর কণ্ঠ। স্প্যানিয়ার্ডদের কানে ওর শাপ-শাপান্ত গেলে কী ঘটত বলা যায় না। তবে মূর কথাটা ঠিকই শুনতে পেয়েছে। জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখের দৃষ্টি।

'এরচেয়ে সাত গুণ উত্তপ্ত দোজখ অপেক্ষা করছে ওদের জন্য,

ভাই,' বলল সে। কণ্ঠে দৃঢ় বিশ্বাস। 'কিন্তু... তুমি নিজেও কি খ্রিস্টান নও?'

'এই মুহূর্ত থেকে ওই ধর্মকে ত্যাগ করলাম আমি,' বলল অলিভার। 'যে-ধর্মের নামে এমন অনাচার চলে, তাকে আমি স্বীকার করি না। তাকিয়ে দেখো ওই পাষণ্ডগুলোর দিকে। ঈশ্বরের পুজো করে, নিজেদেরকে ধার্মিক বলে পরিচয় দেয়। কী জানে ওরা ধর্মের? দামি মদ, ভাল খাবার আর সুন্দরী মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছুই চেনে না ওরা। মানুষকে যদি মানুষ বলেই মর্যাদা না দিল, তা হলে কী মূল্য ওই ধর্মের?' রেগে গেল ও। 'চুলোয় যাক খ্রিস্টান জাত আর খ্রিস্টধর্ম। আমি আর ওসব মানি না।'

'কিন্তু তাঁরপরেও আমরা আল্লাহ্‌র বান্দা,' বলল ওর সঙ্গী। 'তাঁর কাছেই একসময় ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে।'

সেদিন থেকে পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠল অলিভার আর এই মূর... তার নাম ইউসুফ-বিন-মুখতার। ইংরেজ সঙ্গীটির প্রতিক্রিয়া দেখে বিশ্বাস জন্মাল মুসলিম যুবকটির মধ্যে—আল্লাহ্‌ ওর দৃষ্টি খুলে দিতে শুরু করেছেন, সত্যিকার ধর্মবিশ্বাসকে গ্রহণ করবার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠেছে অলিভার। ইউসুফ নিজেও ধর্মপ্রাণ, অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ্-র রাস্তায় আনাকে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে। তাই সেদিন থেকে ধীরে ধীরে অলিভারকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ধারণা দিতে শুরু করল ও। বর্ণনা করতে থাকল আল্লাহর মাহাত্ম্য। পরম করুণাময়ের প্রতি বিধর্মী বন্ধুটির অনুরাগ সৃষ্টি করবার প্রয়াস আর কী।

খুব যে প্রভাবিত হলো অলিভার, তা নয়। প্রতিক্রিয়াহীনভাবে ইউসুফের বক্তব্য শুনে গেল ও। মনে হলো, নতুন কিছু নয় এসব। খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কেও এ-ধরনের প্রশংসা প্রচুর শুনেছে। তবে মনের কথা মুখে প্রকাশ করল না। নতুন বন্ধুটিকে কষ্ট

দেবার কোনও ইচ্ছে নেই ওর। দুর্ভাগ্যে ভরা জীবনে একজন সঙ্গী পাওয়াও মস্ত ব্যাপার। তাই নীরবে শুনল ইউসুফের সব কথা, কখনও কখনও আলোচনাতেও অংশ নিল। দু'জনের মধ্যকার এই আলাপচারিতার ফল হিসেবে মাসছয়েক পর দেখা গেল, আরবী ভাষা শিখে গেছে অলিভার, আফ্রিকান উপকূলের খাঁটি অধিবাসীদের মতই বলতে পারছে ভাষাটা।

যা হোক, ষষ্ঠ মাসের শেষে বিশেষ একটা ঘটনা ঘটল... আর সেটাই ক্রীতদাসের জীবন থেকে মুক্তি এনে দিল অলিভারকে। ততদিনে একেবারে বদলে গেছে ও। হাত-পা হয়ে গেছে পাথরের মত শক্ত, তাতে হাতির মত শক্তি। দাঁড় টানার কাজটাই এমন—হয় কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মরতে হবে, কিংবা পরিণত হতে হবে পুরোদস্তুর অতিমানবে। অলিভারের বেলায় দ্বিতীয়টা ঘটেছে। ছ'মাসের হাড়ভাঙা পরিশ্রম রক্তমাংসের দেহকে বানিয়ে ফেলেছে খাঁটি লোহা—যা কখনও ক্লান্ত হয় না, কখনও দম হারায় না... কোনও ধরনের দৈহিক কষ্টের সামনে ভেঙে পড়ে না।

জেনোয়া থেকে ফিরছিল জাহাজ, বালেরিক দ্বীপপুঞ্জের মিনোর্কা-র কাছে পৌঁছুতেই হঠাৎ মুসলিমদের চার জাহাজের এক নৌ-বহর বহর হামলা করল ওদের উপর। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল স্প্যানিয়ার্ডদের মধ্যে, ক্ষণে ক্ষণে শোনা গেল একটামাত্র নাম—আসাদ-আদ-দীন... কর্সেয়ারদের নেতা, দুর্ধর্ষ মুসলিম বীর। জাহাজগুলো নাকি তার-ই! বেজে উঠল দামামা আর শিঙা, ছুরি-তলোয়ার-বর্শা... যে যা পেল, তা-ই নিয়ে তৈরি হলো নাবিকরা নিজেদের জীবন আর জাহাজকে রক্ষা করতে। গোলন্দাজ-রা ছুটে গেল কামানের কাছে, কিন্তু ওগুলোকে গোলা ছুঁড়বার জন্য তৈরি করতে প্রচুর সময় লেগে গেল। হামলার আশঙ্কা করেনি স্প্যানিয়ার্ড-রা, কামানের গোলা-বারুদ সযত্নে

রেখে দিয়েছিল পাটাতনের তলায়। সেগুলো বের করে আনতে না আনতেই পৌঁছে গেল কর্সেয়ার-রা। একপাশ থেকে অনেকগুলো আঁকশি এসে আটকে গেল বুলওঅর্কে, ওগুলোর পিছনে বাঁধা দড়ির টানে আসাদ-আদ-দীনের জাহাজ পাশ থেকে এসে সজোরে আঘাত হানল স্প্যানিশদের খোলে।

সংঘর্ষের ফলাফল হলো ভয়াবহ। চাপ খেয়ে ভেঙে গেল পনেরোটা দাঁড়। ক্রীতদাস মাল্লাদের আর্তনাদ ভেসে এল চারপাশ থেকে। ভাঙা দাঁড় থেকে ছুটে আসা কাঠের টুকরোয় আহত-নিহত হয়েছে ওদের বেশ ক'জন। অলিভারের ভাগ্যও তা-ই হতে পারত, বেঁচে গেল স্রেফ ইউসুফের উপস্থিতবুদ্ধির কারণে। কী ঘটতে যাচ্ছে, তা আঁচ করতে পেরেছিল সে। সংঘর্ষের আগেই দাঁড় ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়েছে ওদের আসন থেকে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে পাটাতনের উপর। চেঁচিয়ে অলিভারকেও তা-ই করবার নির্দেশ দিল। দ্বিরুক্তি না করে তার সঙ্গী হলো তরুণ ইংরেজ, ফলে বেঁচে গেল মৃত্যুর হাত থেকে।

অস্ত্রের ঝনঝনানি আর মানুষের হুঙ্কার-আর্তনাদে একটু পরেই ভরে গেল পরিবেশ। মাথা তুলে পরিস্থিতি দেখে নিল অলিভার। একদফা কামান দেগেছে স্প্যানিয়ার্ডরা, বুলওঅর্কের উপর এখন ধোঁয়ার মেঘ ভাসছে। তবে তাতে বিশেষ উপকার হয়েছে বলে মনে হলো না। কারণ এরই মধ্যে পাশে ভিড়েছে কর্সেয়ারদের একটা জাহাজ, সেটা থেকে লাফঝাঁপ দিয়ে খুনে জলদস্যুরা চড়তে শুরু করেছে ওদের জাহাজে। লম্বা, সুঠাম, কিঞ্চিৎ বয়স্ক একজন মানুষ নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের। সাদা পাগড়িতে মাথা ঢাকা তার, সেটা আবার রত্নখচিত; শুভ্র দাড়িতে ভরা চেহারাটা ঈগলের মত তীক্ষ্ণ। হাতে বিশাল এক তলোয়ার নিয়ে প্রবল-বিক্রমে লড়ে যাচ্ছে মানুষটা, একাই যেন একশো! কেউ টিকতে পারছে না তার

সামনে। ক্ষণে ক্ষণে স্লোগান দিয়ে উৎসাহ জাগাচ্ছে মুসলিম সঙ্গীদেরকে।

'দীন! দীন! আল্লাহ... ইয়া আল্লাহ!'

জাহাজজুড়ে বইল রক্তের নহর, বিনা-বিচারে খুন হয়ে যেতে থাকল স্প্যানিয়ার্ডরা। কিছুতেই পেরে উঠছে না দুর্ধর্ষ মুসলমানদের সঙ্গে। পাশে তাকিয়ে ইউসুফকে শেকল নিয়ে টানা-হেঁচড়া করতে দেখল অলিভার, মুক্তি পেতে চাইছে। সাহায্য করল ও। দু'জনে মিলে একসঙ্গে টানতে শুরু করল শেকল, একটু পরেই সেটা হার মানল, গোড়াটা উঠে এল কাঠ ভেঙে। একইভাবে নিজেও মুক্ত হলো।

বন্দিদশা কেটে যাওয়ায় প্রতিশোধের নেশা ভর করল অলিভারের মধ্যে। তা ছাড়া জাত-সৈনিক ও, চারপাশের যুদ্ধের মাঝখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। এ-মুহূর্তে মুসলমানরাই ওর মিত্র, তাই নির্দ্বিধায় *দীন-দীন* বলে চিৎকার করল ও, যোগ দিল লড়াইয়ে। হাতের শেকল বনবন করে ঘোরাচ্ছে, ওটাই ওর অস্ত্র। যোগ্য যোদ্ধার হাতে পড়ে সেটা ভাল কাজও দেখাল। ডেকের একপ্রান্তে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল একদল স্প্যানিয়ার্ড, ঠেকিয়ে রেখেছিল কর্সেয়ারদেরকে। পিছন থেকে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তরুণ ইংরেজ। শেকলের আঘাতে থেঁতলে দিল দু'জনের মুখ, আরেকজনকে শ্বাসরুদ্ধ করল ওটা গলায় পেঁচিয়ে। ওর পিছু পিছু ইউসুফও ছুটে এল ভাঙা দাঁড়ের একটা অংশ হাতে নিয়ে। বলা বাহুল্য, এমন আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না স্প্যানিয়ার্ডরা। চমকে গেল তারা, দুই ক্রীতদাসকে ঠেকাতে গিয়ে ভুলে গেল সামনে থাকা কর্সেয়ারদের কথা, শেষ পর্যন্ত দ্বিমুখী আক্রমণে পটল তুলল। তাই বলে ওখানেই শেষ হলো না অলিভারের

আক্রোশ, নিহত এক স্প্যানিয়ার্ডের তলোয়ার হাতে তুলে নিয়ে আরেকদিকে ছুটে গেল ও।

সেদিনকার লড়াইয়ের খুঁটিনাটি মনে নেই তরুণ ইংরেজের। পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল, স্প্যানিয়ার্ডদের যাকে সামনে পেয়েছে, তাকেই খুন করেছে নির্দয়ভাবে। মৃত্যু-টৃত্যুর কথা ভাবেনি একবারও, শুধু ভেবেছে প্রতিশোধের কথা... প্রতিহিংসার কথা। ভয়াল আক্রোশের উন্মাদনা শেষে যখন ওর সংবিৎ ফিরল, তখন শেষ হয়ে গেছে যুদ্ধ—হাতে-গোনা অল্প কিছু জ্যান্ত স্প্যানিয়ার্ডকে পাটাতনে জড়ো করায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কর্সেয়াররা, সেই সঙ্গে জাহাজের আনাচ-কানাচ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে দামি জিনিসপত্র, খুলে দেয়া হচ্ছে ক্রীতদাসদের বাঁধন, তাদের অনেকেই ঈমানদার মুসলমান।

নিজেকে কর্সেয়ারদের শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত নেতার সামনে আবিষ্কার করল অলিভার। পাটাতনে তলোয়ার ঠেকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে আছেন তিনি, বিস্ময় আর সামান্য কৌতুক মেশানো দৃষ্টিতে দেখছেন ওকে। দেখবার মত চেহারাই হয়েছে বটে ওর—সারা শরীর শত্রুর রক্তে ভেজা, মনে হচ্ছে যেন গোসল করে এসেছে। জট-পাকানো চুল-দাড়ি, হাত-পায়ের শেকল আর চোখের বুনো দৃষ্টি মিলিয়ে ওকে দেখাচ্ছে মূর্তিমান দানবের মত!

কর্সেয়ার নেতার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইউসুফ। তার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, এমন ভয়ঙ্কর যোদ্ধা জীবনে দেখিনি আমি! মনে হচ্ছিল খোদ রাসূল (সাঃ) ওর উপর ভর করেছেন বিধর্মী শয়তানগুলোকে ধ্বংস করবার জন্য।'

মুচকি হাসি ফুটল অলিভারের ঠোঁটে। বলল, 'আমি শুধু ওদের চাবুকের আঘাতগুলোর মূল্য চুকাচ্ছিলাম... সুদ সমেত।'

এভাবেই ওর সঙ্গে পরিচয় ঘটল আলজিয়ার্সের বাদশাহ্

আসাদ-আদ-দীনের। পরে তাঁর জাহাজে চেপে বারবারি-তে পৌঁছুল অলিভার। চুল কেটে, গোসল করে ভদ্রস্থ হবার সুযোগ পেল ও। খেতে পারল পেট পুরে। নতুন পোশাক পেল—মূরদের পোশাক... পাগড়ি আর ঢোলা কোর্তা-পাজামা... বিনা আপত্তিতে সেগুলো চড়াল গায়ে। তারপর ওকে নিয়ে যাওয়া হলো আসাদ-আদ-দীনের সামনে।

ইউসুফ-বিন-মুখতার যে সাধারণ কোনও মূর নয়, সেটা টের পেল অলিভার তখনই। আসাদ-আদ-দীনের আপন ভাইপো সে, মুসলিমদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব। খ্রিস্টানদের হাতে সে ধরা পড়ায় শোক নেমে এসেছিল বারবারি উপকূলে, মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছে আনন্দ। হালকা মেজাজে আছেন বাদশাহ্ নিজেও। সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে ইউসুফ, তোয়াজ করে তাঁকে জানিয়েছে, ইংরেজ বন্ধুটি ইসলামের দীক্ষা পাবার জন্য উপযুক্ত, খাঁটি মুসলমান হবার মত সমস্ত গুণ আছে ওর মধ্যে। এমনিতেই বাদশাহ্‌র সমীহ আদায় করে নিয়েছে অলিভার, বীরত্বের মর্যাদা দিতে জানেন তিনি। ভাইপোর সুপারিশ পেয়ে আরও খানিকটা নরম হয়ে গেলেন।

কাজেই অলিভার যখন হাজির হলো সামনে, আসাদ-আদ-দীন ওকে প্রস্তাব দিলেন—ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর দলে যোগ দিতে। ওর মত দুর্ধর্ষ যোদ্ধাকে পেলে খ্রিস্টানদেরকে খতম করবার কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে তাঁর জন্য। কিন্তু... ও যদি ধর্মান্তরিত হতে রাজি না হয়, ফিরে যেতে হবে ক্রীতদাসের জীবনে। টানতে হবে দাঁড়... এবার মুসলমানদের জাহাজে। বলা বাহুল্য, মানবেতর ওই জীবনে প্রত্যাবর্তনের কোনও ইচ্ছে নেই অলিভারের। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবার ব্যাপারে ক্ষীণ আপত্তি আছে বটে, কিন্তু ভালমত ভেবে দেখল—ওতে আসলে বিশেষ

ক্ষতি নেই। ওটা স্রেফ অজুহাত, আসলে বাদশাহ্ চাইছেন ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ওকে ব্যবহার করতে। মজার ব্যাপার হলো, সেই শত্রুরা ওর নিজের শত্রুও বটে। প্রস্তাবটা গ্রহণ করলে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করতে পারবে ও। সাত-পাঁচ ভেবে রাজি হয়ে গেল তাই।

কলেমা পড়িয়ে সাদরে অলিভারকে বরণ করে নেয়া হলো মুসলিমদের মাঝে। ইউসুফ-বিন-মুখতারের *কায়িয়া,* অর্থাৎ সহকারী হিসেবে নিয়োগ করা হলো ওকে। তার সঙ্গে নতুন এক জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অভিযানে। অংশ নিল একের পর এক যুদ্ধে, যাতে যোদ্ধা এবং কৌশলী হিসেবে ইংরেজ তরুণটির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল পুরো ভূমধ্যসাগরে। মাসছয়েক পর সিসিলি উপকূলে মাল্টার নাইটদের এক রণতরীর সঙ্গে লড়াইয়ের সময় গুরুতর আহত হলো ইউসুফ। জয়ী হলো মুসলিমরা, কিন্তু তাকে বাঁচানো গেল না। অলিভারের কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল বেচারা, কিন্তু তার আগে জাহাজের নেতৃত্ব তুলে দিয়ে গেল বন্ধুটির হাতে। আলজিয়ার্সে ফেরার পর আনুষ্ঠানিকভাবে সেটার স্বীকৃতি দিলেন বাদশাহ্।

নিজের একটা জাহাজ পেয়ে গেল অলিভার। সেটা নিয়ে নব-উদ্যমে শুরু করল অভিযান। খুব শীঘ্রি ওর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সবখানে। অলিভার নামটা হারিয়ে গেল ওর কীর্তি-কাহিনির তলায়; শাকের-আল-বাহার, মানে সাগরের বাজপাখি হিসেবে সবাই ডাকতে শুরু করল ওকে। বাজপাখির মত ঝটিকা আক্রমণ চালাবার জন্যই হলো এ-নাম, যা পৌঁছে গেল ইয়োরোপের খ্রিস্টান রাজ্যগুলোতেও। খুব শীঘ্রি আসাদ-আদ-দীনের লেফটেন্যান্টে পরিণত হলো ও, মানে পুরো আলজিরিয়ান নৌ-বহরের উপ-অধিনায়ক বা সেনাপতি। পদবীর দিক থেকে

দ্বিতীয় হলেও আসলে নৌ-বহরের হর্তা-কর্তাই বলা যায় অলিভারকে, কারণ বাদশাহ্-র বয়স হয়েছে, এখন আর আগের মত সমুদ্রযাত্রায় যেতে পারেন না তিনি। ইসলামের নামে, আসাদ-আদ-দীনের একের পর এক অভিযান চালায় শাকের-আল-বাহার, কখনোই খালি হাতে ফেরে না।

সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই, আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে দুঃসাহসী এই কর্সেয়ারের প্রতি। সর্বশক্তিমান নিজেই যেন ওকে বাছাই করেছেন ইসলামের জয়যাত্রায় নেতৃত্ব দেবার জন্য। শুরুতে অলিভারকে সমীহ করতেন আসাদ-আদ-দীন, ধীরে ধীরে ভালওবাসতে শুরু করলেন। তাঁর মত ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য সেটাই স্বাভাবিক। নাবালক এক সন্তান আছে বাদশাহ্-র, কিন্তু সে শাসনভার গ্রহণের জন্য তৈরি নয়; তাই সবাই একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গেল—আসাদের মৃত্যুর পর শাকের-আল-বাহারই আলজিয়ার্সের সিংহাসনে বসতে চলেছে, ঠিক যেভাবে বারবারোসা, ওকিয়ালি-সহ অন্যান্য খ্রিস্টান দলত্যাগীরা মুসলিম কর্সেয়ারদের রাজপুত্রে পরিণত হয়েছিল।

অলিভার যে তর্ক বা সন্দেহের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে ছিল, তা বলা যাবে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওর কর্মকাণ্ড ভ্রূকুটি সৃষ্টি করেছে কর্সেয়ারদের মধ্যে। সে-সব ব্যাপারে ধীরে ধীরে জানতে পারবেন পাঠক। তবে একটা ঘটনা এখানেই বলে দেয়া ভাল। ইউসুফের মৃত্যুর ছ-সাত মাস পরে ঘটেছিল সেটা। সেবার অভিযান শেষে আলজিয়ার্সে ফিরে অলিভার দেখল, আরেকটা জাহাজ ওর বেশ ক'জন স্বদেশীকে... মানে ইংরেজকে ধরে নিয়ে এসেছে। কারও সঙ্গে কোনও ধরনের আলোচনা ছাড়া... বলতে গেলে একতরফাভাবে... ও হুকুম দিল বন্দিদেরকে মুক্তি দেবার জন্য। বলা বাহুল্য, অনেকেই বেজায় নাখোশ হলো ওর এই আচরণে।

বিষয়টা বাদশাহ্-র কান পর্যন্ত গড়াল। অলিভারকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

সমন পেয়ে মাথা গরম হয়ে গেল অলিভারের। অনেকদিন থেকে কর্সেয়ারদের সঙ্গে আছে ও, নিজের আনুগত্যের চরম পরীক্ষা দিয়েছে, মুসলমানদের মাথা উঁচু করেছে সবখানে, তারপরেও যদি সামান্য ক'জন বন্দিকে মুক্তি দেবার অধিকার না থাকে, তা হলে এসব করে লাভ কী? রাজদরবারে গিয়ে এসব কথাই বলল ও। বাদশাহ্ বিজ্ঞ মানুষ, নরম কণ্ঠে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, ওর বীরত্ব বা আনুগত্য নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলছে না; সবাই শুধু জানতে চায়, ইংরেজ বন্দিদেরকে ও ছেড়ে দিল কেন? জবাবে অলিভার জানাল—ধর্ম বদলালেও স্বদেশী মানুষের সঙ্গে বেঈমানী করতে পারবে না ও। অস্ত্র ধরবে না ওদের বিরুদ্ধে। বরং কখনও কোনও ইংরেজ ধরা পড়লে তাকে মুক্তি দেবে। কর্সেয়ারদের কোনও ক্ষতি হবে না এতে, কারণ মুক্তিপ্রাপ্ত একেকজন ইংরেজের বদলে দু'জন করে স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, গ্রিক বা ফরাসি বন্দি সরবরাহ করবে ও।

অলিভারের আবেগ লক্ষ করে প্রস্তাবটা মেনে নিলেন আসাদ-আদ-দীন। তবে শর্ত জুড়ে দিলেন, কাউকে মুক্তি দিতে চাইলে তাকে প্রথমে কিনে নিতে হবে। কিনতে হবে নিজেরই পয়সায়। মানুষটা ওর সম্পত্তি হয়ে যাবার পর মুক্তি দিক, বা কাজে লাগাক... তা নিয়ে কারও কিছু বলবার থাকবে না। বাদশাহ্-র এই সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিল অলিভার। সেই থেকে আলজিয়ার্সের বাজারে কোনও ইংরেজ দাস এলেই খবর চলে যেত ওর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কিনে নিত অলিভার, নিজ খরচে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করত। এতে প্রচুর টাকা খরচ হতো ওর, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতি অভিযানে এত আয় হতো যে

ওসব গায়ে লাগত না।

এসব বিবরণ পড়ে পাঠক হয়তো ভাবছেন, অতীত জীবনের কথা ভুলে গেছে অলিভার। ভুলে গেছে কর্নওয়ালে ফেলে আসা সুন্দরী প্রেমিকাটিকে, কিংবা সৎ ভাইয়ের নির্মম বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। তার প্রমাণ পাওয়া গেল একদিন, যখন বিস্কেন-আল-বোরাক, মানে ওর ভবিষ্যৎ-সহকারী, আলজিয়ার্সের দাস-বাজারে অল্পবয়েসী এক কর্নিশ বন্দিকে নিয়ে হাজির হলো। ছেলেটির নাম পিট, তার পিতাকে চেনে অলিভার।

বরাবরের মত বন্দিকে কিনে নিল ও, তারপর নিয়ে গেল ওর নিজের বাড়িতে। অতিথির মত খাতির করল পিটকে, তারপর রাত জেগে কথা বলল। একের পর এক প্রশ্ন করে জেনে নিল, গত দু'বছরে... মানে ওর অনুপস্থিতিতে কী ঘটে গেছে কর্নওয়ালে। যত জানল, ততই উদ্বেল হয়ে উঠল হৃদয়। যেন খুলে গেল শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতের মুখ। আবারও রোজামুণ্ডের জন্য তীব্র টান অনুভব করল অলিভার, অনুভব করল লায়োনেলের প্রতি প্রতিহিংসার ছাইচাপা আগুন। ঠিক করল, সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, রোজামুণ্ডকে সব সত্য জানিয়ে দেবে। বিশ্বাসঘাতক ভাইটির গোমর আর রক্ষা করবার কোনও মানে হয় না।

একটা চিঠি লিখল অলিভার। পিটার গডলফিনের মৃত্যু-রহস্য, এবং তারপর ঘটে যাওয়া সব ঘটনার বিবরণ দিল তাতে। নিজের নির্দোষিতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, মাস্টার বেইনের স্বাক্ষর করা প্রমাণপত্রটা কোথায় পাওয়া যাবে, উল্লেখ করল তা-ও। পেনারো হাউসের লাইব্রেরির একটা বইয়ের ভিতর লুকানো আছে সেটা, লায়োনেলের জানা নেই। পিটকে ওটা উদ্ধারের জন্য ভৃত্য নিকোলাসের সাহায্য নিতে পরামর্শ দিল অলিভার। ইতোমধ্যে হতভাগ্য নাইটের দুঃখের কাহিনি জানতে পেরেছে পিট, সানন্দে

রাজি হলো ওকে সাহায্য করতে। চিঠিটা তার হাতে দিল অলিভার, তারপর ব্যবস্থা করল ছেলেটার জেনোয়া যাবার। ওখান থেকে সে ইংল্যাণ্ডগামী জাহাজে চড়তে পারবে।

তিন মাস পর চিঠি এল পিটের কাছ থেকে। নিরাপদে কর্নওয়ালে পৌঁছেছে সে, অলিভারের কথামত নিকোলাসের সাহায্য নিয়ে প্রমাণপত্রটাও সংগ্রহ করতে পেরেছে। তারপর অলিভারের চিঠি আর প্রমাণপত্র... দুটো নিয়ে সশরীরে দেখা করেছে লেডি রোজামুণ্ডের সঙ্গে—তিনি এখন সার জন কিলিগ্রুর সঙ্গে আরওয়েনাকে থাকছেন। সুখবর বলতে এতটুকুই, এরপর রয়েছে দুঃসংবাদ। পিট কার পক্ষ থেকে এসেছে, সেটা শোনামাত্র নাকি রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল রোজামুণ্ড। চিঠি আর প্রমাণপত্রটা খুলেও দেখেনি, পিটের চোখের সামনেই ছুঁড়ে ফেলেছে জ্বলন্ত ফায়ারপ্লেসে। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ওগুলো। দুঃখ প্রকাশ করে ছেলেটি জানিয়েছে, কিছুই করার ছিল না তার। অলিভারকে নির্দোষ প্রমাণ করবার কোনও উপায় নেই আর।

শোকে স্থবির হয়ে গেল অলিভার চিঠিটা পড়ে। কামরায় ঢুকে নিজেকে বন্দি করে ফেলল বেশ ক'দিনের জন্য। ভিতরে কী ঘটেছে, তা জানা নেই কারও। ভৃত্যরা শুধু ওর দীর্ঘশ্বাস আর কান্নার শব্দ শুনেছে। আবেগ-অনুভূতির কোনও বহিঃপ্রকাশ বলতে সে-ই শেষ। কামরা থেকে যেদিন অলিভার বেরিয়ে এল, একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে ও। আগের চেয়ে বেপরোয়া... আগের চেয়ে নিষ্ঠুর... হৃদয়হীন স্রেফ একটা পাথর। সেদিনের পর থেকে ইংরেজ দাসদেরকে নিয়ে মাথা ঘামানো বন্ধ করে দিল, কাউকে আর মুক্তি দিল না। দিল শুধু যন্ত্রণা আর অত্যাচার—নির্মম এক জলদস্যুর কাছ থেকে যা আশা করা যায়।

পাঁচ বছর কাটল এভাবে। এ-পাঁচ বছরে ওর খ্যাতি বা

কুখ্যাতি যা-ই বলা হোক না কেন, লেলিহান আগুনের শিখার মত বাড়ল। ওর নাম পরিণত হলো ভয়াবহ এক ত্রাসে। মাল্টা, নেপলস্ আর ভেনিস থেকে ঘোষণা করা হলো পুরস্কার—ওকে জ্যান্ত বা মৃত অবস্থায় ধরে আনার জন্য। বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনী ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে গেল ওর নির্মম জলদস্যুতার অবসান ঘটাতে। কিন্তু আল্লাহ্‌র অশেষ করুণায় কেউই কিছু করতে পারল না শাকের-আল-বাহারের। প্রতিটা লড়াইয়ে জয় হতে থাকল কর্সেয়ারদের এই অকুতোভয় নেতার।

তারপর... পঞ্চম বছরের বসন্তে... হঠাৎ আরেকটা চিঠি এল কর্নিশ পিটের কাছ থেকে। কৃতজ্ঞতার বশে লেখা চিঠি, অলিভারের উপকারের কথা আজও ভোলেনি সে। ছেলেটা জানাল—এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা অলিভারকে জানানো উচিত বলে মনে হয়েছে তার। পিটকে নাকি গ্রেফতার করিয়েছিলেন সার জন কিলিগ্রু, অত্যাচার করে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছেন—অলিভার ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, হয়ে গেছে জলদস্যু। আদালতে ওর এই সাক্ষ্য দেখিয়ে অলিভারকে আইনতঃ মৃত বলে ঘোষণা করিয়েছেন তিনি, এর ফলে ট্রেসিলিয়ান পরিবারের সমস্ত সহায়-সম্পত্তির বৈধ মালিকানা পেতে যাচ্ছে লায়োনেল।

এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু ছিল না, কিন্তু চিঠির পরের অংশে যে-খবরটা আছে, তা-ই অলিভারকে অশান্ত করে তুলল। পিট জানিয়েছে, দু'বছরের জন্য ফ্রান্সে লেখাপড়া করতে গিয়েছিল রোজামুণ্ড, কিছুদিন আগে ফিরেছে... আর দেশে ফেরামাত্র লায়োনেলের সঙ্গে বাগদান হয়ে গেছে ওর, আগামী জুনে বিয়ে। সার জন-ই নাকি উদ্যোগ নিয়েছেন ওদের দুজনের এই বিয়ের—তিনি চান, সংসার হোক রোজামুণ্ডের, কঠিন দুনিয়ার

বিপদ-আপদ থেকে ওকে রক্ষা করবার জন্যও নাকি একজন স্বামী দরকার। তিনি নিজে আর ওর দেখভাল করতে পারবেন না, খুব শীঘ্রি নাকি জাহাজ কিনে ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে যাবেন। এলাকায় ব্যাপারটা বেশ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, সবাই খুব আনন্দিত। হাজার হোক, দীর্ঘদিনের সংঘাতশেষে এই বিয়ের মাধ্যমে একত্র হতে যাচ্ছে কর্নওয়ালের সবচেয়ে অভিজাত দুই পরিবার।

চিঠির এটুকু পড়ে আপনমনে হেসে উঠল অলিভার। ভাল করেই বুঝতে পারছে—বিয়েটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, আসলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে দুই জমিদারি একত্র হবার সম্ভাবনা। মাথার উপর দুই প্রভুর বদলে এক প্রভু থাকলে কে না খুশি হয়! কর্নওয়ালের প্রজারাও তা-ই হচ্ছে। এই বিয়ে আসলে হতে যাচ্ছে বিশাল দুটো এস্টেট, ফসলি জমি আর বন-বনানীর মধ্যে। দুজন নারী-পুরুষ যে জড়িত আছে ওগুলোর সঙ্গে, তা স্রেফ এক কাকতালীয় ঘটনা।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস টের পেয়ে তিক্ততায় ছেয়ে গেল অলিভারের অন্তর। ভাইয়ের সন্দেহভাজন খুনিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে রোজামুণ্ড শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে চলেছে সত্যিকার খুনিকে! কিন্তু এ-মুহূর্তে কী-ই বা করার আছে ওর? চুপচাপ সব মেনে নেয়া ছাড়া? অভিমানও কাজ করছে মনের ভিতর। কেন পরোয়া করবে ও? কেন এই বিয়েতে বাধা দিতে চাইবে? ভালবাসার জন্য? ন্যায়ের জন্য? না... ওসবের কোনও মূল্য নেই অলিভারের কাছে। ওর হৃদয় এখন পাথরের মত শক্ত। সেখানে কোনও কিছুর... বা কোনও মানুষের স্থান নেই।

চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল ও। পিট ওর উপকারের জন্য পাঠিয়েছিল ওটা, কিন্তু তাতে কোনও গুরুত্ব দিল

না। মনের অস্থিরতা কাটাবার জন্য তিনটে জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অলিভার নতুন অভিযানে। দু'সপ্তাহ পরে সে-অভিযানেই স্পারটেল অন্তরীপে ওই স্প্যানিশ গ্যালিয়ন দখল করল ও। দেখা পেল জ্যাসপার লেইয়ের।

চলুন এবার ফিরে যাই সেই কাহিনিতে।

তিন

ইংল্যাণ্ড অভিমুখে

দখল হয়ে যাওয়া স্প্যানিশ গ্যালিয়নের ক্যাপ্টেনের কেবিনে সন্ধেবেলায় জ্যাসপার লেইকে নিয়ে এল দুই কাফ্রি ভৃত্য, পেশ করল তাদের মনিবের সামনে।

দুষ্ট ক্যাপ্টেনের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত শাকের-আল-বাহার তার ইচ্ছের কথা জানায়নি। কিন্তু মাস্টার লেই জানে, সে অপরাধী, মস্ত অন্যায় করেছে অলিভারের প্রতি, তার সমস্ত দুর্দশার জন্য প্রত্যক্ষভাবে সে-ই দায়ী। এর ফল ভাল হতে পারে না। দেরিতে হলেও প্রতিশোধ নেবে প্রাক্তন নাইট, আর সে-কথা ভেবে ফোক্যাসলের বন্দিশালায় চরম উদ্বেগে ভুগেছে সে পুরোটা সময়।

'আবার দেখা হলো আমাদের, মাস্টার লেই,' অভিবাদন জানানোর সুরে তাকে বলল শাকের। 'তবে এবার অবস্থান বদলে

গেছে আমাদের... মানে, শেষবার যখন কোনও ক্যাপ্টেনের কেবিনে আমাদের কথা হয়েছিল... তখনকার হিসেবে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল লেই। 'তবে সে-বার আপনার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম আমি।'

'মূল্যের বিনিময়ে,' মনে করিয়ে দিল শাকের। 'মূল্য দিলে আজ আমার বন্ধুত্বও হয়তো পাবে তুমি।'

আশায় দুলে উঠল জ্যাসপার লেইয়ের হৃদয়।

'কী মূল্য চান, বলুন, সার অলিভার!' সাগ্রহে বলল সে। 'যদি সাধ্যে থাকে, তা চুকাতে দ্বিধা করব না। দাসত্বের জীবন যথেষ্ট ভোগ করেছি আমি।' হিসেবও দিল। 'পাঁচ-পাঁচটা বছর! তার মধ্যে চার বছরই কেটেছে স্পেনের বিভিন্ন জাহাজে। এমন একটা দিন যায়নি, যে-দিন আমি নিজের মৃত্যু কামনা করিনি। কল্পনাও করতে পারবেন না, কী সইতে হয়েছে আমাকে!'

'অমন শাস্তিই প্রাপ্য ছিল তোমার!' শীতল গলায় বলল শাকের, ভয় ঢুকিয়ে দিল লেইয়ের বুকে। 'আমাকে তুমি দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে যাচ্ছিলে... অথচ কোনোদিন তোমার কোনও ক্ষতি করিনি আমি, বরং বন্ধুর মত থেকেছি। মাত্র দুইশ' পাউণ্ডের জন্য...'

'না, না!' তাড়াতাড়ি বলে উঠল লেই। 'অমন ইচ্ছে কখনোই ছিল না আমার। কী কথা হয়েছিল আমাদের মধ্যে, তা কি মনে নেই আপনার? আপনাকে আমি বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব বলে কথা দিয়েছিলাম।'

'সত্য, তবে সেটার জন্যও টাকা দাবি করেছিলে। ফাঁসিতে ঝোলানো দরকার তোমাকে। কিন্তু কপাল ভাল তোমার, দক্ষ একজন পথ-প্রদর্শক দরকার আমার। পাঁচ বছর আগে যে-কাজ তুমি দুইশ' পাউণ্ডের বিনিময়ে করতে যাচ্ছিলে, আজ সেটা করবে

জীবন বাঁচাবার জন্য। বলো, আমার জাহাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজি আছ তুমি?'

'অবশ্যই!' বলল লেই। নিজের কানে বিশ্বাস করতে পারছে না, অলিভার তাকে এমন সুযোগ দিচ্ছে। 'আপনি বললে নরকেও যেতে রাজি আছি!'

'এ-যাত্রায় স্পেনে যাচ্ছি না আমি,' বলল শাকের-আল-বাহার। 'পাঁচ বছর আগে যেখানে নিয়ে যাবার কথা ছিল, সেখানেই তুমি নিয়ে যাবে আমাকে। ফাল নদীর মুখে, যাতে কর্নওয়ালের মাটিতে পা রাখতে পারি আমি। রাজি আছ?'

'হ্যাঁ... আনন্দের সঙ্গে,' নির্দ্বিধায় জানাল মাস্টার লেই।

'খুব ভাল। তা হলে শর্তগুলো জানিয়ে দিই। কাজটা সুষ্ঠুভাবে করবার বিনিময়ে জীবনভিক্ষা পাবে তুমি, সেইসঙ্গে নিজের মুক্তি। কিন্তু এ-কথা ভেবো না, ইংল্যাণ্ডে পৌঁছুনোমাত্র ছাড়া পাবে। জাহাজকে আবার আলজিয়ার্সে ফিরিয়ে আনতে হবে তোমাকে। তারপর তোমার বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করব আমি। যদি ঠিকঠাকমত দায়িত্ব পালন করো, হয়তো বা পুরস্কারও দেব। কিন্তু যদি পুরনো বদভ্যাসের চিহ্নমাত্র দেখি... বেঈমানীর আভাস পাই, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে জুটবে মৃত্যু। আমার এই দুই ভৃত্য ছায়ার মত পাশে থাকবে তোমার সবসময়।' ইশারায় দুই কাফ্রি পালোয়ানকে দেখাল। 'ওরা তোমার উপর নজর রাখবে। বিপদ হতে দেবে না, কিন্তু শয়তানি করলে গলা টিপে ধরবে। এবার তুমি যেতে পারো। জাহাজে চলাফেরার স্বাধীনতা দিচ্ছি তোমাকে, ভাল চাও তো পালাবার চেষ্টা কোরো না।'

নিজের সৌভাগ্যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে মাস্টার লেই। বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল, তারপর বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে। তার পিছু নিল দুই ভৃত্য। একটু পর শাকেরের সামনে

হাজির হলো বিস্কেন। জানাল, তার লোকেরা পুরো জাহাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। লড়াইয়ে কোনও ক্ষতি হয়নি খোলের। তবে তল্লাশি চালিয়ে গোলাবারুদ ছাড়া আর কোনও দামি মালামাল পাওয়া যায়নি। যাত্রীবাহী গ্যালিয়ন এটা, বন্দিদেরকে দাস হিসেবে বিক্রি করে কিছু টাকা পাওয়া যাবে, এর বেশি কিছু না। সব মিলিয়ে তেমন লাভজনক হয়নি এবারের হামলা।

জবাবে বিস্কেনকে বিস্মিত করে দিল শাকের।

'বন্দিদেরকে আমাদের জাহাজগুলোয় তোলো, বিস্কেন,' বলল ও। 'তারপর ওগুলো নিয়ে তুমি ফিরে যাও আলজিয়ার্সে। আমি এখানেই থাকছি। দুইশ' কর্সেয়ার দিয়ো শুধু আমার সঙ্গে। ওরা যোদ্ধা এবং নাবিকের দায়িত্ব পালন করবে।'

'আপনি আলজিয়ার্সে ফিরছেন না?' অবাক হয়ে জানতে চাইল বিস্কেন।

'উঁহুঁ। লম্বা একটা অভিযানে যাচ্ছি আমি। বাদশাহ্ আসাদ-আদ-দীনকে আমার সালাম জানিয়ো। আল্লাহ্ যেন তাঁকে রক্ষা করেন। ওঁকে বোলো, ছ'সপ্তাহের মধ্যে ফিরব আমি।'

শাকের-আল-বাহারের সিদ্ধান্ত শুনে বেশ সরগরম হয়ে উঠল তিন জাহাজের পরিবেশ। খোলা সাগরে জাহাজ চালাবার ব্যাপারে কোনও অভিজ্ঞতা নেই কর্সেয়ারদের, স্পারটেল অন্তরীপের এদিকটাতেই আসে না কখনও, ভূমধ্যসাগরের বাইরে তো যায়ইনি কেউ কোনোদিন। তা হলে লম্বা অভিযানে কোথায় যেতে চাইছে ওদের নেতা? তবে মনের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও মুখে তা প্রকাশ করল না কেউ। শাকের-আল-বাহারের উপর অগাধ আস্থা প্রত্যেকের, আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে তার উপর, আজ পর্যন্ত কোনও যুদ্ধে পরাজিত হয়নি। কাজেই সে যেখানে বলবে, সেখানেই যেতে রাজি আছে ওরা। অবশ্য অন্য কেউ হলে

কিছুতেই ওদেরকে রাজি করানো যেত না আটলান্টিকের বিপদসঙ্কুল পানিতে যেতে।

যা হোক, সহজেই দুইশ' নাবিক পেয়ে গেল শাকের... অভিযানে স্বেচ্ছায় যোগ দিল ওরা।

পাঠকদেরকে বলে রাখা ভাল, সদূরপ্রসারী কোনও পরিকল্পনার ফসল নয় অলিভারের এই অভিযান। আলজিয়ার্স ত্যাগ করবার সময় সত্যিই অমন কোনও ইচ্ছে ছিল না ওর। স্পারটেল অন্তরীপের পাহাড়ি চাতাল থেকে স্প্যানিশ গ্যালিয়নটাকে দেখতে পেয়েই প্রথমবারের মত মাথায় আসে, এমন একটা জাহাজ পেলে ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা করা যায়, কর্সেয়ারদের জাহাজে যেটা সম্ভব নয়। ওগুলো আকারে ছোট, তা ছাড়া একেবারে মার্কামারা বলা চলে... শত্রুদের চোখে পড়ামাত্র আক্রমণের শিকার হতে হবে। শুরুতে ব্যাপারটা ছিল অবচেতন মনের ক্ষণিক চিন্তামাত্র, কিন্তু গ্যালিয়ন দখলের পর জ্যাসপার লেইয়ের দেখা পেয়ে চিন্তাটা ডালপালা ছড়াতে শুরু করে।

ভেবে দেখে ও—এটা আসলে একটা সঙ্কেত। ইংল্যাণ্ডে যাবার সঙ্কেত! নইলে পিটের চিঠিটা পাবার পরেই এই গ্যালিয়ন ওর দখলে আসবে কেন... কেন দেখা হবে সেই মানুষটার সঙ্গে, যে ওকে পথ দেখিয়ে দেশে নিয়ে যেতে পারবে? অস্বীকার করবার উপায় নেই, বহুদিন থেকেই সুপ্ত একটা ইচ্ছে আছে ওর—কোনও একদিন ফিরবে কর্নওয়ালে, মুখোমুখি হবে রোজামুণ্ডের, ওকে বাধ্য করবে পিটারের মৃত্যুর বিষয়ে সত্যি কথাটা শুনতে। সার জনের সঙ্গেও দেখা হওয়া প্রয়োজন। আজ পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারেনি, লোকটা ওর শত্রু নাকি মিত্র। কিন্তু এখন সে-লোকই কলকাঠি নাড়ছে লায়োনেলকে ওর জায়গায় বসাতে, রোজামুণ্ডের স্বামী বানাতে। এসব কি কন্যাসম মেয়েটির মঙ্গলের জন্য করছে,

নাকি তার পিছনে লুকিয়ে আছে গভীর কোনও ষড়যন্ত্র? জানতে হবে অলিভারকে। লায়োনেলের সঙ্গে বোঝাপড়ার বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এসব তাড়না শেষ পর্যন্ত আর অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

জীবনের ঝড়-ঝাপটা সহ্য করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একজন মানুষ হয়ে উঠেছে অলিভার, নিতে শিখেছে কঠিন সব সিদ্ধান্ত। আজও তাই তেমন একটা সিদ্ধান্তই নিয়েছে ও—যাবে কর্নওয়ালে, ফয়সালা করবে সবকিছুর। জাহাজ, লোকবল আর পথ-প্রদর্শক... সবই রয়েছে হাতে, এমন সুযোগ আবার কবে পাবে, কে জানে! না, এরপরে আর পিঠ ফেরানো চলে না।

খুব দ্রুত নেয়া হলো প্রস্তুতি। খাবার-দাবার আর পানি তোলা হলো গ্যালিয়নে। বন্দি এবং নাবিকদের জাহাজ-বদল করা হলো। গ্যালিয়নের পিছন থেকে মুছে ফেলা হলো ওটার নাম—*নুয়েস্ত্রা সিনোরা দি ল্য লাগাস।* পরদিনই কর্সেয়ারদের জাহাজগুলোকে বিস্কেনের নেতৃত্বে আলজিয়ার্সের পথে পাঠিয়ে দিল অলিভার। আর ক্যাপ্টেন জ্যাসপার লেইয়ের নির্দেশনায় ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে রওনা হলো স্প্যানিশ গ্যালিয়ন, ভূমধ্যসাগর থেকে বেরিয়ে এল আটলান্টিকে। বাতাস অনুকূল থাকায় সেইন্ট ভিনসেন্ট অন্তরীপ পেরুনোর দশদিনের মাথায় গন্তব্যের দেখা পেল ওরা।

চার

হানা

ফাল নদীর মোহনায়... উঁচু যে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে আরওয়েনাক প্রাসাদ, তার ছায়ায় গর্বিত ভঙ্গিতে নোঙর করে আছে জমকালো এক জাহাজ। দক্ষ কারিগরের হাতে তৈরি হয়েছে ওটা, খরচের বেলায় কোনও কার্পণ্য করা হয়নি। দূরযাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে জাহাজটা, চলছে রসদ আর গোলাবারুদ তুলবার কাজ। নদীর পারের জেলে-গ্রামে সে-কারণে চলছে কর্মব্যস্ততা। সার জন কিলিগ্রুর ধারণা, তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে এর মাধ্যমে—গোড়াপত্তন হতে চলছে নতুন এক বন্দরের। ধীরে ধীরে প্রসার ঘটবে এর।

মাস্টার লায়োনেল ট্রেসিলিয়ানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব এর পিছনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। সার অলিভারের বিরোধিতায় থমকে গিয়েছিল এ-স্বপ্ন, তবে লায়োনেল সে-আপত্তি ফিরিয়ে নিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, পার্লামেন্ট এবং রানির কাছে নিজের সমর্থনপত্র-ও পাঠিয়েছে সে। এর ফলে আবার গতি পেয়েছে সার জনের কাজ। পেনারো এবং আরওয়েনাকের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মূল উৎপাটিত হওয়ায় বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছে তাঁর এবং লায়োনেলের মধ্যে।

ভাইয়ের মত তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি নেই ছোট ট্রেসিলিয়ানের মধ্যে,

তবে সেটার ঘাটতি সে পূরণ করেছে ধূর্ততা দিয়ে। হিসেব করে দেখেছে, সার জনের জমিতে সমুদ্রবন্দর স্থাপন করা হলে ট্রুরো আর হেলস্টন গ্রামের পাশাপাশি ট্রেসিলিয়ানদের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বটে, কিন্তু সেটা ওর জীবদ্দশায় ঘটবার সম্ভাবনা খুবই কম। তারচেয়ে সার জনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রোজামুণ্ডকে বিয়ে করতে পারলে অনেক বেশি লাভবান হতে পারবে ও। দুই জমিদারি এক হয়ে যাবে, আর তার মালিক হবে লায়োনেল নিজে। এক লাফে দ্বিগুণ হয়ে যাবে ওর সম্পত্তি এবং আয়।

তবে এ-কথা ভাববার অবকাশ নেই যে, বিয়ের প্রস্তাবে সহজে রাজি হয়েছে রোজামুণ্ড। বরং শুরুতে নাকচ করে দিয়েছিল ওটা। লায়োনেলকে এড়াবার জন্য লেখাপড়ার নাম করে স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিল ফ্রান্সে—সার জনের বোনের সঙ্গে। ভদ্রমহিলার স্বামী ওখানে ইংল্যাণ্ডের রাজদূত হিসেবে নিয়োজিত। বলে রাখা ভাল, ভাইয়ের মৃত্যু এবং বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রোজামুণ্ডের অভিভাবকত্ব হারিয়েছেন সার জন। ওর উপর জোর খাটাবার কোনও উপায় ছিল না তাঁর।

রোজামুণ্ড চলে যাবার পর বেশ কিছুদিন বিমর্ষ রইল লায়োনেল। সার জন ওকে সাহস জোগালেন, পরামর্শ দিলেন ধৈর্য ধরবার। আশ্বাস দিলেন, শেষ পর্যন্ত ওর ইচ্ছেই পূর্ণ হবে। অগত্যা কিছু সময়ের জন্য লণ্ডনে চলে গেল লায়োনেল, আইন পেশায় নাম লেখাবার চেষ্টা করল... তবে তাতে সফল হলো না। শেষে প্যারিসে পাড়ি জমাল সে। ওখানে গিয়ে রোজামুণ্ডের সঙ্গে দেখা করল, চেষ্টা করল ওকে বিয়েতে রাজি করাবার।

লায়োনেলের অব্যাহত চেষ্টায় কিছুটা নরম হয়ে এল মেয়েটা, কিন্তু তারপরেও পুরোপুরি সায় পেল না মনের। যতকিছুই হোক, পাণিপ্রার্থী যুবকটি সার অলিভারের ভাই—সেই মানুষ, যাকে

এককালে ভালবাসত ও... যার হাতে খুন হয়েছে ওর আপন সহোদর! লায়োনেলের সঙ্গে মিলনের পথে বাধা হয়ে রয়েছে ওর পুরনো প্রেমের ছায়া এবং ভাইয়ের রক্ত।

বছরদুই পরে যখন কর্নওয়ালে ফিরল, তখন এসব যুক্তিই রোজামুণ্ড দেখাল সার জনের সামনে। বোঝাল কেন লায়োনেলকে বিয়ে করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে।

সার জন ওর সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। বললেন, 'বাছা, তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে আমাদেরকে। এখন আর বাচ্চা নও তুমি, বড় হয়েছ। স্বীকার করি, নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তোমার আছে। তাই বলে তরুণী একটি মেয়ের একাকী থাকা ঠিক নয়। গডলফিন কোর্টের নিঃসঙ্গতা ছেড়ে আরওয়েনাকে থাকতে এসে খুব ভাল করেছ... যতদিন খুশি থাকো, আমার কোনও আপত্তি নেই। যতদিন আমি আছি, তোমার দেখাশোনার কোনও কমতি হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খুব শীঘ্রি ব্যবসার জন্য ভারতবর্ষে যাবার পরিকল্পনা রয়েছে আমার, তখন তো আবার নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে তুমি। কে দেখবে তোমাকে? বিপদ-আপদ থেকে কে রক্ষা করবে?'

'দেখাশোনার জন্য যাকে আপনি জোর করে আমার ঘাড়ে গছাতে চাইছেন, তার চেয়ে একা থাকা ঢের ভাল,' বলল রোজামুণ্ড।

'খুবই অন্যায় কথা,' মাথা নাড়লেন সার জন। 'তোমার জন্য কাতর লায়োনেল... ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ভদ্রলোকের মত। এ-ই বুঝি তার প্রতিদান?'

'ও অলিভার ট্রেসিলিয়ানের ভাই!'

'তার জন্য যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত কি ইতোমধ্যেই করেনি ও? ভাইয়ের পাপের জন্য আর কতকাল শাস্তি পেতে হবে ওকে? তা

ছাড়া... আপন ভাইও নয় ওরা, সৎ-ভাই।'

'ভাই তো! বিয়ে যদি আমাকে করতেই হয়, তা হলে অন্য কোনও পাত্র দেখুন, সার জন।'

লায়োনেলের পক্ষ নিয়ে রোজামুণ্ডের মত পাল্টাবার চেষ্টা করলেন সার জন। যুক্তি দেখালেন—একই এলাকার ছেলে সে, তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে সবই জানা আছে ওদের। ভিন্ন পাত্রের ক্ষেত্রে অতটা জানাশোনা না-ও থাকতে পারে। দেখা যাবে, বিয়ের পরে একগাদা বাজে স্বভাব প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া লায়োনেলকে বিয়ে করলে দূরে কোথাও যেতে হবে না। কর্নওয়ালেই থাকবে রোজামুণ্ড, নিজের বাড়ি আর পরিচিত লোকজনের কাছাকাছি। দুই পরিবারের সম্পত্তি একত্র হলে মান-সম্মান আর প্রভাব-প্রতিপত্তি কতখানি বেড়ে যাবে, তা উল্লেখ করতেও ভুললেন না।

ক্রমাগত চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো রোজামুণ্ড। হাজার হোক, নারী ও; একাকী আর কতদিন শক্ত থাকা যায়? মান-মর্যাদা বজায় রেখে মত দিল বিয়েতে, কষ্ট নিয়ে বুকের গহীনে চাপা দিল নিজের সত্যিকার আপত্তি—অলিভারের প্রতি ওর প্রেম। হ্যাঁ, এতকিছু ঘটে যাবার পরেও... আজও মানুষটাকে ভালবাসে রোজামুণ্ড। অনেক যুদ্ধ করেও কিছুতেই দূর করতে পারেনি বিশুদ্ধ এই আবেগকে। জানে, পিটারের খুনি সে... তার জন্য যথেষ্ট রাগও আছে, কিন্তু নেই ঘৃণা। অন্তরের অন্তস্তল থেকে জানে, ওর ভাই ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না, অলিভারকে নিশ্চয়ই বাধ্য করেছিল অমন একটা কাজ করতে। তাই বলে ভাইয়ের খুনিকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেয়া যায় না। লোকে কী বলবে? সমাজ কী বলবে? নিজেও তাই বাধ্য হয়েছে অলিভারকে দূরে ঠেলে দিতে।

সত্যিকার আবেগকে গলা টিপে মারার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ও সবসময়। স্বভাববিরুদ্ধভাবে রূঢ় আচরণ করে চলেছে।

মনের টানাপড়েনের জন্য প্রায়শই নিজের উপর রাগ হয় রোজামুণ্ডের, কিন্তু তা থেকে মুক্তি পায় না। আচরণে রুক্ষতা ধরে রেখেছে ও—বারবারি উপকূল থেকে পাঠানো অলিভারের চিঠি পোড়ানোর মাধ্যমে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে—কিন্তু অবচেতন হৃদয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই ওর। বুকের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা ঘুরপাক খায়, একটা আশা... অলিভার হয়তো কোনোদিন ফিরে আসবে, যদিও ওর ফেরা না-ফেরায় কোনও লাভ নেই রোজামুণ্ডের।

সার জন অবশ্য ওই আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন আর কখনও ছায়াও দেখবেন না খুনি নাইটের। কিন্তু তারপরেই একটা বোকামি করে বসল বোকা যুবক—চিঠি পাঠাল পিট নামের ওই ছেলেটির হাতে। ওর কাছ থেকে জানা গেল অলিভারের পরিণতি, ইংরেজ বীর থেকে শাকের-আল-বাহার নামের এক ঘৃণিত জলদস্যু হবার কাহিনি। সুযোগটা হাতছাড়া করেননি তিনি। পিটের জবানবন্দি নিয়ে আদালতে গেছেন, নিশ্চিত করেছেন রোজামুণ্ডের হবু-স্বামীর উত্তরাধিকার। তাঁর ধারণা, মেয়েটার ভবিষ্যৎও নিষ্কণ্টক হয়েছে এতে। নিজের অজান্তেই রোজামুণ্ডের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করলেন এর মাধ্যমে।

ঘটনাটার আগ পর্যন্ত শক্ত থেকেছে রোজামুণ্ড। কিন্তু অলিভারকে যখন আইনত মৃত বলে ঘোষণা করা হলো, সমস্ত আশা-ভরসা শেষ হয়ে গেল ওর। বুঝতে পারল, আর কোনোদিন দেশে ফিরতে পারবে না ওর মনের মানুষ। সমস্ত সম্পত্তি হারিয়েছে, মাথার উপর ঝুলছে ধর্মান্তরিত হবার কলঙ্ক, সেইসঙ্গে জলদস্যুতার অভিযোগ... এমন অবস্থায় কোনও বোকাও

ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা রাখবার সাহস করবে না। চরম হতাশা গ্রাস করল রোজামুণ্ডকে, আর সেজন্যেই সম্ভবত মেনে নিল সার জনের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত।

বেশ ধুমধামের সঙ্গে বাগদান হলো ওর আর লায়োনেলের। উচ্ছ্বাস দেখাল না রোজামুণ্ড, নির্বিকারত্ব-ও না। লায়োনেল তাতেই খুশি। আত্মবিশ্বাসী সে—বিয়েটা একবার হয়ে গেলে ঠিকই স্ত্রী-র ভালবাসা আদায় করে নিতে পারবে। কয়েকদিনের মধ্যে কিছুটা এগিয়েও গেল। নিঃসঙ্গ এবং হতাশ ছিল রোজামুণ্ড, লায়োনেল ওকে সময় দেয়ায় কিছুটা ঘনিষ্ঠ হলো, আচরণে বন্ধুত্ব প্রকাশ পেল। দু'জনের মধ্যকার দূরত্ব কমে আসছে দেখে সার জনও খুশি হয়ে উঠলেন, ভাবলেন সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এদেরকে বিয়ে করাবার। রোজামুণ্ডের ভাবনা লায়োনেলের উপর সঁপে দিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিজের জাহাজ—*সিলভার হেরন*-এর নির্মাণ এবং আশু সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতিতে।

ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল বিয়ের সময়। আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। সার জনও অস্থির হয়ে উঠেছেন। লায়োনেল আর রোজামুণ্ডের বিয়ের ঘণ্টা তো আসলে তাঁর বিদায়ের সঙ্কেত। অনুষ্ঠানটা শেষ হলেই জাহাজ নিয়ে ভারতবর্ষের পথে রওনা হবেন তিনি। কিন্তু বেচারার জানা নেই, তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ওলোটপালোট হতে বসেছে। ঘনিয়ে আসছে বিপদ... শুরু হতে চলেছে নতুন এক ঘটনাপ্রবাহ।

জুনের এক তারিখ। দিনের আলো মিলিয়ে গেছে, নেমে এসেছে রাতের আঁধার। কৃত্রিম আলোয় ঝলমল করছে আরওয়েনাক প্রাসাদের বিশালায়তন ডাইনিং হল। নৈশভোজে বসেছে সেখানে পাঁচজন মানুষ। সার জন কিলিগ্রু, রোজামুণ্ড, লায়োনেল

ট্রেসিলিয়ান এবং সস্ত্রীক লর্ড হেনরি গোড—কর্নওয়ালে মহামান্য রানির লর্ড লেফটেন্যান্ট। আরওয়েনাকে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন শেষ দু'জন। বিয়ের অনুষ্ঠান পর্যন্ত থাকবেন।

বাড়িতে চলছে প্রস্তুতিপর্ব—লায়োনেল-রোজামুণ্ডের বিয়ে, সেইসঙ্গে সার জনের সমুদ্রযাত্রার। ওপরতলার টারেট চেম্বারে দিন-রাত ডজনখানেক সহকারিণী নিয়ে খাটছে স্যালি পেনট্রিথ নামে এক নামকরা মহিলা-দর্জি—রোজামুণ্ডের বিয়ের পোশাক তৈরি করছে সে।

কারও জানা নেই, সার জন যখন অতিথিদের নিয়ে খেতে বসেছেন, ঠিক তখনই মাইলখানেক দূরে কর্নওয়ালের মাটিতে পা রাখছে সার অলিভার ট্রেসিলিয়ান।

পেনডেনিস পয়েন্ট অতিক্রম করেনি ও, সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসতেই সোয়ানপুলের পশ্চিম দিককার খাঁড়িতে নোঙর ফেলেছে। তারপর দুটো নৌকা নামিয়েছে পানিতে। পালা করে জাহাজে আসা-যাওয়া করেছে ওগুলো, মোট একশো কর্সেয়ারকে পৌঁছে দিয়েছে সৈকতে। বাকি একশো রয়েছে গেছে জাহাজের পাহারায়। এত লোক না নিলেও চলত, কিন্তু কোনও ধরনের ঝুঁকি নিতে রাজি নয় অলিভার। লোকবল দেখিয়েই ভড়কে দিতে চায় প্রতিপক্ষকে, তা হলে অযথা রক্তপাতের প্রয়োজন হবে না।

অন্ধকারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল ও, সবার অলক্ষে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে রওনা হলো আরওয়েনাকের দিকে। এদিককার এলাকা ওর হাতের তালুর মত চেনা, সহজেই এগোতে পারল ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে, লুকিয়ে রাখতে পারল নিজের বিশাল বাহিনী। ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে গেল—ভাবল পরিবেশ-পরিস্থিতি নিয়ে। কে ভাবতে পেরেছিল, এভাবে কোনোদিন কর্নওয়ালে আসতে হবে ওকে! সঙ্গে একদল খুনে

অপরাধী নিয়ে... চোরের মত! কত বদলে গেছে ও! পরিণত হয়েছে এমন এক মানুষে, যে-ধরনের মানুষকে ঠেকাবার শিক্ষা পেয়েছে ও সারাটা জীবন।

মনে মনে একটু দুর্বল হয়ে পড়ল অলিভার, কিন্তু একটু পরেই মাথা ঝাড়া দিয়ে দূর করল সে-দুর্বলতা। না, অন্যায় করছে না ও। আর কোনও পথ খোলা নেই ওর সামনে। আরওয়েনাকে যেতেই হবে ওকে, সার জন আর রোজামুণ্ডকে বাধ্য করতে হবে ওর কথা শুনবার জন্য। তারপর যাবে পেনারো-তে, বিশ্বাসঘাতক লায়োনেলের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য। প্রতিশোধের সে-স্পৃহাই শক্তি যোগাল ওকে, সাহস জোগাল পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে—যার চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে দুর্গপ্রতীম শত্রুশিবির।

আরওয়েনাকের বিশাল লোহার ফটক বন্ধ অবস্থায় পেল ওরা। সেটাই স্বাভাবিক, অস্থির হলো না অলিভার, এগিয়ে গিয়ে প্রাচীরের গায়ে লাগানো পার্শ্ব-দরজায় টোকা দিল। পায়ের শব্দ হলো ওপাশে, পার্শ্ব-দরজার পাল্লা সামান্য ফাঁকা হলো, একটা লণ্ঠন উঁচু হলো ওখানে—অতিথির চেহারা দেখবার চেষ্টা করছে গেটকিপার। বিদ্যুৎ খেলে গেল অলিভারের শরীরে। কাঁধ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও পাল্লাটার উপরে। ধাক্কা খেয়ে ওপাশের মানুষটা ছিটকে পড়ল মাটিতে, হাত থেকে ছুটে গেল লণ্ঠন। তার উপর একদল কালো ছায়ার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল দস্যুরা। শব্দ করতে দিল না, হাত-পা বেঁধে ফেলল দ্রুত।

ফটক আর খুলল না অলিভার, পার্শ্ব-দরজা দিয়েই আঙিনায় ঢোকাল সঙ্গীদেরকে। তারপর সবাইকে নিয়ে ছুটল বাড়ির দিকে। বাগানে আলো নেই, সহজেই লক্ষ্যের কাছে পৌঁছুতে পারল ওরা, কোনও বাধার সম্মুখীন হলো না। সদর দরজা খোলা থাকায় সরাসরি ঢুকে পড়ল মূল ভবনে।

হলওয়েতে যত ভৃত্য পাওয়া গেল, সবাইকে গেটকিপারের মত বেঁধে ফেলা হলো। ভূতের মত চলতে জানে কর্সেয়ার-রা, নিঃশব্দে কাজ সারল, ফলে ডাইনিং হলে সমবেত গৃহকর্তা আর অতিথিরা টের পেল না, বাড়িজুড়ে কী ঘটে যাচ্ছে। যখন পেল, তখন আর কিছু করার নেই। আচমকা প্রচণ্ড আওয়াজে হাট হয়ে খুলে গেল কামরার দরজা। চমকে উঠে ওদিকে তাকাল সবাই... এবং স্থবির হয়ে গেল।

পিলপিল করে ডাইনিং রুমে ঢুকল পাগড়ি আর ঢোলা কোর্তা-পাজামা পরা সশস্ত্র কর্সেয়ার-রা। সবার সামনে দুর্ধর্ষ শাকের-আল-বাহার। আতঙ্ক জাগাবার মত একটা দৃশ্য! পিনপতন নীরবতা নেমে এল ঘরে। চুপচাপ সামনের মানুষগুলোর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল অলিভার। তারপর পায়ে পায়ে এগোল সামনে। লায়োনেলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

হতবাক হয়ে ওকে দেখল কুচক্রী ট্রেসিলিয়ান। দাড়িগোঁফে ঢাকা নিষ্ঠুর চেহারা পেরিয়ে চোখ রাখল চোখে। আগুনের মত জ্বলছে মণিদুটো। আচমকা সে বুঝল, এই চোখ সে চেনে... চেনে মানুষটিকেও! তীব্র আতঙ্ক ভর করল তার ভিতরে। কুঁকড়ে গেল দেহ, গদিমোড়া চেয়ারে সেঁধিয়ে যেতে চাইল যেন।

বক্র হাসি ফুটল অলিভারের ঠোঁটে।

'যাক, অন্তত তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ,' জলদগম্ভীর স্বরে বলল ও। 'খুবই আনন্দের কথা, সময় আর দুর্ভাগ্যের কষাঘাতে যে-পরিবর্তন এসেছে আমার মধ্যে, সেটাকে ভেদ করতে পেরেছে ভাইয়ের দৃষ্টি।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন সার জন, চেহারায় আক্রোশ, গাল দিয়ে উঠলেন। রোজামুণ্ড স্থির, ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে অলিভারের দিকে, নিজের অজান্তেই আঁকড়ে ধরেছে টেবিলের

কিনার। দু'জনেই এখন চিনতে পারছে ওকে। বুঝতে পারছে, চোখের ভুল নয় ব্যাপারটা। সন্দেহ নেই, ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটতে চলেছে; কিন্তু সেটা কী হতে পারে, কল্পনাও করতে পারছে না। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে এই প্রথম উদয় হয়েছে বারবারি জলদস্যুরা। আয়ারল্যাণ্ডের বাল্টিমোরে তাদের বিখ্যাত আগ্রাসন ঘটতে এখনও ত্রিশ বছর বাকি।

'সার অলিভার ট্রেসিলিয়ান!' হতভম্ব কণ্ঠে বললেন সার জন।

'অলিভার ট্রেসিলিয়ান?' চমকালেন লর্ড হেনরি গোড। 'হা ঈশ্বর!'

'সার অলিভার ট্রেসিলিয়ান না,' জবাব এল, 'শাকের-আল-বাহার... ভূমধ্যসাগরের ত্রাস, খ্রিস্টানদের যম, বেপরোয়া এক কর্সেয়ার... যার জন্ম হয়েছে তোমাদের মিথ্যেবাদিতা, ষড়যন্ত্র আর হৃদয়হীনতার কারণে!' মুখ বাঁকাল অলিভার। 'স্বাগত জানাও আমাকে। তোমাদেরকে প্রায়শ্চিত্ত করানোর জন্য এখানে আমার প্রত্যাবর্তন তো অনিবার্য-ই ছিল।'

এক মুহূর্তের জন্য স্থির রইলেন সার জন, তারপরেই পাশ ফিরে ছুটলেন কামরার একপ্রান্তে—দেয়ালে ঝোলানো ঢাল-তলোয়ারের নাগাল পেতে চাইছেন। নড়ল না অলিভার, আরবীতে একটামাত্র শব্দ উচ্চারণ করল। সঙ্গে সঙ্গে জনাছয়েক কর্সেয়ার ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর উপর, আছড়ে ফেলল মেঝেতে।

লেডি হেনরি চেঁচিয়ে উঠলেন, বাকিরা বসে রইল মূর্তির মত। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রোজামুণ্ড, দু'হাতে মুখ ঢাকল লায়োনেল। বোধহয় নৃশংস হত্যাকাণ্ড আশা করল ওরা, কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। দলের লোকজনকে অকারণে রক্তপাত ঘটাতে নিষেধ করেছে অলিভার, তাই ওরা সার জনকে টেনে-হিঁচড়ে শুধু সরিয়ে আনল দেয়ালের কাছ থেকে—উপুড়

করে শোয়াল, দু'হাত বেঁধে ফেলল পিছমোড়া করে। পুরোটাই সারা হলো বিস্ময়কর দ্রুততায়।

নির্বিকার ভঙ্গিতে ব্যাপারটা দেখল শাকের-আল-বাহার, তারপর আবার টেবিলের দিকে ফিরল। ভাইকে উদ্দেশ্য করে একটা আঙুল তুলল ও, আর তা দেখে আতঙ্কে গুঙিয়ে উঠল লায়োনেল। দু'জন কর্সেয়ার এগিয়ে গেল, দু'পাশ থেকে তাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড় করাল, নিয়ে এল নেতার সামনে। মুখোমুখি হলো দুই ভাই। অলিভারের দৃষ্টি যেন ছুরির মত বিদ্ধ করছে লায়োনেলকে। আরও সংকুচিত হয়ে গেল সে। তীব্র ঘৃণায় ওর মুখে থুতু দিল অলিভার। নির্দেশ দিল:

'নিয়ে যাও ওকে!'

দস্যুদের ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেল লায়োনেলের দেহ। যেন তাকে গিলে ফেলল ওরা।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ালেন সার জন। রাগে মুখ লাল হয়ে গেছে তাঁর। হিংস্র কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'কী করতে যাচ্ছ তুমি ওকে নিয়ে?'

জবাব দিল না অলিভার।

'আমার ভাইয়ের মত নিজের ভাইকেও খুন করবে তুমি?' বলে উঠল রোজামুণ্ড। অবশেষে মুখ খুলেছে ও, কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে। ফ্যাকাসে চেহারায় ফিরতে শুরু করেছে রক্ত। এক মুহূর্তের জন্য অলিভারকে বিচলিত হতে দেখল ও, চোখ থেকে মুছে যেতে দেখল ক্রোধ... কিন্তু পরক্ষণেই আবার ফিরে এল সব। খেপে গেছে... যা করবে ভেবে এসেছিল, তা আর মাথায় নেই। সার জন আর রোজামুণ্ডের কথাগুলো ছুরির মত বিঁধেছে হৃদয়ে। এর উপযুক্ত জবাব দিতে না পারলে শান্তি পাবে না। তাই নতুন এক সিদ্ধান্ত নিল ও।

'মনে হচ্ছে আমার ভাই নামের কলঙ্কটাকে ভালবাসো তুমি,' বিদ্রূপের সুরে বলল অলিভার। 'দেখা দরকার, ওকে ভালমত চেনার পরে সেই ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকে কি না। মেয়েমানুষের ভালবাসার ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না... এই আছে তো এই নেই। বড্ড কৌতূহল অনুভব করছি। কৌতূহলটা নিবৃত্ত করা প্রয়োজন।' হাসল ও। 'ঠিক আছে, তোমাদেরকে আলাদা করব না আমি... মানে, এখুনি না।'

এগিয়ে গেল অলিভার। 'আমার সঙ্গে এসো, লেডি।' বলে বাড়িয়ে দিল একহাত।

এতক্ষণে নড়ে উঠলেন লর্ড হেনরি গোড। ছুটে এসে রোজামুণ্ডের সামনে দাঁড়ালেন, ঢাল হবার চেষ্টা করলেন যেন। চেঁচিয়ে বললেন, 'খবরদার, লেডি রোজামুণ্ডের দিকে ফিরেও তাকিয়ো না! নইলে ভুগতে হবে তোমাকে!'

'ভুগব?' বলল অলিভার। 'ইতোমধ্যে যথেষ্ট ভুগেছি আমি, সার। সে-কারণেই আজ আমার এখানে আসা।'

'তা হলে জেনে রাখো, আরও ভোগান্তি আছে তোমার কপালে, নরকের কীট! সম্ভ্রান্ত এক ভদ্রমহিলাকে অপহরণের কারণে চরম শাস্তি পেতে হবে তোমাকে।'

'তাই নাকি?' শান্ত কণ্ঠে বলল অলিভার। 'কে দেবে সেই শাস্তি?'

'আমিই দেব, ঈশ্বরের দোহাই!' গর্জে উঠলেন লর্ড হেনরি। 'তোমাকে ধাওয়া করে শূলে চড়াব!'

হেসে উঠল অলিভার। 'আপনি? আপনি শিকার করবেন সাগরের বাজপাখিকে? খামোকা লোক হাসাবেন না। সরুন!'

'না!'

আরবীতে আবার একটা নির্দেশ দিল অলিভার। সঙ্গে সঙ্গে

কয়েকজন কর্সেয়ার এসে টান দিয়ে সরিয়ে নিল লর্ড হেনরিকে, একটা চেয়ারে বসিয়ে বেঁধে ফেলল আষ্টেপৃষ্ঠে।

রোজামুণ্ডের মুখোমুখি হলো অলিভার... দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে। ওর গায়ের সুবাস পাচ্ছে, পাচ্ছে ওর নিঃশ্বাসের ছোঁয়া। উত্তেজনায় দ্রুত ওঠানামা করছে সুগঠিত বুক। অনুভব করল, এভাবে আবার ওর মুখোমুখি হবার জন্যই এতদিন আকুল হয়ে ছিল হৃদয়।

'চলো, লেডি,' নরম কণ্ঠে বলল অলিভার।

মুহূর্তের জন্য চরম ঘৃণা আর বিতৃষ্ণার চোখে ওর দিকে তাকাল রোজামুণ্ড, তারপরেই ঝট্ করে টেবিল থেকে তুলে নিল একটা ছুরি, ওটা বসিয়ে দেবার চেষ্টা করল ওর বুকে। কিন্তু অলিভারের হাত নড়ল আরও দ্রুত—খপ্ করে মেয়েটার কবজি ধরে ফেলল ও, হালকা একটা মোচড় দিতেই ছুরিটা খসে পড়ল মেঝেতে।

হাহাকারের মত একটা শব্দ বেরিয়ে এল রোজামুণ্ডের গলা দিয়ে—ব্যর্থতা, নাকি অনুতাপে... তা বোঝা গেল না। কিন্তু আচমকা নেতিয়ে গেল ওর দেহ, পড়ে যেতে শুরু করল জ্ঞান হারিয়ে। নিজের অজান্তেই ওকে জাপটে ধরে ফেলল অলিভার, টেনে নিল বুকে। মনে পড়ল, পাঁচ বছর আগে শেষবার এভাবে ওকে আলিঙ্গন করেছিল ও। সুন্দর এক সন্ধ্যায়, গডলফিন কোর্টের দেয়ালের বাইরে। তখন কল্পনাও করেনি, ওদের পরের আলিঙ্গনটা হবে এভাবে... এই পরিবেশে। পুরোটাই যেন অদৃশ্য কোনও শক্তির নির্মম তামাশা। তারপরেও এ সত্যি—রোজামুণ্ড আবার ওর বুকে ফিরে এসেছে!

মেয়েটার অজ্ঞান দেহ পাঁজাকোলা করে তুলে নিল অলিভার, উল্টো ঘুরল। আরওয়েনাকে ওর কাজ শেষ। যা করবার জন্য

এসেছিল, তারচেয়ে এক অর্থে বেশিই অর্জন হয়েছে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে কম।

'ফিরে চলো!' নির্দেশ দিল ও।

যেভাবে এসেছিল, ঠিক সেভাবেই আবার ডাইনিং হল থেকে বেরুতে শুরু করল কর্সেয়ার-রা। বাড়ির অলি-গলি পেরিয়ে আঙিনায় নেমে এল জনস্রোত, সেখান থেকে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে সৈকতের দিকে, যেখানে ওদের নৌকাদুটো অপেক্ষা করছে। রোজামুণ্ড হালকা হওয়ায় সহজেই তাদের সঙ্গে তাল মেলাল অলিভার, মেয়েটাকে আর কারও হাতে দিল না। ওর কয়েক গজ সামনে, লায়োনেলকে বইতে গিয়ে অবশ্য হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে অন্যেরা।

ঢাল ধরে নামবার আগে ক্ষণিকের জন্য থামল অলিভার, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ঘন বনের উপর দিয়ে। ওখানে, পেনারো পয়েন্টের মাথায়, চাঁদের আলোয় গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ওর বাড়ি—পেনারো হাউস। যাবার কথা ছিল ওখানে, কিন্তু লায়োনেলকে আরওয়েনাকেই পেয়ে যাওয়ায় পরিকল্পনাটা বাদ দিতে হয়েছে। এত কাছে এসেও দেখা হলো না প্রিয় জায়গাটা। বুক খাঁ খাঁ করে উঠল ওর।

ওসমানি আর আলি নামে দুই সহকারী কাছে আসায় চিন্তায় ছেদ পড়ল ওর। দু'জনে অনেকক্ষণ থেকেই ফিসফাস করছিল। কাছে এসে গলা খাঁকারি দেয়ায় সংবিৎ ফিরল অলিভারের।

'কী ব্যাপার?'

হাত তুলে মিটমিট করে জ্বলতে থাকা স্মিথিক আর পেনিকামউইক গাঁয়ের আলো দেখাল ওসমানি। বলল, 'মালিক, ওখানে জোয়ান-তাগড়া অনেক পুরুষ আর মহিলা পাওয়া যাবে বলে ধারণা আমার।'

‘তো?’

‘আপনি অনুমতি দিলে জনাপঞ্চাশেক লোক নিয়ে যেতে পারি ওখানে। আমাদের উপস্থিতির কথা জানে না ওরা, অতর্কিত হামলা চালিয়ে খুব সহজেই বেশ কিছু দাস জোগাড় করতে পারব। শক-আল-আবিদের বাজারে ভাল দাম পাওয়া যাবে।’

চরম বিরক্তি নিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল অলিভার। ‘ওসমানি, তুমি একটা গাধা... এবং বেয়াদব! এটা আমার মাতৃভূমি, এখানকার আলো-বাতাসে বড় হয়েছি আমি, এখানকার মানুষ আমার স্বজাতি... এই দেশ আমার জন্য পবিত্রভূমি। ভাবলে কী করে, এখান থেকে দাস সংগ্রহ করব আমি! বাজে কথা না বলে হাঁটতে থাকো। তাড়াতাড়ি জাহাজে ফেরা দরকার।’

হাল ছাড়তে রাজি নয় ওসমানি। বলল, ‘তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, বিপজ্জনক, অচেনা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিধর্মীদের দেশে এসেছি আমরা সামান্য দু’জন বন্দির জন্য? এমন অভিযান কি শাকের-আল-বাহারকে শোভা পায়?’

‘সেটা শাকের-আল-বাহারকেই ভাবতে দাও,’ রূঢ় গলায় বলল অলিভার।

‘মাফ করবেন, মালিক... কিন্তু আরেকজন আছেন, যাঁর কাছে আপনাকে জবাবদিহি করতে হয়। আমাদের বাদশাহ্, মহান আসাদ-আদ-দীন যদি প্রশ্ন তোলেন, তখন কী জবাব দেবেন আপনি? দুইশ’ মুমিনের জীবন বিপন্ন করেছেন আপনি কীসের জন্য?’

‘যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন তিনি, আল্লাহ যদি চান তো সেসবের জবাবও দেব আমি,’ বলল অলিভার। ‘আর কোনও কথা শুনতে চাই না তোমাদের মুখ থেকে। আগে বাড়ো! এ আমার হুকুম!’

মাথা ঝাঁকিয়ে ঢাল ধরে নামতে শুরু করল ওসমানি আর আলি। ওদের পিছু নিল অলিভার। হাতের ভাঁজে ধরা দেহটির মৃদু উত্তাপ অনুভব করছে, তীব্র এক আবেগে ছেয়ে যাচ্ছে অন্তর—কিন্তু জানে না সেটা ভালবাসা, নাকি ঘৃণা।

স্থানীয় লোকজনের দৃষ্টি এড়িয়ে সহজেই জাহাজে পৌঁছুল কর্সেয়ার-বাহিনী। নোঙর তুলল, সন্ধ্যার মৃদু-মন্দ বাতাস ব্যবহার করে ভেসে চলল ফিরতি পথে। রাত পোহাবার আগেই কর্নিশ উপকূল থেকে অনেক দূরে চলে গেল ওরা। ফলে সূর্যোদয়ের পর ফাল নদীর মোহনা এবং চারপাশের সমুদ্রকে দেখা গেল বরাবরের মত শান্ত রূপে—আগের দিন সূর্য ডোবার আগে ঠিক যেমনটা ছিল। বোঝারই উপায় নেই, মাঝের কয়েক ঘণ্টায় কী ঘটে গেছে। রোজামুণ্ড আর লায়োনেল অপহৃত না হলে হয়তো বা দুঃস্বপ্ন ভেবেই ভুলে যাওয়া যেত ব্যাপারটা।

যা হোক, জাহাজের পিছনদিককার একটা পরিষ্কার কেবিনে রোজামুণ্ডের থাকার ব্যবস্থা করল অলিভার, দরজায় তালা দেয়া থাকবে ওটার সবসময়। লায়োনেলকে নিক্ষেপ করা হলো পাটাতনের নীচের এক অন্ধকার খুপরিতে। ওকে নিয়ে কী করা হবে, তা এখনও ঠিক করেনি অলিভার। আগামী কয়েকটা দিন অনিশ্চয়তা আর মানসিক চাপের মধ্যে কাটাবে ওর কুচক্রী ভাইটি।

এক ধরনের চাপ অলিভারও অনুভব করছে। রাতের বেলা খোলা আকাশের নীচে শুয়ে নানা বিষয়ে ভাবছে ও। সবচেয়ে বেশি ভাবছে ওসমানির কথাটা। সে-সময় ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেও এখন বুঝতে পারছে—সমস্যা গুরুতর। আলজিয়ার্সে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অভিযান সম্পর্কে জানতে চাইবেন আসাদ-আদ-দীন, কী জবাব দেবে ও? দুইশ' কর্সেয়ারের

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শত শত মাইল মহাসাগর পাড়ি দিয়েছে, হামলা চালিয়েছে চরম বৈরি এক এলাকায়... কেন? মাত্র দু'জন বন্দি নিয়ে ফেরার জন্য, যাদের উপর নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে? এ কি মেনে নেবেন বাদশাহ্? বুঝতে পারছে অলিভার, বড় ধরনের একটা ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে। আলজিয়ার্সে ওর শত্রু আছে অনেক, এমনকী বাদশাহ্-র সিসিলিয়ান বেগমও দু'চোখে দেখতে পারে না ওকে। সবাই মিলে এই ঘটনার ফায়দা লুটবে, বিপদে ফেলবে অলিভারকে।

এসব ভাবনাই সম্ভবত শাকের-আল-বাহারের পরদিনের দুঃসাহসিক কাজের ইন্ধন জোগাল। ভোরবেলা ওরা দেখা পেল উঁচু মাস্তুলঅলা এক ডাচম্যান জাহাজের, দেশে ফিরছিল ওটা। ধাওয়া করল অলিভার, যদিও ভাল করে জানে—এ-ধরনের প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করবার কোনও অভিজ্ঞতা নেই কর্সেয়ারদের। কিন্তু নেতার উপর রয়েছে তাদের অগাধ আস্থা, আজ পর্যন্ত কোনও যুদ্ধে পরাজয় ঘটেনি শাকের-আল-বাহারের, তাই উত্তাল অচেনা সমুদ্রে, অচেনা জাহাজের উপর নির্দ্বিধায় হামলা করল তারা।

লড়াইয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সাগরের আর দশটা লড়াইয়ের মতই ছিল ওটা। এটুকু বলা যেতে পারে যে, ভয়ানক যুদ্ধ হয়েছে, উভয়পক্ষকে সইতে হয়েছে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। কামান ব্যবহার হয়ইনি বলতে গেলে—দুর্ধর্ষ কর্সেয়ার-রা শত্রুকে কামান চালাতে দেয় না, যত দ্রুত পারে আঁকশি ছুঁড়ে পাশে ভিড়ে শিকারের, তারপর জাহাজে উঠে সম্মুখসমরে নামে। এ ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটল। বলে রাখা ভাল, বর্ম আর তলোয়ার হাতে সবার আগে অলিভার-ই চড়ল শত্রু-জাহাজে। আল্লাহ্-র নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে

পড়ল ডাচম্যানের নাবিকদের উপর।

শাকের-আল-বাহারের বেপরোয়া আচরণ এবং প্রচণ্ড আক্রোশ দেখে উদ্দীপনা জাগল অনুসারীদের মাঝে। প্রবলবিক্রমে আক্রমণ চালাল ওরা। তবে ডাচম্যানের আরোহীরা আনাড়ি সওদাগর নয়, শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলল। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে গেল কর্সেয়ার-রা। দু'পক্ষেই বাড়তে থাকল হতাহতের সংখ্যা। শেষ পর্যন্ত সফল হলো জলদস্যুরা, তবে তার জন্য চওড়া মাশুল গুনতে হয়েছে। অলিভার-ও আহত—এক প্রতিপক্ষের শক্ত বর্শা ওর বর্ম ভেঙে ফেলেছে, চিরে দিয়েছে বুকের একপাশ, রক্ত ঝরছে ওখান থেকে, কিন্তু লড়াইয়ের উন্মাদনায় তৎক্ষণাৎ টের পায়নি আঘাতটা। এক সময়ে রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, তবে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পড়েছে পরমুহূর্তেই। জানে, ওকে ঘায়েল হতে দেখলে মনোবল হারাবে সঙ্গীরা; তখন আর কিছুতেই জিততে পারবে না। শারীরিক ব্যথা-বেদনা চাপা দিয়ে লড়ে গেল ও, চেঁচিয়ে দিতে থাকল আদেশ-নির্দেশ, নিজের বাহিনীকে নিয়ে গেল বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। শেষে বিদ্রোহ করল দেহ, নিহত ও আহতদের মাঝে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মহা-পরাক্রমশালী শাকের-আল-বাহার—জীবনে প্রথমবারের মত।

কঠিন এক লড়াইয়ে জয় পেল কর্সেয়ার-রা, কিন্তু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নেতাকে নিয়ে ফিরতে হলো স্প্যানিশ গ্যালিয়নে। শাকের যদি মারা যায়, তা হলে এ-বিজয় মূল্যহীন। জাহাজের মাঝামাঝি জায়গায় একটা বিছানা পেতে শোয়ানো হলো অলিভারকে, ওখানে জাহাজের দুলুনি সবচেয়ে কম। মূরিশ এক চিকিৎসক রয়েছে ওদের সঙ্গে, সে এসে পরীক্ষা করল ওকে। জানাল, আঘাত অত্যন্ত গুরুতর, তবে একেবারে আশা ছেড়ে দেবার মত

নয়। তার কথা শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কর্সেয়ার-রা। দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে ওদের মনে—আল্লাহ্ তাঁর এমন দুর্দান্ত অস্ত্রকে ফিরিয়ে নেবেন না। ইসলামের জয়ের জন্যই তিনি টিকিয়ে রাখবেন শাকের-আল-বাহারকে।

ওদের ধারণাই সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। গ্যালিয়ন যখন জিব্রাল্টার প্রণালীতে পৌছুল, তখন জ্ঞান ফিরে পেল অলিভার, মৃদু স্বরে জানতে চাইল লড়াইয়ের ফলাফল এবং তখনকার পরিস্থিতি। ওসমানি জানাল, জয় হয়েছে ওদের, ডাচম্যান-টা গ্যালিয়নের পিছু পিছু আসছে। আলি এবং আরও কিছু লোক মিলে চালাচ্ছে ওটা। শ'খানেক তাগড়া-সুস্থ বন্দি পাওয়া গেছে জাহাজ থেকে, খোলের ভিতর পাওয়া গেছে সোনা, রূপা, মুক্তো, হাঁতির দাঁত, রেশমি কাপড় আর মশলা-র বড় এক চালান। খবরটা শুনে স্বস্তি পেল অলিভার। যাক, এবার আর অভিযানটাকে ব্যর্থ বলে অপপ্রচার চালাতে পারবে না কেউ। ডাচম্যান দখল করতে গিয়ে যারা নিহত হয়েছে, তাদের রক্তও বিফলে যায়নি। শান্তিতে এবার আলজিয়ার্সে ফিরতে পারবে ও; শাকের-আল-বাহারের বিরোধীরা, কিংবা বাদশাহ্-র কুটিল বেগমের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ছাড়া।

ইংরেজ দুই বন্দির ব্যাপারে খোঁজ নিল অলিভার। ওসমানি জানাল, ওরা আগের মতই আছে... সুস্থ। শাকেরের নির্দেশ অনুসারে কেউ বিরক্ত করছে না ওদেরকে।

সন্তুষ্ট হয়ে চোখ মুদল অলিভার। জাহাজের পাটাতনে তখন দলবদ্ধভাবে প্রার্থনায় বসেছে কর্সেয়ার-রা। একযোগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে দয়ালু-দাতা মহান আল্লাহ্তা'লা-র কাছে।

পাঁচ

আসাদ-আদ-দীন

কসবাহ নগরীর সুরভিত উদ্যানে সন্ধ্যার মিষ্টি বাতাস উপভোগ করছেন আলজিয়ার্সের বাদশাহ্‌, বিশ্বাসীদের সিংহ বলে পরিচিত আসাদ-আদ-দীন। সঙ্গে রয়েছে তাঁর স্ত্রী—ফানযিলাহ্‌, রাজকীয় হারেমের প্রধান নারী... যাকে আঠারো বছর আগে মেসিনার এক গ্রাম থেকে তুলে এনেছিলেন তিনি।

ষোড়শী ছিল তখন ফানযিলাহ্‌, সাদাসিধে এক কৃষক পরিবারের মেয়ে, বিনা-প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করেছিল আসাদ-আদ-দীনের কাছে। এখন... চৌত্রিশ বছর বয়সেও রূপসী সে, আগের চেয়েও বেড়েছে তার সৌন্দর্য—যে-সৌন্দর্য কামনার আগুন জ্বেলেছিল বিখ্যাত আলি বাশা-র তরুণ ক্যাপ্টেন আসাদের বুকে। মুক্তোর মত ফর্সা, মাখনের মত মোলায়েম ত্বক ফানযিলাহ্‌-র। চোখদুটো জলপাই আকারের, কালচে-সোনালি মণিদুটোয় আগুন জ্বলে। ঠোঁটদুটো পুরু এবং গোলাপি। বেশ লম্বা, একহারা দেহ। মেদ বলে কিছু নেই। স্বামীর পাশে চপল হরিণীর মত হাঁটছে, প্রতি পদক্ষেপে প্রকাশ পাচ্ছে দৃঢ়তা এবং আভিজাত্য। মুখে কোনও ঘোমটা নেই, ঘোমটা দিতে পছন্দ করে না সে, তাই দেখা যাচ্ছে অপূর্ব চেহারা-যে-কোনও পুরুষের

রাতের ঘুম হারাম করে দেবার জন্য যথেষ্ট। বিয়ের আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে ফানযিলাহ্, সে-অনুসারে পর্দা-পুশিদার বাধ্যবাধকতা থাকলেও এ-ব্যাপারে উদাসীন। কেন যেন তা মেনেও নিয়েছেন আসাদ-আদ-দীন। হয়তো আর দশটা মেয়ের চেয়ে ফানযিলাহ্ একেবারে আলাদা বলেই। স্বামীর হাতের পুতুল হতে আপত্তি নেই তার, একান্ত সময়ে বাদশাহ্-র উপভোগের বস্তু... কিন্তু তারপরেও নিজেকে গুরুত্বহীন করে ফেলেনি। শাসন-কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়, বাদশাহ্-র একান্ত বিশ্বস্ত, তাঁকে বুদ্ধি-পরামর্শ দেয়—ঠিক যেভাবে ইয়োরোপীয় রাজাদের প্রভাবিত করে রানি-রা। আরব সমাজে এ এক ব্যতিক্রম তো বটেই।

শুরুতে ফানযিলাহ্-র রূপের জাদুতে বহুদিন মজে ছিলেন আসাদ-আদ-দীন, তবে ধীরে ধীরে সে-মোহ কাটাতে শুরু করেছেন। অবশ্য দেরি করে ফেলেছেন—ইতোমধ্যে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছে সে। ফলে ইয়োরোপীয় রাজাদের মতই অনেক ক্ষেত্রে অসহায় হয়ে পড়েছেন বাদশাহ্, স্ত্রী-র নাক গলানো ঠেকাতে পারছেন না রাজকার্যে। ফানযিলাহ্ও পা ফেলছে সতর্কভা[illegible]ব, সহজে বিরক্ত হতে দেয় না স্বামীকে, চাইলে খুব সহজেই ও[illegible]ক দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে নিতে পারবেন তিনি। মুখ ফুটে শুধু বল[illegible]তে হবে, এই যা। ঝুঁকিটা মাথায় রেখে কাজ করে সে, একজন মু[illegible]সলিম স্ত্রী হয়েও স্বামীর ক্ষমতায় ভাগ বসাচ্ছে সিসিলিয়ান ধূর্তত[illegible] দিয়ে।

বাগানে বাদশ[illegible]াহ্-র পাশে হাঁটছে এখন ফানযিলাহ্। ফুলে-ফলে ভরে আ[illegible]ছে চারদিক। বইছে মিষ্টি সুবাস। হালকা মেজাজে আছেন আসা[illegible]দ-আদ-দীন, সে-সুযোগে তাঁর কান ভারী করবার চেষ্টা চালিয়ে য[illegible]াচ্ছে সে দুর্ধর্ষ কর্সেয়ার শাকের-আল-

বাহারের নামে। ঈর্ষার বশে করছে এই কাজ, নিচ্ছে বাদশাহ্‌কে রুষ্ট করবার ঝুঁকি, কারণ লোকটা আসাদের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর এই অনুরাগ-ই ঈর্ষার জন্ম দিয়েছে ফানযিলাহ্-র মনে। নিজের স্ত্রী-পুত্রের চেয়ে শাকেরকে বেশি ভালবাসেন আসাদ-আদ-দীন। শোনা যাচ্ছে ও-ই তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে। ব্যাপারটা কিছুতেই মানতে পারছে না ফানযিলাহ্।

'...আমি বলব, লোকটা আপনার ভালমানুষির সুযোগ নিচ্ছে, হে স্বামী।' বলে উঠল সে।

'বাজে কথা,' বললেন আসাদ-আদ-দীন। 'খামোকাই সন্দেহ করছ শাকেরকে। কাজ-ই মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়, আর সে-কাজ দিয়েই আমার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য দেখিয়েছে ও।'

'আমিও কাজের কথাই বলছি। কথা নেই, বার্তা নেই, দখল করা স্প্যানিশ জাহাজ নিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল? এই-ই কি আপনার প্রতি ওর আনুগত্য?'

'যা জানো না, তা নিয়ে কথা বোলো না,' একটু যেন বিরক্ত হলেন আসাদ-আদ-দীন। 'নতুন অভিযানে গেছে শাকের। ফিরে আসুক, তখন নাহয় বিচার করা যাবে অভিযানটার বিষয়-আশয়। আগেভাগেই বাজে ধারণা নিয়ে বসে থাকার দরকার কী?'

'আমি শুধু আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাইছি...'

এবার সত্যিই মেঘ জমল বাদশাহ্‌র চেহারায়। রাগী গলায় বললেন, 'ওর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ আছে তোমার হাতে? নইলে মুখ বন্ধ রাখো, বোকা মেয়েমানুষ!'

থতমত খেয়ে গেল ফানযিলাহ্। মাথা নিচু করে পিছিয়ে গেল এক পা।

'চলো,' বলে উল্টো ঘুরলেন আসাদ-আদ-দীন। 'নামাজের সময় হয়ে আসছে।'

বাগানের সবখান থেকে ভেসে আসছে নীড়ে ফেরা পাখিদের কলকাকলি। পশ্চিমের আকাশে লাল আভা। সূর্য হারিয়ে যেতে বসেছে দিগন্তে, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে আসছে ছায়াগুলো। মোহনীয় পরিবেশ।

কণ্ঠে কপট দুঃখ ফুটিয়ে ফানযিলাহ্ বলল, 'আপনি আমার উপর রাগ করলেন, হে স্বামী? নিজের জন্য নয়, আপনার মঙ্গলের জন্যই তো বলেছি কথাগুলো! এ কি আমার অপরাধ? এ-ই কি তার প্রতিদান?'

'যদি এমন আচরণ পেতে না চাও, তা হলে আমার পছন্দের লোকজনের নামে বাজে কথা বোলো না,' শান্তস্বরে বললেন বাদশাহ্। 'আমি তোমাকে আগেই সাবধান করেছি।'

স্বামীর কাছে ঘেঁষে এল ফানযিলাহ্, কণ্ঠে মধু ঢেলে বলল, 'আর আমি? আমি আপনার পছন্দের নই? আমাকে আপনি ভালবাসেন না? দুনিয়ায় আমার চেয়ে বিশ্বস্ত আর কেউ কি আছে? আমার জীবন তো আপনারই জীবন। আপনার সুখের জন্য নিজেকে কি উৎসর্গ করে দিইনি আমি? তা হলে কেন এ অবিচার? বহিরাগত এক মানুষের হাতে আপনার জীবনসংশয়ের আশঙ্কা করছি বলে?'

'আমার জীবনসংশয়?' হেসে উঠলেন বাদশাহ্। 'তাও আবার শাকের-আল-বাহারের হাতে?'

'খাঁটি মুসলমান নয় ও। আমার তো ধারণা, স্রেফ স্বার্থ হাসিলের জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে লোকটা। এমন মানুষের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত আপনার।'

ঝট্ করে স্ত্রীর দিকে ফিরলেন আসাদ-আদ-দীন। রাগতস্বরে অভিশাপ দিলেন, 'তোমার জিভ খসে পড়ুক, মিথ্যেবাদিনী!'

'আমি আপনার পায়ের তলার ধুলো, স্বামী,' বলল

ফানযিলাহ্। 'কিন্তু রাগের মাথায় যা বলে ডাকলেন, তা আমি নই।'

'রাগের মাথায় না,' বললেন আসাদ-আদ-দীন, 'ভেবেচিন্তেই বলেছি ওটা। শাকের হলো ইসলামের বর্শা, আল্লাহ্-র দেয়া অব্যর্থ অস্ত্র, বিধর্মীদের বুকে যা প্রতিনিয়ত বিদ্ধ হয়ে চলেছে। আমাদের জয় এনে দিচ্ছে ও, আর তুমি কিনা ওকেই অবিশ্বাস করবার কথা বলছ? না, যথেষ্ট সহ্য করেছি, আর না। এক্ষুণি তুমি প্রমাণ দেবে তোমার অভিযোগের, নইলে মিথ্যে অপবাদ ছড়াবার জন্য শাস্তি পাবে।'

'ভাবছেন ভয় পাব তাতে?' একটু কঠিন হলো ফানযিলাহ্। 'সত্যভাষণের জন্য যদি শাস্তি পেতে হয়, তা মাথা পেতে নিতে রাজি আমি। প্রমাণ অবশ্যই দেব। আপনি বলুন, স্বামী, আমার সন্তান মারযাকের পিতা, বিধর্মী ক্রীতদাসকে কিনে মুক্তি দিচ্ছে শাকের-আল-বাহার... এ কি খাঁটি মুসলমানের কাজ?'

চুপ হয়ে গেলেন আসাদ-আদ-দীন। ভুল বলেনি ফানযিলাহ্, শাকেরের এই বিশেষ অভ্যাসটি সত্যিই মেনে নেয়া কঠিন। বহুবার এ-নিয়ে অস্বস্তি বোধ করেছেন তিনি, কিন্তু খোঁজখবর নেয়ার পর যা জানতে পেরেছেন, তা-ই যুক্তি হিসেবে দাঁড় করালেন স্ত্রী-র সামনে। 'একজনের মুক্তির বিনিময়ে দশজন দাস এনে দিচ্ছে ও...'

'বাধ্য হয়ে!' যোগ করল ফানযিলাহ্। 'নইলে সবার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। খাঁটি মুসলমানদের চোখে ধুলো দেয়ার প্রচেষ্টা ওটা। আপনারও দৃষ্টি ঘোলা করে রেখেছে, তাই বুঝতে পারছেন না, আজও ওই বিধর্মীদের জন্য দরদ আছে ওর মনে। খাঁটি মুসলমান হলে এমন দরদ থাকত না। ভেবে দেখুন, আপনিও তো সিসিলি থেকে তুলে এনেছেন আমাকে, তাই বলে কোনোদিন

আমাকে একজন সিসিলিয়ানকেও মুক্তি দিতে দেখেছেন? এ-সবই বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন... ওর ভিতরে বাস করতে থাকা খ্রিস্টান আত্মার বহিঃপ্রকাশ। এখন আবার নতুন কাণ্ড ঘটাচ্ছে—ইসলামের নামে দখল করা জাহাজ নিয়ে চলে গেছে সাগর পাড়ি দিতে... দুইশ' নিরীহ মুসলমানের জীবন বিপন্ন করছে নিজের জন্মভূমির চেহারা একটিবার দেখবার জন্য। বিস্কেনের মুখে তো তা-ই শুনলাম। ভেবে দেখেছেন, এর পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে?'

'আবারও তুমি না-জেনে বাজে কথা বলছ,' ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বাদশাহ্। 'ও না ফেরা পর্যন্ত আসল ঘটনা তো জানতে পারছি না আমরা!'

'সেটা ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিন, স্বামী আমার। ভুল বুঝুন আমাকে। আমি তো মূল্যহীন, আপনার হাতের খেলনা! কিন্তু তবু সতর্ক করে দেয়া কর্তব্য মনে করছি—শাকেরকে বিশ্বাস করলে মস্ত ভুল করবেন আপনি। এর জন্য যা শাস্তি দিতে চান, দিন।'

তিক্ত হাসি ফুটল বাদশাহ্র ঠোঁটে। 'জিভ তো না, যেন শয়তানের বাজানো কোনও ঘণ্টা ওটা তোমার, বেগম! আর কিছু বলবে?'

মনঃক্ষুণ্ন সুরে ফানযিলাহ্ বলল, 'না। আপনি আমাকে নিয়ে মশকরা করছেন। এই আমি মুখে তালা আঁটলাম।'

'আল্লাহ্র অশেষ দয়া!' হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যেন বাদশাহ্। 'চলো এখন, নামাজের সময় হয়ে গেছে।'

কিন্তু তাঁর জানা নেই, ফানযিলাহ্-র ছলাকলা এখনও শেষ হয়নি। রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি পৌঁছে হাত তুলল সে।

'ওই যে আমাদের ছেলে। দেখতে পাচ্ছেন, মালিক?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'পুত্রই কি পিতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী নয়?' বলল

ফানযিলাহ্। 'অথচ মারযাকের বদলে একজন বিদেশিকে পাশে নিয়েছেন আপনি। ওই স্থান শুধু ওর-ই প্রাপ্য!'

'ওই স্থানটা কি পূরণ করতে পারবে মারযাক?' জিজ্ঞেস করলেন আসাদ-আদ-দীন। 'এই বাচ্চা ছেলেটা... যার এখনও গোঁফ-দাড়িই গজায়নি ঠিকমত... সে কি নেতৃত্ব দিতে পারবে শাকের-আল-বাহারের মত? তলোয়ার ধরতে পারবে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে? বিজয় এনে দিতে পারবে আল্লাহ্ আর রাসূলের নামে?'

'শাকের-আল-বাহারের এই সাফল্য আসছে আপনার সাহায্য পাওয়ায়, স্বামী! মারযাক-ও তা পারবে, বয়স যতই কম হোক না কেন। শাকেরকে আজকের অবস্থানে আপনি নিয়ে এসেছেন, ওর নিজের কোনও কৃতিত্ব নেই তাতে।'

'এখানেই তুমি ভুল করছ, বেগম। শাকেরকে আজকের অবস্থানে এনেছেন মহান আল্লাহ্তা'লা। আমি নই। তাঁর মর্জি ছাড়া কিছুই ঘটে না। তুমি কি জানো না, আল্লাহ্ আমাদের সবার ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন?'

সাঁঝের আঁধার নেমে আসায় আলোচনার ইতি ঘটল ওখানে। নিষ্ফল রইল ফানযিলাহ্-র অপচেষ্টা। দ্রুত পা চালালেন বাদশাহ্, পরাজিত ভঙ্গিতে তাঁর পিছু নিল সে। গোধূলির আলো মুছে গিয়ে নেমে এল রাতের কালো পর্দা। দূর থেকে ভেসে এল মুয়াজ্জিনের আজান।

'...লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)...'

ব্যক্তিগত কামরায় পৌঁছুতেই রূপার পাত্রে পরিষ্কার পানি নিয়ে এল ভৃত্য, হাত-মুখ ধুয়ে অজু করলেন আসাদ-আদ-দীন। জায়নামাজ বিছিয়ে দেয়া হলো, মক্কামুখী হয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে শুরু করলেন তিনি। উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি

করলেন কুরআনের আয়াত, নামাজ শেষে দু'হাত তুলে করুণা চাইলেন সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্‌তা'লার কাছে।

প্রার্থনা শেষ হতেই নীচ থেকে ভেসে এল পদশব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ছায়া থেকে বেরিয়ে এল বাদশাহ্‌-র ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা, কালো পোশাকে প্রায়-অদৃশ্য ছিল ওরা, দর্শনপ্রার্থীকে থামাবার জন্য এগিয়ে গেল।

প্রাসাদ-আঙিনার অন্ধকার প্রবেশপথে জ্বলে উঠল বেশ কিছু প্রদীপ—ছাগলের চর্বির কারণে উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। কামরা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করলেন আসাদ, কে এসেছে জানার ইচ্ছে। সিঁড়ির গোড়ায় থামলেন তিনি, তখন প্রাসাদের আনাচে-কানাচে জ্বলে উঠছে বাতি। আঙিনাও আলোকিত হয়ে উঠল খুব শীঘ্রি।

বর্শাধারী রক্ষীদের প্রহরায় আলখাল্লা-পরা একজন মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাছে আসার পর চেনা গেল তাকে। সামানি... আসাদ-আদ-দীনের উজির। তার পিছনে বর্ম-পরিহিত আরেকজন রয়েছে।

'আসসালামু আলাইকুম, মহান আসাদ!' কুর্নিশ করল উজির।

'ওয়ালাইকুম আস-সালাম, সামানি,' প্রত্যুত্তর দিলেন বাদশাহ্‌। 'কী খবর?'

'সুসংবাদ আছে, হুজুর। শাকের-আল-বাহার ফিরে এসেছে।'

'আল্লাহ্‌ মেহেরবান!' আকাশের দিকে মুখ তুলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন আসাদ। উত্তেজনার আভাস পাওয়া গেল কণ্ঠে।

পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরালেন তিনি। সিঁড়ির মাথায় উদয় হয়েছে শীর্ণদেহী এক কিশোর। মাথায় পাগড়ি, গায়ে সোনালি কারুকাজ-অলা জোব্বা। বাদশাহ্‌ ঘাড় ফেরাতেই নিঃশব্দে সালাম জানাল। তারপর নামতে শুরু করল সিঁড়ি ধরে।

মুখে আলো পড়ল এবার। ধবধবে ফর্সা, গোলগাল, সুন্দর চেহারা—দাড়ি-গোঁফের অভাবে মেয়েলি একটা ভাব রয়েছে তাতে।

একটু হাসলেন আসাদ। নিশ্চয়ই মায়ের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে এসেছে মারযাক, এখানকার খবর তার কানে পৌঁছে দেবে।

'শুনেছ, মারযাক,' বললেন তিনি, 'শাকের-আল-বাহার ফিরে এসেছে।'

'বিজয়ীর বেশে, আশা করি?' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল মারযাক।

'আগের যে-কোনও বারের চেয়ে অনেক বড় বিজয় হয়েছে ওর,' উৎফুল্ল গলায় জানাল সামানি। 'সূর্যাস্তের খানিক আগে ঢুকেছে বন্দরে—দু'দুটো ফ্র্যাঙ্কিশ জাহাজ নিয়ে। খোল-ভর্তি দামি মালামাল!'

'আলহামদুলিল্লাহ!' স্বস্তি প্রকাশ করলেন আসাদ-আদ-দীন। ফানযিলাহ্-র অনর্থক সন্দেহের উপযুক্ত জবাব দেয়া যাবে এবার। 'কিন্তু এ-খবর ও নিজেই নিয়ে এল না কেন?'

'জাহাজ ছেড়ে আসতে পারছে না শাকের,' বলল সামানি। 'তাই ওর কায়িয়া ওসমানিকে পাঠিয়েছে আপনার কাছে।'

বর্ম-পরা কর্সেয়ার এবার এগিয়ে এসে কুর্নিশ করল বাদশাহ্‌কে।

'স্বাগতম এবং শুভেচ্ছা, ওসমানি,' বললেন আসাদ। ভৃত্যরা আঙিনায় বসবার ব্যবস্থা করেছে, সেখানে গিয়ে আসন নিলেন পুত্র-সহ। 'সব খুলে বলো আমাকে।'

বুক ফুলিয়ে অভিযানের বিবরণ শোনাল ওসমানি। দখল করা স্প্যানিশ গ্যালিয়ন নিয়ে ইংল্যাণ্ডে হানা দেবার কাহিনি... এমন এক সাগর পাড়ি দিয়েছে ওরা, যা আগে কোনও কর্সেয়ার পাড়ি দেয়নি। তারপর ফেরার পথে ডাচম্যানের সঙ্গে লড়াই—আকার

এবং লোকসংখ্যায় বেশি হবার পরেও কীভাবে আল্লাহ্‌র দয়ায় আর শাকের-আল-বাহারের সুযোগ্য নেতৃত্বে সেটাকে পরাজিত করা হয়েছে। পাওয়া গেছে বহুমূল্য ধনসম্পদ। তবে ওই লড়াইয়ে আহত হয়েছে তাদের দুর্ধর্ষ নেতা, কিন্তু মৃত্যুকে হার মানিয়ে টিকে আছে ইসলামের জয়যাত্রা অক্ষুণ্ন রাখবে বলে। সফল অভিযানের প্রমাণ হিসেবে আগামীকাল সমস্ত লুণ্ঠিত মালামাল নিবেদন করা হবে বাদশাহ্‌র পদতলে।

ছয়

ধর্মান্তর

ছেলের মুখে শাকের-আল-বাহারের ইংল্যাণ্ড অভিযানের বিবরণ শুনে অস্থিরতা অনুভব করল ফানযিলাহ্। গত কিছুদিন কায়োমনোবাক্যে প্রার্থনা করেছে সে দেবদেবী আর আল্লাহ্-র কাছে, কিন্তু সে-প্রার্থনা বিফল করে দিয়ে ফিরে এসেছে শাকের-আল-বাহার... দুঃসংবাদ হিসেবে এটুকুই যথেষ্ট। তার ওপর এবার সে নিয়ে এসেছে কল্পনাতীত ধনসম্পদ, সেইসঙ্গে দু'দুটো খ্রিস্টান জাহাজ! সন্দেহ নেই, এবার তার প্রতি বাদশাহ্-র অনুরাগ আরও বেড়ে যাবে; সাধারণ জনগণও ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে শুরু করবে তাকে। ভাবনাটা বজ্রাহতের মত স্থবির করে ফেলল ফানযিলাহ্‌কে। শোকে এতই মূহ্যমান হলো যে, অভিশাপও দিতে

পারল না শাকেরকে।

প্রাথমিক ধাক্কাটা অবশ্য কেটে গেল খানিক পর। চিন্তা-ভাবনা পরিষ্কার হয়ে এল। ওসমানির কাহিনির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করতে শুরু করল সে।

'ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত না?' আপনমনে বলে উঠল ফানযিলাহ্। 'এত ঝুটঝামেলা করে ইংল্যাণ্ডে গেল শাকের দু'জন মাত্র বন্দিকে আনার জন্য! সত্যিকার কর্সেয়ারের মত হামলা চালিয়ে ওর তো জাহাজ-ভর্তি দাস নিয়ে ফিরে আসার কথা! উঁহুঁ, কী যেন মিলছে না।'

নিজের কামরায় বসে আছে বেগম। জানালার সবুজ পর্দা ভেদ করে ভেসে আসছে বাইরের বাগানের সুবাস, শোনা যাচ্ছে একটা নিশাচর পাখির মন-মাতানো গান। তুর্কি চাদর বিছানো ডিভানের উপর আধশোয়া হলো সে, মেহেদি-মাখা পা থেকে খসে পড়ল সোনালি চপ্পল। হাতের উপর মাথা রেখে ছাত থেকে ঝুলন্ত প্রদীপের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। ডুবে গেল ভাবনায়।

অস্থির ভঙ্গিতে কামরার এক মাথা থেকে অন্য মাথায় পায়চারি করছে মারযাক। ওর পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই কামরাতে।

'কী মনে হয় তোমার?' ছেলের দিকে একটু পর মাথা ঘোরাল ফানযিলাহ্। 'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক না?'

থামল মারযাক। 'অস্বাভাবিক তো বটেই, মা। খুবই অস্বাভাবিক।'

'এর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় তোমার?'

'কারণ?' ভুরু কোঁচকাল মারযাক। মায়ের সঙ্গে প্রচুর মিল আছে চেহারায়, এখন সেখানে শূন্যতা ভর করল।

'হ্যাঁ, কারণ!' রাগী গলায় বলল ফানযিলাহ্। 'ভ্যাবলার মত

তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারো না? মনে হচ্ছে একটা বেকুবকে জন্ম দিয়েছি! খ্রিস্টান এক বহুরূপী যখন তোমার গায়ে সিঁড়ির মত পা দিয়ে সিংহাসনে উঠে বসবে, তখনও কি এভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে চাও? অমন সন্তান জন্ম দেবার আগেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলা দরকার ছিল আমার।'

মায়ের সিসিলিয়ান ক্রোধের সামনে কুঁকড়ে গেল মারযাক। একটু আহতও হলো—গর্ভধারিণীর মুখে এমন অপমান তো ওর পুরুষত্বের অপমান!

'কী করার আছে আমার?' বলল সে।

'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? মাথা খাটিয়ে নিজেই একটা কিছু বের করতে পারছ না? এভাবে চলতে থাকলে ক'দিন পর ওই খ্রিস্টানের বাচ্চার সামনে মাথা নোয়াতে হবে তোমাকে। লোকে হাসবে আমার দিকে তাকিয়ে... বলবে একটা নপুংসক জন্ম নিয়েছে আমার গর্ভে। হায় আল্লাহ্, তার চেয়ে আমাকে বাঁজা বানিয়ে রাখোনি কেন?'

'থামো মা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মারযাক। 'এভাবে আর অপমান কোরো না আমাকে। পথ দেখাও... বলে দাও কী করতে হবে। তা যদি না পারি, তখন নাহয় কথা শুনিয়ো। তার আগ পর্যন্ত রাগারাগি কোরো না। তা হলে কিন্তু আমি তোমার কাছে আসা বন্ধ করে দেব।'

ছেলের হুমকি শুনে ঝট্ করে সিধে হলো ফানযিলাহ্। ডিভান থেকে নেমে ছুটে গেল তার কাছে, জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। পরম মমতায় টেনে নিল বুকে। বাদশাহ্-র হারেমের আঠারো বছরেও তার ভিতরের ইয়োরোপীয় মাতৃ-সত্তা বদলে যায়নি। কোমল নয়, সন্তানের প্রতি হিংস্র... আগ্রাসী তার ভালবাসা।

'পুত্র আমার,' মারযাকের মাথায় হাত বুলিয়ে ভারী গলায়

বলল ফানযিলাহ্, 'ভয় পাই আমি তোমার জন্য, আর সেটাই আমাকে রূঢ় হতে বাধ্য করছে। রাগ নয়, আসলে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ওটা। তুমি নও, বাইরের এক লোক তোমার আব্বার উত্তরাধিকারী হবে—এটা ভাবলেই মাথা এলোমেলো হয়ে যায় আমার। কী বলি, তা নিজেও জানি না। কিছু মনে কোরো না। জয় আমাদেরই হবে, বাছা। তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করার আমিই করব। বিদেশি ওই বদমাশটাকে ফেরত পাঠাব তার জন্মস্থানে! আস্থা রাখো আমার উপর।' পায়ের শব্দ পেয়ে একটু থামল সে। 'মনে হচ্ছে তোমার আব্বা আসছে। যাও, ওঁর সঙ্গে একা থাকতে দাও আমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মারযাক। একটু পর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন আসাদ-আদ-দীন। দাড়িতে হাত বোলাচ্ছেন, সারা মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। দায়সারা ভঙ্গিতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল ফানযিলাহ্।

'আশা করি খবর তুমি শুনেছ, ফানযিলাহ্?' বললেন বাদশাহ্। 'তোমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব মিলেছে তো?'

আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াতে শুরু করল ফানযিলাহ্। হালকা গলায় বলল, 'জবাব? হ্যাঁ, এক অর্থে জবাব তো বটেই। শাকের-আল-বাহার দুইশ' মুসলমানের জীবন বিপন্ন করে ইংল্যাণ্ডে অভিযান চালিয়েছে মাত্র দু'জন বন্দি নিয়ে ফিরে আসার জন্য। দু'জন, মালিক!' জোর দিল সে। 'অথচ ওর উদ্দেশ্য ঠিক থাকলে দুইশ' নিয়ে ফিরতে পারত।'

'হাহ্! তুমি বুঝি এই-ই শুনেছ?' বাঁকা সুরে বললেন বাদশাহ্।

'এটুকুই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে আমার কাছে,' আয়না থেকে চোখ সরাল না ফানযিলাহ্। 'হ্যাঁ, এ-ও শুনেছি যে ফেরার পথে কপালজোরে একটা খ্রিস্টান ডাচম্যানের দেখা পায় ও...

দামি মালামালে ভর্তি... আপনার নামে সেটাকে দখল করেছে।'

'কপালজোরে মানে?'

'নয়তো কী?' এবার ঘুরল ফানযিলাহ্। দৃঢ় গলায় প্রশ্ন করল, 'আপনার কি ধারণা ওটা শাকেরের মূল পরিকল্পনার অংশ ছিল?'

একটু যেন থমকে গেলেন আসাদ-আদ-দীন। মাথা নিচু করে ভাবতে শুরু করলেন।

স্বামীর এই দ্বিধার সুযোগ নিতে দেরি করল না ফানযিলাহ্। বলল, 'পুরোটাই ভাগ্যের খেলা—একটা ডাচম্যান পড়ে গিয়েছিল শাকেরের সামনে। আরও বড় ভাগ্য—ওটার খোল সোনা-দানা আর হীরা-জহরতে ভর্তি ছিল। ওসবের কারণে অন্ধ হয়ে গেছেন আপনি, দেখতে পাচ্ছেন না এই অভিযানের পিছনে লোকটার সত্যিকার উদ্দেশ্য।'

'সত্যিকার উদ্দেশ্য?' বললেন বাদশাহ্। 'কী সেটা?'

মন-ভোলানো হাসি ফুটল ফানযিলাহ্-র ঠোঁটে, এমন ভাব যেন কিছুই অজানা নেই তার—আসলে ওটা নিজের অজ্ঞতা ঢাকার কৌশল। বলল, 'এ-প্রশ্ন আপনি আমাকে করছেন, মহান বাদশাহ্? আপনার দৃষ্টি কি তীক্ষ্ণ নয়? আপনার বুদ্ধি কি যথেষ্ট প্রখর নয়? যে-জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার, সেটা আপনার কাছে হবে না কেন? তা হলে কি ধরে নেব শাকের-আল-বাহার আপনাকে জাদুটোনা করেছে?'

ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন আসাদ-আদ-দীন। এগিয়ে গিয়ে খপ্ করে একটা কবজি ধরলেন স্ত্রী-র। ধমকের সুরে বললেন, 'শাকেরের উদ্দেশ্য বলো, বেগম। পেটের মধ্যে গোমর লুকিয়ে রেখে আমার সঙ্গে মশকরা কোরো না। কথা বলো!'

উঠে দাঁড়াল ফানযিলাহ্। রূঢ় গলায় বলল, 'আমি কিছু বলতে চাই না।'

'বলতে তোমাকে হবেই!' গর্জে উঠলেন আসাদ। 'নইলে আল্লাহ্-র কসম, তোমাকে আমি চাবুকপেটা করব। এত বছরে যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছি আমি তোমার ব্যাপারে, তুমি তাই ভুলেই গেছ—অবাধ্য স্ত্রীকে শাস্তি দেবার বিধান আছে। আমার প্রশ্নের জবাব দাও, নইলে নিজের দুর্দশার জন্য তুমিই দায়ী হবে!'

'তবু বলব না,' সরোষে বলল ফানযিলাহ্। 'ফাঁসিতে চড়ান আমাকে, তবু শাকের-আল-বাহারের বিরুদ্ধে একটা শব্দও উচ্চারণ করব না আমি। কেন করব? আপনি বিশ্বাস করবেন আমার কথা? আজ পর্যন্ত করেছেন? সত্যি কথা বলার পরেও যখন মিথ্যেবাদিনীর অপবাদ জোটে কপালে... তখন আর সত্য বলে লাভ কী?' নিখুঁত অভিনয়ের মাধ্যমে এবার চোখের পানি ফেলতে শুরু করল সে। 'স্বামীর আমার... আমার প্রাণের মালিক... অন্যায় করছেন আপনি আমার সঙ্গে। মস্ত অন্যায়!' হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বাদশাহ্-র পায়ের কাছে। 'ভালবাসার বিনিময়ে আপনি আমাকে শুধু ক্রোধ উপহার দিচ্ছেন। তার ভারে আমি চাপা পড়ে গেছি...'

ঝটকা দিয়ে স্ত্রী-র হাত ছেড়ে দিলেন আসাদ-আদ-দীন। 'থামাও এসব ন্যাকামি!' উল্টো ঘুরে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে। জানেন, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ছলনাময়ী বেগমের কথার জালে আটকা পড়ে যাবেন।

কিন্তু ততক্ষণে উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে ফানযিলাহ্-র। বাদশাহ্-র মনে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে সে, সেটা ছড়াতে শুরু করেছে আস্তে আস্তে। সন্দেহটা ঠিকই ঘুরপাক খাচ্ছে—শাকের কেন গিয়েছিল ইংল্যাণ্ডে... কেন মাত্র দু'জন বন্দি নিয়ে ফিরেছে ওখান থেকে? এর পিছনে সত্যিই কি কোনও গূঢ় কারণ আছে? শাকেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা ছাড়া বিষয়টা পরিষ্কার করার উপায় নেই, আর সেজন্যে অপেক্ষা করতে হবে পরদিন সকাল পর্যন্ত...

যখন সে লুণ্ঠিত মালামাল ভেট হিসেবে বাদশাহ্-র পায়ে নিবেদন করতে আসবে।

আগের মতই প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে থাকলেন আসাদ-আদ-দীন, কিন্তু এবার তাতে আগের মত উচ্ছ্বাস রইল না।

নিজের জাহাজের পুপ-ডেকে আস্তে আস্তে পায়চারি করছে শাকের-আল-বাহার। বন্দরের ওপাশে, পাহাড়ি ঢালের কোলে গড়ে ওঠা নগরীর বুকে তখন নিভে যেতে শুরু করেছে কৃত্রিম আলো। ঘুমিয়ে পড়ছে সবাই। আকাশ থেকে শুভ্র আলোয় প্রকৃতিকে এখন স্নান করাচ্ছে মস্ত চাঁদ। সে-আলোয় ঝিলমিল করছে বন্দরের শান্ত পানি।

শরীরের ক্ষত শুকিয়ে গেছে ওর, শক্তিও ফিরে পেয়েছে অনেকখানি। দু'দিন আগে বেরিয়ে এসেছে ডেকে, সেই থেকে বেশিরভাগ সময় খোলা আকাশের নীচে কাটিয়েছে। এর মধ্যে একবার শুধু দেখতে গেছে দুই বন্দিকে। রোজামুণ্ড একটু শুকিয়েছে, চেহারাও ফ্যাকাসে, কিন্তু অটুট মনোবল লক্ষ করা গেছে ওর মধ্যে। গডলফিন পরিবারের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে, ভেঙে পড়েনি কিছুতেই। অলিভারকে তার কেবিনে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হয়েছিল, কারণ আরওয়েনাকের সে-রাতের পর আর সামনে আসেনি সে... কিন্তু বিস্ময়টা ছিল ক্ষণিকের। পরমুহূর্তে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে শক্ত খোলসের মধ্যে। কথা বলেনি, তাকায়নি চোখ তুলেও। মুখোমুখি বসে কথা বলবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে অলিভার, কিন্তু চরম ঘৃণা নিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে মেয়েটা। নিজেকে বড্ড ছোট মনে হয়েছে অলিভারের, বেশিক্ষণ অপমানিত হবার প্রবৃত্তি হয়নি। বেরিয়ে এসেছে কেবিন থেকে।

এরপর ভাইকে দেখতে গিয়েছিল ও। জাহাজের পাটাতনের তলায় অন্ধকার খুপরিতে বিধ্বস্ত অবস্থায় পেয়েছে তাকে। মুখ আমসি, অপরিচ্ছন্ন শরীর... সব মিলিয়ে চরম অসম্মানজনক একটা অবস্থা। কিন্তু এক ফোঁটা অভিযোগ করেনি লায়োনেল, বরং বড় ভাইকে দেখে সিঁটিয়ে গেছে সে, হারিয়েছে মুখের ভাষা... বোধহয় নিজের অপরাধের উপলব্ধি এসেছে তার ভিতর। ক্ষমাও চাইবার সাহস হয়নি। অলিভারও কিছু বলেনি তাকে, নীরবে ফিরে এসেছে উপরের ডেকে। সেই থেকে ওখানেই সময় কাটিয়েছে ও।

আজ রাতে... চাঁদের আলোয় যখন পায়চারি করছে শাকের, একটা ছায়ামূর্তি উদয় হলো তার পিছনে। ডাকল ওর পুরনো নামে।

'সার অলিভার!'

ভুরু কুঁচকে উল্টো ঘুরল ও। জ্যাসপার লেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েক গজ দূরে। 'কাছে এসো। তোমাকে না কতবার বলেছি, সার অলিভারের কোনও অস্তিত্ব নেই? আমি এখন শাকের-আল-বাহার... রাসূলের অনুসারী। এই নামেই ডাকবে আমাকে।'

'জী।'

'কী বলতে এসেছ?'

'একটা প্রশ্ন আছে—আমি কি বিশ্বস্ততার সঙ্গে আপনার দেয়া দায়িত্ব পালন করিনি?'

'কেউ কি সেটা অস্বীকার করেছে?'

'না। কিন্তু স্বীকৃতিও তো পেলাম না। ভেবে দেখুন, আপনি যখন আহত হয়ে পড়ে ছিলেন, তখন কিন্তু চাইলেই বেঈমানী করতে পারতাম। জাহাজদুটোকে যদি ভুল পথ দেখিয়ে টেগাস নদীর মুখে নিয়ে যেতাম, কী-ই বা করার ছিল আপনার লোকের?'

'টের পাওয়ামাত্র তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলত ওরা।'

'তার আগেই যদি পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তাম? সাঁতার কেটে জমিনে উঠে যেতাম?'

'তা হলে আমাদের চেয়ে ভয়ঙ্কর আরেক দল লোকের কবলে পড়তে। দু'দিন না যেতেই দেখতে, ক্যাথলিক ম্যাজেস্টির জাহাজে দাঁড় টানতে শুরু করেছ। যাক গে, এ-সব ফালতু ব্যাপার নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। তুমি তোমার কথা রেখেছ, আমিও আমারটা রাখব। ভয়ের কিছু নেই তোমার।'

'তা আমি করছিও না। কিন্তু আমাকে বাড়ি পাঠাবেন বলে কথা দিয়েছেন আপনি...'

'তো?'

'সমস্যা হলো, আমার কোনও বাড়ি নেই... কোনও ঠিকানা নেই। এতকাল পরে নতুন করে ঘর বাঁধাও সম্ভব নয় আমার পক্ষে। যদি আমাকে ফেরত পাঠান, তা হলে আমি ঠিকানাহীন এক যাযাবরে পরিণত হব।'

'তা হলে কী চাও তুমি?'

'সত্যি বলতে কী, খ্রিস্টান জাত আর খ্রিস্টধর্মের উপর বিতৃষ্ণা এসে গেছে আমার। এমনিতেও ধর্মে-টর্মে বিশ্বাস নেই আমার। কাজের মানুষ আমি, সার অলি... দুঃখিত, শাকের-আল-বাহার। গোটা ইংল্যাণ্ডে আমার চেয়ে ভাল দিক-নির্দেশক পাবেন না আপনি, সাগরের লড়াইয়ের ব্যাপারেও আমার আছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। আমাকে আপনি কাজে লাগাতে পারেন না?'

'আমার মত দলত্যাগী হতে চাও তুমি?'

'দলত্যাগী শব্দটা আমার বড়ই অপছন্দ। কে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করছে, তার উপর নির্ভর করছে ওটা। তারচেয়ে সোজা

ভাষায় এটুকু বললেই হয়, আমি মুহাম্মদের ধর্মে দীক্ষিত হতে চাই।'

'কিন্তু এ-ধর্মে যোগ দিলে জলদস্যুতা আর সাগরে লুটপাটের কাজে অংশ নিতে হবে তোমাকে।'

'ওটা তো নতুন কিছু নয়। এতদিন জলি রজার্সের পতাকার তলে করেছি ও-কাজ, এখন নাহয় অন্য একটা পতাকার তলে করব।'

'মুসলমান-রা মদ খেতে পারে না। তোমাকেও ছাড়তে হবে ওসব।'

'একট-আধটু ত্যাগ স্বীকার নাহয় করলামই! তার প্রতিদানও তো পাব।'

চুপ করে একটু ভাবল অলিভার। লেইয়ের কণ্ঠে কোনও কপটতা লক্ষ করেনি। সত্যিই আন্তরিক সে। স্বজাতির একজন লোক হাতের কাছে থাকলে মন্দ হয় না। হোক সে জ্যাসপার লেইয়ের মত একজন মানুষ।

'ঠিক আছে, তোমার কথাই সই,' একটু পর বলল ও। 'জীবনে অনেক মন্দ কাজ করেছ, তারপরেও যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো, আমার সঙ্গে রাখতে রাজি আছি তোমাকে। কিন্তু কড়া নজর থাকবে আমার। যদি একটুও তেড়িবেড়ি করো... যদি সামান্যতম বিশ্বাসঘাতকতার আভাসও পাই, সোজা ফাঁসিতে লটকাব। পরপারে গিয়েও রেহাই পাবে না, নরকে পুড়তে হবে তোমাকে।'

আবেগের উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হলো লেইয়ের চেহারায়। হাঁটু গেড়ে অলিভারের হাত ধরল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল উল্টোপিঠে চুমো খেয়ে। 'ধন্যবাদ!' বলল সে। 'আমি রাজি। পাওয়া উচিত নয়, তবু আমার প্রতি দয়া দেখিয়েছেন আপনি, এ-ঋণ শোধ

হবার নয়। আমার বিশ্বস্ততা নিয়ে কিচ্ছু ভাববেন না। আমার জীবন এখন আপনার সম্পত্তি, যা বলবেন তা-ই অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।'

লেইয়ের হাতে চাপ দিল অলিভার, মুখে কিছু বলল না। উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল লোকটা। তারপর সিঁড়ি ধরে নেমে গেল পুপ-ডেক থেকে। মন আনন্দে উদ্বেল, তার অন্ধকার জীবনে দেখা দিয়েছে আলোর দিশা।

সাত

মারযাক-বিন-আসাদ

পুরো চল্লিশটা উট প্রয়োজন হলো ডাচম্যান থেকে সমস্ত মালামাল কসবাহ নগরীর প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে যেতে। শাকের-আল-বাহার নিজে তদারক করল এই বিশাল মিছিলের, জানে অমূল্য এই সম্পদ দেখে দুষ্টলোকের মাথায় কুমতলব খেলতে পারে... চেষ্টা করতে পারে সব ছিনিয়ে নেবার। আলজিয়ার্সের সংকীর্ণ রাস্তায় ধনসম্পদের এমন বিপুল সম্ভার আগে কখনও দেখা যায়নি কি না! সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্সেয়ারের উপযুক্ত লুঠ ওটা।

মিছিলের সামনে রয়েছে একশো কর্সেয়ার, পরনে জোব্বা-পাজামা, তার উপরে বর্ম, হাতে ঢাল-তলোয়ার। যে-কোনও ধরনের হামলা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত। ওদের

পিছনে রয়েছে ডাচম্যান থেকে আটক বন্দির দল—হাতে-পায়ে শেকল পরা অবস্থায় পরাজিত ভঙ্গিতে হাঁটছে তারা। চারদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে রেখেছে বেশ কিছু কর্সেয়ার—এদের হাতে চাবুক, কেউ তেড়িবেড়ি করলে পিঠে দু'ঘা বসিয়ে দিতে দ্বিধা করছে না। বন্দি-দলের পরে রয়েছে আরেকদল যোদ্ধা, তাদের পিছনে উটের সারি—প্রত্যেকটার পিঠে বড় বড় বোঁচকা। সবার পিছনে শেষ একদল কর্সেয়ার-পরিবেষ্টিত অবস্থায় এগোচ্ছে স্বয়ং শাকের-আল-বাহার। সাদা একটা তেজী ঘোড়ার পিঠে বসেছে ও, মাথায় সোনালি পাগড়ি, গায়ে কারুকাজ করা বর্ম।

রাস্তার দু'পাশ ভরে গেছে মানুষের ঢলে। শুধু তা-ই নয়, প্রতিটি বাড়ি-ঘরের দরজা-জানালাও ঢাকা পড়ে গেছে কৌতূহলী দর্শকের চেহারায়। বকের মত গলা বাড়িয়ে সবাই একনজর দেখতে চাইছে শাকের-আল-বাহারকে। আবাসিক এলাকা পেরিয়ে বাদশাহ্-র প্রাসাদের কাছে পৌঁছুল শোভাযাত্রা। সেখানে জয়ধ্বনি দিচ্ছে বিচিত্র আরেকদল দর্শক। অভিজাত মূরেরা আছে ওখানে, সঙ্গে ব্যক্তিগত কালো ভৃত্য; রয়েছে উচ্চভূমির তামাটে চামড়ার আরবেরা, গায়ে উটের চামড়ার পোশাক; আরও দেখা গেল লেভাণ্টিন তুর্কি আর স্পেনের ইহুদি উদ্বাস্তু-দল—ভিন্নধর্মী হলেও খ্রিস্টানদের হাতে অত্যাচারিত হিসেবে তাদেরকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে আলজিয়ার্সে।

সূর্যের প্রখর রোদ অগ্রাহ্য করে এরা অপেক্ষা করছে শাকের-আল-বাহারকে স্বাগত জানাতে। জানালও দেখার মত ভঙ্গিতে। তাদের সম্মিলিত শ্লোগানে কেঁপে উঠল গোটা নগরী, মনে হলো বুঝি ভূকম্প শুরু হবে এখুনি।

প্রাসাদ-সীমানার কাছাকাছি গিয়ে বিভক্ত হলো শোভাযাত্রা। বাইরের একটা আঙিনার উদ্দেশে বন্দিদেরকে নিয়ে গেল

ওসমানি, আর ঢালু পথ ধরে উটের সারি নিয়ে এগিয়ে চলল শাকের। খুলে দেয়া হলো প্রাসাদ-ফটক, সেটা পেরিয়ে মূল আঙিনায় প্রবেশ করল প্রাণীগুলো। অপেক্ষারত সহিস-দল এগিয়ে এল, হাঁটু গেড়ে বসাল উটগুলোকে। ব্যস্ত হয়ে পড়ল পরিচর্যায়। শাকের ঢুকল ওগুলোর পিছু পিছু, প্রাসাদরক্ষীরা ওকে সম্মান দেখিয়ে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল।

আঙিনার একপ্রান্তে খাটানো হয়েছে শামিয়ানা। তার ছায়ায় তক্তপোশে বসে আছেন বাদশাহ্ আসাদ-আদ-দীন, সঙ্গে পুত্র মারযাক আর উজির সামানি। সবুজ-সোনালি পোশাকে জনাছয়েক দেহরক্ষী পাহারা দিচ্ছে তাঁকে। বাদশাহ্-র পাগড়িতে জ্বলজ্বল করছে একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতির দামি পাথর।

উটের সারি যখন আঙিনায় ঢুকছে তখনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন আসাদ-আদ-দীন। রাতভর ঠিকমত ঘুমাতে পারেননি, ফানযিলাহ্-র ঢোকানো বিষে ছটফট করেছে অন্তর। শাকের-আল-বাহারকে সন্দেহ করতে সায় পাননি মন থেকে, কিন্তু বেগমের যুক্তিকেও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছিলেন না। পড়ে গিয়েছিলেন উভয়সঙ্কটে। কিন্তু সামনের বিশাল লুঠ দেখবার পর আচমকা দ্বিধা কেটে গেল তাঁর। হাসি ফুটল তাঁর মুখে, উঠে দাঁড়ালেন পুত্রের মত প্রিয় দুর্ধর্ষ যুবকটিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

দৃপ্ত পায়ে হেঁটে শামিয়ানার দিকে এগোল শাকের-আল-বাহার। ঋজু দেহ টানটান হয়ে আছে, গর্বিত ভঙ্গিতে উঁচু করে রেখেছে মাথা। প্রতি পদক্ষেপে প্রকাশ পাচ্ছে আভিজাত্য। ওর সঙ্গে রয়েছে অনুচর আলি, আর লালচে চেহারার পাগড়ি-পরা আরেকজন মানুষ—ভাল করে তাকালে জ্যাসপার লেই বলে চেনা যাবে তাকে। ইতোমধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে সে।

বাদশাহ্-র পায়ের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল শাকের-আল-বাহার। অভিবাদন জানাল, 'আল্লাহ্র করুণা আর শান্তি বর্ষিত হোক আপনার উপর, মহামান্য বাদশাহ্!'

দু'কাঁধ ধরে ওকে হাসিমুখে দাঁড় করালেন আসাদ-আদ-দীন। আলিঙ্গন করলেন আন্তরিক ভঙ্গিতে। প্রাসাদের জানালার আড়াল থেকে নীচের ঘটনা দেখছিল ফানযিলাহ্, দৃশ্যটা তার মাথায় আগুন জ্বেলে দিল, দাঁতে দাঁত পিষল সে নিজের অজান্তে।

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ আর তাঁর রাসূলের—তাঁরাই তোমাকে সুস্থ দেহে ফিরিয়ে এনেছেন, বাছা,' বললেন বাদশাহ্। 'আমার এই বৃদ্ধ হৃদয় আনন্দে ভরে গেছে তোমার বিজয়ের কাহিনি শুনে।'

এরপর আবরণ সরিয়ে লুণ্ঠিত মালামাল দেখানো হলো তাঁকে। ওসমানির মুখে বিবরণ শুনেছেন বাদশাহ্, কিন্তু সামনাসামনি সব দেখবার পর বুঝলেন—প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি সম্পদ নিয়ে ফিরেছে শাকের। তাঁর অনুমতি নিয়ে সবকিছু পাঠিয়ে দেয়া হলো কোষাগারে, সঙ্গে গেল উজির সামানি, মালামালের হিসেব-নিকেশ করবে সে। অভিযানে অংশ নেয়া প্রত্যেক কর্সেয়ার পাবে ওর একটা ভাগ, নেতা হিসেবে শাকের পাবে পাঁচ শতাংশ।

একে একে চলে গেল সবাই। শেষ পর্যন্ত প্রাসাদ আঙিনায় রইল মাত্র অল্প কয়েকজন—দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত অবস্থায় আসাদ-আদ-দীন ও মারযাক, সেইসঙ্গে শাকের-আল-বাহার, আলি ও জ্যাসপার লেই। সুযোগ পেয়ে দলের নতুন সদস্যের সঙ্গে বাদশাহ্কে পরিচয় করিয়ে দিল শাকের, জানাল—অভিজ্ঞ নাবিক ও যোদ্ধা লেইয়ের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবার কথা। আসাদ-আদ-দীনের অনুমতি চাইল তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে

অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য।

প্রস্তাবটার তীব্র বিরোধিতা করল মারযাক। বলল, ইতোমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ নাসরানি কুকুর যোগ দিয়ে ফেলেছে বিশ্বাসীদের দলে। তাদের সংখ্যা বাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। শাকের-আল-বাহারের দলে এদের অন্তর্ভুক্তি তো আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ!

শান্ত চোখে তাকে জরিপ করল শাকের। দৃষ্টিতে একই সঙ্গে মিশে আছে ক্ষোভ ও ঘৃণা।

'রাসূল (সাঃ)-এর পতাকাতলে নব-মুসলিমদের সমবেত হওয়াকে ঝুঁকিপূর্ণ বলছ তুমি?' বলল ও। 'যাও, পবিত্র কুরআন পড়ে এসো—দেখো, নব-মুসলিমদের প্রতি সত্যিকার মুসলমানের দায়িত্ব সম্পর্কে কী লেখা আছে ওখানে। বাদশাহ্-র পুত্র তুমি, তাই বলে মহান আল্লাহ্-র বাণীকে অগ্রাহ্য করবার অধিকার নেই তোমার। যারা অন্ধকারের পথ ছেড়ে ঈমানের আলোতে এসেছে, অধিকার নেই তাদেরকে নিয়ে মন্দ কথা বলারও। ও-কাজ করতে গিয়ে শুধু আমাকে বা আমার সঙ্গীসাথীকে অপমান করছ না, অপমান করছ নিজের জন্মদাত্রী মা-কেও। কারণ তিনিও আমাদেরই মত এক ধর্মান্তরিত মুসলমান!'

কোনও জবাব ফুটল না মারযাকের ঠোঁটে। পরাজয়ের ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল এক পা, কিন্তু দু'চোখ জ্বলে উঠেছে ক্রোধে।

হেসে উঠলেন আসাদ-আদ-দীন। 'ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তুমি সবকিছুই শিখে নিয়েছ শাকের,' বললেন তিনি। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, সাহসিকতার পাশাপাশি তুমি জ্ঞানেরও আধার।' জ্যাসপার লেইয়ের দিকে ফিরলেন। তাকে বরণ করে নিলেন বিশ্বাসীদের দলে। নাম বদলে রাখলেন—জ্যাসপার রইস।

আনুষ্ঠানিকতা শেষে শাকের ছাড়া সবাইকে বিদায় করা

হলো। প্রিয় কর্সেয়ারকে মধ্যাহ্নভোজে তাঁর সঙ্গী হবার নিমন্ত্রণ জানালেন বাদশাহ্। নিজের পাশে ওকে বসতে দিয়ে খাবার পরিবেশনের নির্দেশ দিলেন।

প্রথমে আনা হলো পরিষ্কার পানি—হাত-মুখ ধোয়ার জন্য। এরপর এল খাবার—রুটি, কয়েক রকমের মাংস, ডিম আর ফলমূল।

বিসমিল্লাহ্ পড়ে খেতে শুরু করল ওরা, ফাঁকে ফাঁকে চলল গল্প। অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ শাকেরের মুখে শুনতে চাইলেন বাদশাহ্। সব শোনার পর আরেক দফা প্রশংসা করলেন ওর। হঠাৎ একটা প্রশ্ন ছুঁড়ল মারযাক।

'আচ্ছা, তুমি কি মাত্র দু'জন ইংরেজ দাস আনবার জন্য এমন দুঃসাহসিক একটা অভিযানে গিয়েছিলে?'

প্রশ্নটার মধ্যে ঝামেলার গন্ধ পেল অলিভার। কিন্তু শান্ত গলায় বলল, 'তা হবে কেন? ওটা আমার পরিকল্পনার সামান্য একটা অংশ ছিল মাত্র। আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্-র নামে মহাসাগরে হানা দেয়া।'

'কিন্তু ডাচম্যানের সঙ্গে দেখা হওয়া তো ছিল ভাগ্যের ব্যাপার,' বলল মারযাক, মায়ের শিখিয়ে দেয়া কথা আউড়াচ্ছে সে। 'এমন কিছু ঘটবে, সেটা নিশ্চয়ই জানতে না আগে থেকে?'

'জানতাম না?' হেঁয়ালি-ভরা একটা হাসি দিল অলিভার। ওর আত্মবিশ্বাস দেখে স্বয়ং বাদশাহ্ ধোঁকা খেলেন। 'তা হলে কি বলতে চাও, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্-র তরফ থেকে সাহায্য পাবার কোনও আশা করিনি আমি? তাঁর উপর আস্থা রাখিনি? নির্ভর করেছি শুধু নিজের ভাগ্যের উপর?'

'চমৎকার জবাব!' বললেন আসাদ-আদ-দীন।

কিন্তু এত সহজে হার মানতে রাজি নয় মারযাক। ফানযিলাহ্

তাকে ভালমত শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছে। কণ্ঠে সৌজন্য বজায় রেখে বলল, 'তারপরেও একটা বিষয় অস্পষ্ট লাগছে আমার কাছে, হে শাকের-আল-বাহার।'

'কী সেটা?'

'এত ঝামেলা করে ইংরেজদের দেশে পা রাখলে তুমি, অথচ বন্দি করলে মাত্র দু'জন মানুষকে! সঙ্গে যথেষ্ট লোক ছিল... তোমার ভাষ্যমতে মহান আল্লাহ্‌র সাহায্যও পাচ্ছিলে... তা হলে আরও বেশি করে দাস সংগ্রহ করোনি কেন? চাইলে নিশ্চয়ই শ'খানেক নিয়ে ফিরতে পারতে?'

একটু থমকে গেল অলিভার। চেহারায় কপট সারল্য ফুটিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মারযাক, বাদশাহ্‌ও কৌতূহল নিয়ে মাথা ঘুরিয়েছেন। বুঝল—এবার শুধু আল্লাহ্-রাসূলের নাম শুনিয়ে কাজ হবে না, একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে ওকে।

'আসলে,' গলা খাঁকারি দিয়ে বলল ও, 'প্রথম যে-বাড়িটা পেয়েছি, সেখান থেকেই আটক করেছি ওই দুই বন্দিকে। কাজটা নিঃশব্দে সারা যায়নি, মনে হচ্ছিল আশপাশের লোকজন টের পেয়ে গেছে। তার ওপর তখন ছিল রাত, জাহাজ থেকে দূরে গিয়ে কোনও গাঁয়ে হামলা চালানো নিরাপদ ছিল না।'

আসাদ-আদ-দীন মনে হলো সন্তুষ্ট হলেন না ব্যাখ্যাটায়। মারযাকের মুখে হালকা হাসি ফুটল।

'ওসমানি কিন্তু ভিন্ন কথা বলেছে,' বলল সে। 'ও নাকি তোমাকে অনুরোধও করেছে গাঁয়ে হামলা করবার জন্য, তাতে কোনও ঝুঁকি ছিল না। তুমি সে-অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছ।'

বাদশাহ্-র ভুরু কুঞ্চিত হলো এ-কথা শুনে। অলিভার টের পেল, ওকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছে ধুরন্ধর কিশোর শাহজাদা। মন ভরে গেল তিক্ততায়।

'কথাটা কি সত্যি?' গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন আসাদ-আদ-দীন।

পাল্টা আক্রমণে যাবার সিদ্ধান্ত নিল অলিভার। চোখ রাখল বাদশাহ্‌র চোখে। বলল, 'যদি সত্যি হয়, মালিক? কী করবেন আপনি?'

'কথা ঘুরিয়ো না। ঘটনা সত্যি কি না জানতে চাই আমি।'

'আপনার মত জ্ঞানী মানুষের মুখে এমন কথা শুনব, ভাবতে পারিনি,' রাগতস্বরে বলল শাকের। 'ওসমানির কথায় গুরুত্ব দেবেন আপনি? ও আমার আদেশে চলে, নাকি আমি ওর? যদি এতই আস্থা রাখেন ওর উপর, তা হলে নেতৃত্বের ভার ওর কাঁধেই চাপিয়ে দিন না! দেখা যাক, আল্লাহ্-রাসূলের নামে ইসলামের জয়যাত্রা কেমন চালায় ও!'

একটু যেন রুষ্ট হলেন আসাদ-আদ-দীন। 'অল্পতেই রেগে যাচ্ছ তুমি!' অভিযোগ ফুটল তাঁর গলায়।

'আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলুন, মহানুভব, আমার রাগ কি অন্যায্য?' বলল শাকের। 'পুরো বছরে যা সম্ভব হয় না, একটামাত্র অভিযান থেকে সে-পরিমাণ সম্পদ নিয়ে ফিরেছি আমি। অথচ এমন সাফল্য পাবার পরেও একটা বাচ্চা ছেলে আমাকে তিরস্কার করছে—ওসমানির কথা আমি শুনিনি কেন!'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল ও, রাগে থমথম করছে চেহারা। আসলে পুরোটাই অভিনয়। বুঝে গেছে, সন্দেহের যে-তীর ছোঁড়া হয়েছে ওর দিকে, তা ধ্বংস করতে হবে আবেগের তীব্রতা দেখিয়ে। বলে চলল, 'কেন শুনব আমি ওসমানির কথা? ওর কথা শুনলে কি আজ আপনার পায়ে রাজ-সম্ভার নিবেদন করতে পারতাম আমি? আমার সাফল্য কি আমার প্রতিটা কাজের জবাব দিচ্ছে না? ওর কথামত চললে যদি বিপর্যয় দেখা দিত... যদি

ব্যর্থ হতো অভিযান... তা হলে কার ঘাড়ে দোষ বর্তাতেন আপনি, মালিক? আমার, নাকি ওসমানির? ওর নাম তুলে এভাবে আমাকে ছোট করবেন না দয়া করে!'

উদ্দেশ্য সফল হলো অলিভারের। প্রিয় কর্সেয়ারকে খেপে যেতে দেখে বাদশাহ্ একটু নরম হয়ে এলেন। সন্দেহের ছাপ মিলিয়ে গেল চেহারা থেকে। সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'শান্ত হও, শাকের। বড্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছ তুমি। কেউ কোনও অভিযোগ করছে না তোমার বিরুদ্ধে। তোমার বিচার-বুদ্ধির উপর আস্থা আছে আমার। আশা করি যুক্তিসঙ্গত কারণেই অগ্রাহ্য করেছ ওসমানির অনুরোধ। এ-নিয়ে আর কোনও উচ্চবাচ্য হবে না।'

'মাফ করবেন, মহানুভব,' গলার স্বর বদলাল অলিভার। 'আপনার প্রতি আমার আনুগত্য আর ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের গায়ে আঁচড় লাগায় একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। এবারের অভিযানে আহত হয়েছি আমি, এখনও জামা খুললে দেখতে পাবে সেই আঘাতের দাগ। ওই দাগই আমার আনুগত্য আর বিশ্বাসের জ্বলজ্বলে সাক্ষী।' মারযাকের দিকে ফিরল। 'হে শাহজাদা, তোমার দাগটা কোথায়?' বাঁকা সুরে জিজ্ঞেস করল ও।

মুখ কাঁচুমাচু হয়ে গেল মারযাকের, আর তা দেখে হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

'থাক, যথেষ্ট হয়েছে,' বাধা দিলেন আসাদ-আদ-দীন। 'ওকে আর কিছু বোলো না। ভুলটা আমারই—তোমার প্রতি সুবিচার করিনি।'

'না, না, মালিক,' তাড়াতাড়ি বলল অলিভার। 'আপনি জ্ঞানী ও সুবিচারক, এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তবে কেউ কেউ আপনাকে ভুল পথে চালাতে চায় আর কী।' বাদশাহ্-র পাশে

আবার আসন গ্রহণ করল ও। 'স্বীকার করছি, ইংল্যাণ্ডের কাছাকাছি পৌঁছুনোর পর আমি আবেগের বশে কিছুটা পরিচালিত হয়েছি। ওখানকার একজন মানুষ বহু বছর আগে অন্যায় করেছিল আমার সঙ্গে, তাকে শাস্তি দেয়ার লোভ এড়াতে পারিনি। ওকেই তুলে আনার জন্য পা রেখেছিলাম তীরে... শেষ পর্যন্ত ঝোঁকের বশে একজনের জায়গায় দু'জনকে তুলে এনেছি।' কথা বলতে বলতে বাদশাহ্-র দিকে তাকাল ও, তাঁকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে, এবার অনুরোধটা করা যেতে পারে। 'ওই দুই বন্দি এখনও আমার জাহাজেই আছে। ওদেরকে আজকের মিছিলে আনা হয়নি...'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলেন আসাদ-আদ-দীন... স্বাভাবিক গলায়।

'কারণ একটা পুরস্কার চাই আমি আপনার কাছে—এত বছরের সেবার স্বীকৃতি হিসেবে।'

'চাও, বাছা।'

'ওই বন্দিদেরকে আমি নিজের কাছে রাখতে চাই। আপনি তার অনুমতি দিন।'

চুপ করে একটু ভাবলেন বাদশাহ্। একেবারে অযৌক্তিক কিছু চাইছে না শাকের, কিন্তু তারপরেও বিসর্জন দিতে পারলেন না নিজের নীতি। ফানযিলাহ্-র ছড়ানো বিষও তাঁর সিদ্ধান্তে সম্ভবত প্রভাব ফেলল খানিকটা। বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, শাকের... অনুমতি দিতে পারলে খুশি হতাম আমি, কিন্তু আইন সেটাকে সমর্থন করে না। তুমি তো জানো, লুণ্ঠিত মালামাল থেকে একটা জিনিসও সরাবার নিয়ম নেই... সবকিছু সমবণ্টন করতে হবে। দাসদের বেলায় নিয়ম হলো—তাদেরকে তোলা হবে নিলামে, পছন্দসই দাসকে যেন কিনে নেবার সমান সুযোগ

পায় সবাই। এটাই আইন!'

'আইন!' প্রতিবাদ করল অলিভার। 'আপনার কথাই তো আইন, মালিক! আপনি আমাদের বাদশাহ্!'

'না, বাছা। বাদশাহীর চেয়ে আইন অনেক বড়। ইচ্ছেমত তাকে বুড়ো আঙুল দেখাবার অধিকার নেই আমার। তা হলে স্বৈরাচারী বলবে আমায় লোকে। সম্মান হারাব আমি সবার চোখে। তা সম্ভব নয়। দুই বন্দিকে আজই তুমি পাঠিয়ে দেবে বাকিদের সঙ্গে। আগামীকাল খোলা-বাজারে উন্মুক্ত নিলাম হবে ওদের। এটাই আমার সিদ্ধান্ত। বুঝতে পেরেছ?'

আরেকদফা অনুরোধ করতে যাচ্ছিল অলিভার, থেমে গেল মারযাকের দিকে চোখ পড়ায়। শাকের-আল-বাহারের দুর্দশা দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে শাহজাদা। নিজেকে তাই আর ছোট না করবার সিদ্ধান্ত নিল। বাদশাহ্কে বলল:

'বেশ, তা হলে ওদের মূল্য বলুন, মহানুভব। আমি নগদ টাকা দিয়েই কিনে নিচ্ছি ওদেরকে।'

মাথা নাড়লেন আসাদ-আদ-দীন। 'আমি ওদের মূল্য বলতে পারব না, শাকের। আগ্রহী ক্রেতারাই ওটা আগামীকাল নির্ধারণ করবে। কিনতে চাইলে তখনই ওদেরকে কিনতে হবে তোমাকে। এ-ব্যাপারে আর কিছু শুনতে চাই না। দুই বন্দিকে এখুনি পাঠিয়ে দাও বাজারে।'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য, মালিক,' মাথা ঝুঁকিয়ে পরিস্থিতি মেনে নিল অলিভার।

খাওয়াশেষে বেরিয়ে গেল ও প্রাসাদ-আঙিনা থেকে, হুকুম তামিল করবার জন্য। পিতার সঙ্গে একা হলো এবার মারযাক-বিন-আসাদ। একটু পর ফানযিলাহ্-ও যোগ দিল ওদের সঙ্গে।

আট

মা ও ছেলে

পরদিন ভোরে, ফজরের আজান হতে না হতে প্রাসাদে ছুটে এল বিস্কেন-আল-বোরাক। জাহাজ নিয়ে সাগরে গিয়েছিল, ওখানে দেখা পেয়েছে এক স্প্যানিশ মাছধরা নৌকার, তাতে চড়ে এক মুসলিম গুপ্তচর আসছিল আলজিয়ার্সে। তাকে নিজের জাহাজে তুলে নিয়েছে বিস্কেন, ক্রীতদাস-বাহিনীকে বাধ্য করেছে রাতভর পাগলের মত দাঁড় চালাতে, যাতে দ্রুত পৌঁছুতে পারে বাদশাহ্-র কাছে। ভোরে বন্দরে পা রেখেই লোকটাকে সহ ছুটে এসেছে।

জরুরি এক খবর এনেছে গুপ্তচর, তার এক ভাই মালাগা-য় স্প্যানিশ কোষাগারে কাজ করে। ভাই খবর পাঠিয়েছে, নেপলসের উদ্দেশে রওনা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে স্পেনের এক জাহাজ, সেখানকার গ্যারিসনের জন্য প্রচুর পরিমাণ সোনা থাকবে ওতে। স্বর্ণভরা এই স্প্যানিশ গ্যালিয়নের সঙ্গে কোনও পাহারা থাকবে না, ওটাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইয়োরোপের উপকূল ছুঁয়ে গন্তব্যে পাড়ি জমাতে, যাতে কর্সেয়ারদের নজর এড়াতে পারে। খবরটা নিয়ে এসেছে গুপ্তচর, যাতে ওটাকে আক্রমণ করে দখল করা হয়।

গুপ্তচরকে ধন্যবাদ জানালেন আসাদ-আদ-দীন, নির্দেশ

দিলেন তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে। প্রতিশ্রুতিও দিলেন, অভিযান সফল হলে লুঠের একটা বড়-সড় অংশ পুরস্কার দেয়া হবে তাকে। তারপর তিনি ডেকে পাঠালেন শাকের-আল-বাহারকে। গুপ্তচরের সঙ্গে আলাপচারিতায় উপস্থিত ছিল মারযাক, সে-ও দ্রুত ছুটে গেল খবরটা মা-কে জানাবার জন্য।

একটু পরেই বাদশাহ্-র সামনে উপস্থিত হলো ফানযিলাহ্। রূঢ় গলায় বলল, 'এ-সব কি শুনছি, মালিক? আপনি নাকি শাকের-আল-বাহারকে একটা সোনা-ভরা স্প্যানিশ গ্যালিয়নের পিছনে পাঠাচ্ছেন?'

বিরক্ত চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন আসাদ-আদ-দীন। বললেন, 'এ-কাজে ওর চেয়ে দক্ষ আর কাউকে চেনো তুমি?'

'আমি অন্তত একজনকে চিনি, ওই বিদেশির বদলে যার উপর আমার বাদশাহ্-র অনেক বেশি নির্ভর করা উচিত। সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত এবং নিঃস্বার্থ... ইসলামের নামে দখল করা সম্পদ থেকে যে নিজের জন্য কিছু রেখে দেবার আবদার জুড়বে না।'

'ধ্যাত্তেরি!' সখেদে বললেন বাদশাহ্। 'এ-নিয়ে আর কত বকবক করবে তুমি? আর কে সেই মহাত্মা, যাকে নিয়ে এত বড়াই করছ তুমি?'

'মারযাক!' টান দিয়ে ছেলেকে পাশে আনল ফানযিলাহ্। 'আপনার একমাত্র সন্তান! আর কতকাল প্রাসাদে শুয়ে-বসে থাকবে ও? গতকাল আপনার সামনেই ওর গায়ে যুদ্ধের চিহ্ন নেই বলে মশকরা করেছে শাকের... নাকি লক্ষ করেননি সেটা? সুযোগ যদি না দেন, তা হলে কীভাবে নিজেকে প্রমাণ করবে ও? সত্যি করে বলুন, কী চান আপনি—ছেলে ঘরের চার দেয়ালে বন্দি হয়ে থাকুক, নাকি লড়াই করে নেতৃত্ব দিতে শিখুক... যাতে বাপের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পারে?'

'তোমার-আমার ইচ্ছেয় কিছু যায়-আসে না,' কাঁধ ঝাঁকালেন সাদ। 'আমাদের সর্বোচ্চ নেতা হলেন ইস্তাম্বুলের সুলতান। নিই সিদ্ধান্ত দেবেন—কার হাতে যাবে আলজিয়ার্সের সনভার। আমরা তাঁর প্রতিনিধি মাত্র।'

'কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তো সুলতানের সামনে যোগ্য প্রার্থী কা চাই। নিজের ছেলেকে সেই যোগ্যতা অর্জন করতে দিচ্ছেন আপনি... এ তো বড়ই লজ্জার কথা। কেন... ছেলের উপর আস্থা নেই আপনার?'

'সে-কথা আমি কখনও বলিনি। সমস্যা হলো ওর বয়স—এখনও একেবারে বাচ্চা ও।'

'ওর বয়সে মহান ওকিয়ালির সঙ্গে সাগর চষে বেড়িয়েছেন আপনি।'

'আল্লাহ্-র দয়ায় ওর বয়সে অনেক বেশি লম্বা আর শক্তিশালী ছিলাম আমি। এমন নাজুক শরীর নিয়ে আর যা-ই করা যাক, যুদ্ধ করা যায় না।'

'কী যে বলছেন, তা আপনি নিজেই জানেন,' ফুঁসে উঠল ফানযিলাহ্। 'ভাল করে দেখুন, ছেলে এখন পুরুষ হয়ে উঠেছে। এমন সন্তান নিয়ে আর যে-কেউ গর্ব অনুভব করবে। কোমরে তলোয়ার ঝোলানোর বয়স হয়েছে ওর... সময় হয়েছে জাহাজের পাটাতনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার।'

'হ্যাঁ, আব্বা,' সুর মেলাল মারযাক, 'আমি তৈরি!'

'তা-ই?' বাঁকা সুরে বললেন আসাদ। 'এটাই তোমার মনের কথা? ওই স্প্যানিশ জাহাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাও? এ-ধরনের অভিযানের ব্যাপারে কতটুকু জ্ঞান আছে তোমার?'

'বাবা-ই যখন কিছু শেখায়নি, জ্ঞান থাকবে কী করে?' ছেলের পক্ষ নিয়ে বলল ফানযিলাহ্। 'আপনার অবহেলায় এই দশা

হয়েছে ওর, ও-নিয়ে উপহাস করা মানায় না আপনাকে।'

ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার দশা বাদশাহ্-র, কষ্ট করে সামলালেন নিজেকে। বললেন, 'রাগারাগি করতে চাই না, ফানযিলাহ্... আমি শুধু একটা প্রশ্ন করব। সত্যি করে বলো, তোমার কি ধারণা মারযাক লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবে?'

'না,' স্বীকার করল ফানযিলাহ্। 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ঘরে বসে থাকবে ও। যদি কোনও অভিযানে না যায়, শিখবে কী করে? আমি মিনতি করছি, ওকে যেতে দিন... আর কিছু না হোক, অন্তত অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য!'

একটু ভেবে নিলেন আসাদ-আদ-দীন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'বেশ, তবে তা-ই হোক। যাবে ও অভিযানে... শাকের-আল-বাহারের সঙ্গে।'

'শাকের-আল-বাহার?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ফানযিলাহ্।

'মারযাকের জন্য ওর চেয়ে ভাল শিক্ষক আর কেউ হতে পারে না।'

'কিন্তু তাই বলে নিজের ছেলেকে ওর ভৃত্য বানিয়ে পাঠাবেন?'

'ভৃত্য হবে কেন, ছাত্র হিসেবে যাবে।'

'আমি যদি পুরুষ হতাম,' বলল ফানযিলাহ্, 'তা হলে কোনোদিন সন্তানকে অন্য কারও শিক্ষা নিতে দিতাম না। চেষ্টা করতাম তাকে নিজের আদলে গড়বার। ওটা আপনারও দায়িত্ব, হে স্বামী। আমি মিনতি করছি, আর কাউকে দেবেন না মারযাকের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব... বিশেষ করে এমন একজনকে, যাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না! তার চেয়ে আপনি নিজেই যান এই অভিযানে—ছেলেকে কায়িয়া বানিয়ে। আপনার কাছ থেকে সবকিছু শিখবে ও।'

মাথা নাড়লেন আসাদ। 'বুড়ো হয়ে গেছি আমি, গত দু'বছরে একবারও সাগরে যাইনি। কে জানে, হয়তো ভুলেই গেছি কীভাবে জয়ী হতে হয়। না, না... এত বড় ঝুঁকি নিতে পারব না আমি। শাকের-আল-বাহারই যাবে এই অভিযানে। তোমার ছেলে যদি যেতে চায়, ওর সঙ্গে যেতে হবে।'

'মালিক...' অনুনয় করতে যাচ্ছিল ফানযিলাহ্, থেমে গেল কাফ্রি এক ভৃত্য উদয় হওয়ায়। সে জানাল, শাকের-আল-বাহার এসেছে, বাদশাহ্-র জন্য অপেক্ষা করছে আঙিনায়। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আসাদ। কামরা থেকে বেরুনোর সময় তাঁকে আটকাতে চাইল ফানযিলাহ্, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল ফানযিলাহ্। কামরার আবছায়া পরিবেশে নেমে এল থমথমে নীরবতা। দূর থেকে ভেসে আসা হালকা হাসি ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই—হারেমের মেয়েরা কী নিয়ে যেন হাসিতে মেতে উঠেছে। ওটুকু আওয়াজ-ই সহ্য হলো না ফানযিলাহ্-র। হাততালি দিয়ে এক কাফ্রি বাঁদীকে ডাকল।

'চুপ করতে বলো ওদেরকে,' হিংস্র গলায় বলল সে। 'এরপর কোনও শব্দ শুনলে নিজ হাতে আমি ওদেরকে চাবুকপেটা করব!'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল বাঁদী। তার খানিক পরেই নেমে এল কবরের নিস্তব্ধতা। ফানযিলাহ্-কে খোদ বাদশাহ্-র চেয়েও বেশি ভয় পায় হারেমের মেয়েরা।

ছেলেকে নিয়ে জানালার কাছে গেল বেগম, উঁকি দিল নীচের আঙিনায়। ওখানে শাকের-আল-বাহারের সঙ্গে কথা বলছেন আসাদ-আদ-দীন।

'...কখন রওনা হতে পারবে তুমি?' শোনা গেল তাঁর প্রশ্ন।

'আল্লাহ্ যদি চান, তা হলে আপনি বলামাত্র-ই,' তড়িৎ জবাব

দিল শাকের।

'খুব ভাল।' প্রিয় কর্সেয়ারের কাঁধে পরম মমতায় হাত রাখলেন বাদশাহ্। 'তা হলে এক কাজ করো, আগামীকাল সূর্য উঠলেই বেরিয়ে পড়ো। আশা করি এর মধ্যে সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে ফেলতে পারবে।'

'ঠিক আছে, আমি এখুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি,' বলল অলিভার। যদিও মনে মনে একটু খারাপ লাগছে এত তাড়াতাড়ি আবার অভিযানে যেতে হবে বলে। বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল ওর।

'ক'টা জাহাজ নেবে?'

'একটামাত্র স্প্যানিশ গ্যালিয়নকে দখল করতে? আমারটাই যথেষ্ট, মহানুভব। সঙ্গে বেশি জাহাজ না থাকলেই ভাল। স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারব, প্রয়োজনে গা-ঢাকাও দিতে পারব সহজে। বেশি জাহাজ থাকলে সেটা সম্ভব হবে না।'

'ভাল সিদ্ধান্ত,' একমত হলেন বাদশাহ্। 'আল্লাহ্ তোমার অভিযান সফল করুন।'

'আমি কি তা হলে যেতে পারি?'

'একটু দাঁড়াও। আরেকটা ব্যাপার আছে। আমার ছেলেকে তো দেখেছ—মারযাক, সাবালক হয়ে উঠেছে। আল্লাহ আর দেশের সেবায় নাম লেখানোর সময় হয়েছে ওর। আমার ইচ্ছে, এবারের অভিযানে তোমার কায়িয়া হিসেবে সঙ্গে যাক ও। আমি যেভাবে তোমাকে সব শিখিয়েছি, সেভাবে তুমিও সবকিছু শেখাবে ওকে।'

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো না অলিভারের। ফানযিলাহ্ আর তার ছেলের সঙ্গে আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক ওর। মারযাককে সঙ্গে নেয়া মানেই ঝামেলা কাঁধে নেয়া। কিন্তু বাদশাহ্কে তো আর সরাসরি আপত্তি জানানো যায় না! তাই একটু কৌশলে জবাব দিল

ও।

'আপনার চেয়ে ভাল শিক্ষক আর কেউ হতে পারে না,' বলল অলিভার। 'আগামীকাল আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন না কেন, মালিক? মুসলমানদের কাণ্ডারী আপনি... আপনার উপস্থিতিতে স্প্যানিশ গ্যালিয়নে আঁকশি আটকাতে পারলে সম্মানিত বোধ করব আমি।'

ভুরু কোঁচকাল আসাদ-আদ-দীন। 'তুমিও বলছ এ-কথা?'

'আর কেউ বলেছে নাকি?' বলল অলিভার। 'বলে থাকলে খুব ভাল কথাই বলেছে। আমি তাতে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছি। আপনার অধীনে যুদ্ধ করা যে কত আনন্দের, তা আমার চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। চলুন না, মালিক, অন্তত এই একটা অভিযানে। আপনার ছেলেও অমূল্য এক সুযোগ পাবে দুনিয়ার সেরা কর্সেয়ারের কাছ থেকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নেবার।'

দাড়িতে হাত বোলালেন বাদশাহ্। 'তুমি আমাকে প্ররোচিত করছ, শাকের!'

'আমি শুধু সত্যি কথা বলছি...'

'না, আর কিছু শুনতে চাই না,' মাথা নেড়ে বললেন আসাদ। 'বাস্তবকে মেনে নেয়াই ভাল। সাগরে যাবার বয়স পেরিয়ে এসেছি আমি, শরীর দুর্বল হয়ে গেছে; তা ছাড়া এখানে থাকা দরকার আমার। বুড়ো সিংহ কি তরুণ হরিণকে শিকার করতে পারে? লড়াই করবার দিন শেষ আমার, এখন সময় তোমাদের— যাদেরকে আমি লড়তে শিখিয়েছি। তোমরাই এখন গভীর সাগরে ইসলামের বিজয়-পতাকা ওড়াবে।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'স্বীকার করছি, যেতে ইচ্ছে করছে... রক্ত নেচে উঠছে অভিযানের কথা শুনে। কিন্তু সেটাই সব নয়। তোমাকেই যেতে হবে এই অভিযানে। মারযাককে সঙ্গে নিয়ো—ওকে নিরাপদে ফিরিয়ে

আনার দায়িত্ব আমি তোমার কাঁধে সঁপছি।'

'আল্লাহ্ সাক্ষী, আমি এই দায়িত্ব প্রাণ দিয়ে হলেও পালন করব।'

বাদশাহ্-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল শাকের-আল-বাহার। ওসমানিকে খুঁজে বের করে অস্ত্র আর রসদ তুলতে বলবে জাহাজে। একশো ক্রীতদাস নেবে দাঁড় টানার জন্য, আর নেবে তিনশো যোদ্ধা।

নিজের কামরায় ফিরে এলেন আসাদ-আদ-দীন। ফানযিলাহ্ আর মারযাক তখনও ওখানে অপেক্ষা করছে। নিজের সিদ্ধান্ত তাদেরকে জানিয়ে দিলেন তিনি। তা শুনে কপাল চাপড়াল ফানযিলাহ্। বলল, 'হায় খোদা, আমার পরামর্শ তা হলে অগ্রাহ্য করলেন আপনি? এক পয়সাও দাম নেই আমার কথার?'

'না!' বললেন আসাদ। তিতিবিরক্ত হয়ে গেছেন তিনি স্ত্রী-র আচরণে।

'আজ বুঝলাম, আমাকে কোন্ চোখে দেখেন আপনি,' কাঁদো কাঁদো চেহারা করল ফানযিলাহ্। মারযাকের মুখেও তখন মেঘ জমেছে।

'যা খুশি ভাবো,' বললেন আসাদ। 'কিন্তু কাল ভোরে শাকের-আল-বাহারের সঙ্গে অভিযানে যাবে মারযাক, ছাত্র হিসেবে। নিজের চোখে দেখবে কীভাবে ইসলামের অব্যর্থ অস্ত্রে পরিণত হয়েছে সে, কেন তাকে আল্লাহ্-র বর্শা বলি আমরা। এ-ব্যাপারে আর কোনও উচ্চবাচ্য যেন না হয়!'

এ-কথা শুনে ক্রোধে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল মারযাকের। খ্যাপাটে গলায় বলল, 'নাসরানি ওই কুত্তাটার সঙ্গে যদি সাগরে যেতেই হয়, ওকে ক্রীতদাসদের সঙ্গে বসাব আমি—দাঁড় টানার বেঞ্চে!'

'কী বললে?' হুঙ্কার ছাড়লেন আসাদ-আদ-দীন। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে এগোলেন ছেলের দিকে। 'কী ধরনের কথা এসব?'

আতঙ্কিত হয়ে দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়াল ফানযিলাহ্, যেন অসহায় সিংহশাবককে রক্ষা করতে চাইছে তার মা। কিন্তু খেপে গেছেন বাদশাহ্, ধাক্কা দিয়ে সামনে থেকে সরিয়ে দিলেন স্ত্রীকে। মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফানযিলাহ্।

'আল্লাহ্‌র গজব পড়ুক তোমার উপরে!' পিতার গর্জন শুনে কুঁকড়ে গেল মারযাক। 'যে-সাপের পেটে জন্ম নিয়েছ, সে-ই কি তোমাকে শিখিয়েছে আমার মুখের উপর কথা বলতে? কসম আল্লাহ্‌র, যথেষ্ট সহ্য করেছি তোমাদের ঔদ্ধত্য। কিন্তু আর না। আজ থেকে আমার কথা মুখ বুজে মেনে নিতে হবে তোমাদেরকে, নইলে ভয়ানক শাস্তি পাবে! মারযাক-বিন-আসাদ, আগামীকাল তুমি শাকের-আল-বাহারের সঙ্গে সাগরে যাবে। যদি টুঁ শব্দও করো এ-ব্যাপারে, তা হলে তোমার হুমকিই বাস্তবায়িত করব। তবে শাকের না, নিজেকে আবিষ্কার করবে তুমি মাল্লাদের বেঞ্চে... দাঁড় টানা অবস্থায়! ক্রীতদাসদের মত পিঠে চাবুক খেয়ে বাধ্যগত হতে শিখবে তুমি!'

আতঙ্কে বিবশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মারযাক, হারাল মুখের ভাষা। এই প্রথম ওর পিতাকে এমন রেগে যেতে দেখছে। কিন্তু সে-রাগ দেখে মোটেই দমল না ফানযিলাহ্। ভিন্ন ধাতের মহিলা সে, ভয় দেখিয়ে তার জিভকে ঠেকানো সম্ভব নয়।

'আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা,' শুনিয়ে শুনিয়ে বলল সে, 'আমার স্বামীর চোখ খুলে দিন তিনি। যেন দেখতে পান—কারা তাঁকে সত্যি সত্যি ভালবাসে, আর কে তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিতে চায়।'

ঝট্ করে তার দিকে ফিরলেন আসাদ-আদ-দীন।

'কী!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'এখনও তোমার মুখ বন্ধ হয়নি?'

'বন্ধ হবেও না, যতক্ষণ এ-দেহে প্রাণ আছে। মরার আগ পর্যন্ত আপনাকে আমি সুপরামর্শ দেবার চেষ্টা করে যাব, মালিক।'

'সুর যদি না বদলাও,' হুমকি দিলেন বাদশাহ্, 'খুব শীঘ্রি সেটা ঘটতে চলেছে।'

'আমি ভয় করি না, হে স্বামী। শাকের-আল-বাহার আপনাকে অন্ধ করে রেখেছে... ওর মুখোশ খোলার জন্য প্রয়োজনে প্রাণ দেব আমি! ওই বন্দিদু'জনের কথা ভাবুন, যাদেরকে ও ইংল্যাণ্ড থেকে এনেছে। শুনেছি ওদের মধ্যে একটা মেয়ে আছে—অপূর্ব সুন্দরী, যে-সৌন্দর্য পাশ্চাত্যের মেয়েদের প্রতি ইবলিশের উপহার। কেন এনেছে শাকের মেয়েটাকে? কেন তাকে দাস-বাজারের নিলামে তুলতে চাইল না? উল্টো আপনার কাছে এসে আবদার জুড়ল তাকে নিজের কাছে রেখে দেবার জন্য! হায়, এ-সবে কিছুতেই কর্ণপাত করছেন না আপনি। বার বার আপনার সামনে শাকেরের মিথ্যে-আনুগত্যের প্রমাণ হাজির করছি আমি, অথচ সেসব অগ্রাহ্য করে অন্যায় আক্রোশ দেখাচ্ছেন নিজের রক্তের প্রতি!'

খপ্ করে স্ত্রী-র কবজি ধরলেন আসাদ, টান দিয়ে দাঁড় করালেন তাকে। বাদশাহ্-র সৌম্য মুখশ্রী এখন হিংস্র হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে সাহস হারাল ফানযিলাহ্, বুঝল—আজ বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

'আইয়ুব!' গলা চড়িয়ে ডাকলেন আসাদ।

আঁতকে উঠল ফানযিলাহ্। ভয়ার্ত গলায় বলল, 'মালিক! শান্ত হোন! কী করতে চাইছেন আপনি?'

হিংস্র হাসি দেখা দিল বাদশাহ্-র ঠোঁটে। বললেন, 'কী

করব? যা বহুদিন আগেই করা উচিত ছিল। আজ তুমি চাবুকের আঘাত পাবে!' গলা চড়িয়ে ডাকলেন আবার—'আইয়ুব! কোথায় তুমি?' লোকটা তাঁর বেগমের পরিচারক—একজন খোজা।

তাড়াতাড়ি স্বামীর পা জড়িয়ে ধরল ফানযিলাহ্। 'ক্ষমা করুন... ক্ষমা করুন আমাকে। আল্লাহ্ জানেন, ভালবাসার তীব্রতায় বেয়াদবি করে ফেলেছি আমি। তার জন্য মাফ চাইছি আপনার কাছে। দয়া করুন!'

ফানযিলাহ্-র স্বীকারোক্তি শুনে মন একটু টলল বাদশাহ্-র। আইয়ুব হন্তদন্ত হয়ে দরজায় হাজির হতেই হাতের ইশারায় বিদায় করলেন। তারপর স্ত্রী-র দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাকে এই অবস্থাতেই শোভা পায়। আগামীতে মুখ খোলার আগে স্মরণ রেখো কথাটা।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন তিনি। বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে। পিছনে রয়ে গেল আতঙ্কিত মা আর ছেলে। দুজনেই কাঁপছে থরথর করে। কোনও সন্দেহ নেই, মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে ওরা।

অনেকক্ষণ কোনও কথা বলল না কেউ। শেষে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল ফানযিলাহ্, হাত চালিয়ে বেশভূষা ঠিক করল। এগিয়ে গেল জানালার পাশের একটা ছোট্ট আলমারির দিকে। ওটা থেকে বের করে আনল একটা মাটির পাত্র, মুখ খুলে সুবাসিত পানীয় ঢালল কাপে, চুমুক দিল তাতে তৃষ্ণার্তের মত। শরীরের কাঁপুনি থামেনি পুরোপুরি। মাথাও কাজ করছে না ঠিকমত, পানীয় পরিবেশনের জন্য একগাদা দাসী-বাঁদী আছে—তাদেরকে ডাকার কথা মনেই নেই।

একটু পর নিজেকে সামলে নিল সে। ফিরল মারযাকের দিকে। প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে বলল, 'এবার?'

'এবার মানে?' বিস্মিত গলায় বলল মারযাক।

'কী করব আমরা, সেটা জানতে চাইছি। বাদশাহ্-র রাগের তলায় চাপা পড়ে ধ্বংস হয়ে যাব, নাকি প্রতিকার করব এর? লোকটা পাগল হয়ে গেছে, নাসরানি শয়তানের জাদু ভর করেছে ওর উপর। এভাবে চলতে থাকলে শাকেরের পায়ের তলায় পিষ্ট হবে তুমি, মারযাক।'

ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসল শাহজাদা। করুণ হয়ে উঠেছে চেহারা। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কী-ই বা করার আছে আমাদের?'

'মাথা খাটাও। একটা কিছু করতেই হবে... এবং সেটা খুব শীঘ্রি। কুত্তার বাচ্চা শাকের-আল-বাহার!' গাল দিয়ে উঠল ফানযিলাহ্। 'গজব পড়ুক ওর উপর। বেঁচে থাকলেও যেন কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।'

'হ্যাঁ... বেঁচে থাকলে...' বলতে বলতে থেমে গেল মারযাক। আচমকা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দৃষ্টি। সুর পাল্টে বলল, 'ভুল পথে এগোচ্ছি আমরা, মা। শাকেরকে নিচু করতে চাইছি আব্বার চোখে, কিন্তু তাতে কেবল সময়ই নষ্ট হচ্ছে। মাঝখান থেকে উনি রেগে যাচ্ছেন আমাদের উপর। আমার মনে হয় সমস্যা সমাধানের জন্য সংক্ষিপ্ত এবং সরাসরি কোনও পথ বেছে নেয়া দরকার।'

অন্য চোখে ছেলের দিকে তাকাল ফানযিলাহ্। বলল, 'ব্যাপারটা অনেক আগেই মাথায় এসেছে আমার। সামান্য কিছু সোনা খরচ করলে শাকেরকে সরাবার জন্য লোকও জোগাড় করা যাবে। কিন্তু কাজটা এত ঝুঁকিপূর্ণ যে...'

'ও মরে গেলে ঝুঁকি রইল কোথায়?'

'খুনোখুনির কাজটাই ঝুঁকিপূর্ণ। শাকের মরলেই সব শেষ হচ্ছে না, ঘটনার জের থেকে যাচ্ছে। বাদশাহ্ তদন্ত করবেন ওর

মৃত্যুর... ভয়ানক তদন্ত! আসল ঘটনা যদি কোনোভাবে ফাঁস হয়, আমাদের দু'জনকেই ফাঁসিতে ঝোলাবেন তিনি।'

'ঠিকমত ছক সাজাতে পারলে কিছুই ফাঁস হবে না।'

'হবে না?' তিক্ত হাসি হাসল ফানযিলাহ্। 'বোকা ছেলে, সন্দেহের তালিকায় সবার আগে তোমার নামটাই আসবে। তারপর আসবে আমার নাম। সবাই জানে, আমরা শাকেরকে পছন্দ করি না; ওকে তোমার সিংহাসন পাবার পথে বাধা বলে মনে করি।'

'শাকেরের বদলে যদি আব্বাকে সরিয়ে দিই?' কুটিল গলায় বলল মারযাক। 'বয়স হয়েছে ওঁর। চেষ্টা করলে মৃত্যুটা হয়তো স্বাভাবিক দেখাতে পারব।'

'তাতেও লাভ নেই,' বলল ফানযিলাহ্। 'ওঁর ছেলে হিসেবে তুমিই যে সিংহাসন পাবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। জনগণের চোখে মোটেই জনপ্রিয় নও তুমি, বরং শাকেরকে ওরা পুজো করে। আমার তো মনে হয়, ওকে বাদশাহ্ বানাবার জন্য উঠেপড়ে লাগবে সবাই।'

'জ্যান্ত কবর হোক শয়তানটার!' হতাশায় অভিশাপ দিল মারযাক।

'শাকেরের জন্য কবর খুঁড়তে গেলে আমাদের ঘাড়ে বিপদ টেনে নিতে হবে। খোদ ইবলিশ ওকে রক্ষা করছে।'

'জাহান্নামে যাক ও!'

'গালাগাল দিয়ে কোনও উপকার হবে না আমাদের,' ছেলেকে বোঝাল ফানযিলাহ্। 'তারচেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করো। অন্য কোনও কায়দায় সারতে হবে কাজ।'

ঠোঁট কামড়াল মারযাক। তারপর বলল, 'একটা কাজ করা যায়—ওর সঙ্গে সাগরে যাচ্ছি আমি, তক্কে তক্কে থাকব। রাতের

অন্ধকারে যদি ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দিতে পারি...'

'না, না... ধরা পড়ার ভয় আছে ওতে। দাঁড়াও, আমাকেই ভাবতে দাও ব্যাপারটা নিয়ে।' হাততালি দিয়ে আইয়ুবকে ডেকে পাঠাল ফানযিলাহ্। ছেলেকে বলল, 'চলো, দাস-বাজারে যাই। শাকেরের দুই বন্দিকে দেখব। কেন যেন মন খুঁতখুঁত করছে। বলা যায় না, ওদের মাধ্যমেই হয়তো ফাঁদে ফেলা যাবে শয়তানটাকে। তাতে নিজেরাও নিরাপদে থাকব।'

'ঠিক আছে,' সায় দিল মারযাক। 'চলো।'

নয়

প্রতিদ্বন্দ্বী

দাস-বাজারের ফটকের সামনের খোলা জায়গায় বিশাল এক ভিড়—সরু, কাঁচা রাস্তা ধরে আসা জনস্রোত মিশে প্রতি মুহূর্তে আরও বড় হচ্ছে ওটা। ঠেলাঠেলি চলছে লোকজনের ভিতর, চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়।

নানা ধরনের মানুষের আর্বিভাব ঘটেছে আজ—বাদামি চামড়ার বারবার, কৃষ্ণবর্ণ সাহারোয়ি, ফর্সা আরব, আন্দালুসিয়ার তাগারিন, উদ্বাস্তু ইহুদি, লেভাণ্টিন তুর্কি, ধনী মূর... সব ধরনের মানুষ জড়ো হয়েছে ওখানে। স্মরণকালের সবচেয়ে বড় নিলাম হতে চলেছে, সেটা প্রত্যক্ষ করবার জন্য এই বিশাল সমাবেশ।

ফেরিঅলাদের তো পোয়াবারো, ফল আর খাবারের ঝুড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভিড়ের ভিতর, আয়-রোজগার বেড়ে গেছে তাদের। পুরো এলাকার ভিখিরি-রাও চলে এসেছে এখানে, লাইন ধরে বসেছে রাস্তার পাশে, ধনী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দান-খয়রাত পাবার ইচ্ছে। গলা চড়িয়ে গান গাইছে তারা।

যারা সত্যিকার ক্রেতা, তারা অবশ্য যোগ দিচ্ছে না ভিড়ে। ফটকের বাইরে ঘোড়া থেকে নামছে, পরিচয় নিশ্চিত করে ঢুকে যাচ্ছে বাজারে। আজ কোনও আলতু-ফালতু লোকের প্রবেশাধিকার নেই ওখানে। লুকিয়েও ঢোকা সম্ভব নয়। পুরো বাজার উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। মাঝখানে এক চিলতে খোলা জায়গা, সেখানেই অনুষ্ঠিত হয় নিলাম। আজকের কার্যক্রম শুরু হতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি। তাই ক্রেতারা অলস ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাজারের চারদিকে, ওখানে ছোট ছোট দোকান খোলা হয়েছে—বিক্রি করা হচ্ছে উল, মশলা আর নানা ধরনের গহনা।

খোলা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে মুখ ব্যাদান করে রেখেছে একটা কুয়ো—অষ্টভুজ আকৃতির. সীমানা প্রাচীর রয়েছে কিনারে, তিনধাপের সিঁড়ি উঠে গেছে প্রাচীরের মাথায়। সিঁড়িতে বসে আছে দাড়িঅলা এক বয়স্ক ইহুদি, পরনে কালো রঙের ঢোলা জোব্বা, রঙিন রুমালে ঢেকে রেখেছে মাথা। কোলের উপর রেখেছে একটা চওড়া বাক্স—তাতে অনেকগুলো খোপ... প্রতিটাই দামি রত্ন আর দুর্লভ পাথরে ভরা। বিক্রি করবার জন্য বসেছে। তাকে ঘিরে রেখেছে অল্পবয়সী কয়েকজন মূর আর দু'জন তুর্কি অফিসার। দর কষাকষি চলছে রত্ন-বিক্রেতার সঙ্গে।

বাজারের উত্তরপাশের দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে বড় একটা খাঁচা—সামনের দিকটা ঢেকে রাখা হয়েছে উটের পশম দিয়ে

তৈরি পর্দায়। পর্দার ওপাশ থেকে ভেসে আসছে মানুষের গুঞ্জন। ওটা আসলে বন্দিশালা—বিক্রির জন্য নিয়ে আসা দাসদেরকে রাখা হয়েছে ওর ভিতর। বন্দিশালাকে পাহারা দিচ্ছে জনাবারো কর্সেয়ার, তাদের সঙ্গে রয়েছে কিছু কাফ্রি ভৃত্য।

বাজারের দেয়ালের বাইরে মাথা তুলে রেখেছে জোইয়া মসজিদের বিশাল গম্বুজ আর সুউচ্চ দুই মিনার। বাজারের ভিতর থেকেও চোখে পড়ে ওগুলো। আরও চোখে পড়ে বেশ কিছু খেজুর গাছের ডগা, বাতাসের অভাবে আজ স্থির হয়ে আছে ওগুলোর পাতা।

হঠাৎ বাজারের ফটকে উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। রাস্তা ধরে ছ'জন বিশালদেহী কাফ্রি ভৃত্য উদয় হলো। চেঁচিয়ে সবাইকে সরে যেতে বলছে। হাতে বড় বড় লাঠি আছে তাদের, হুঁশিয়ারির পাশাপাশি ভিড়ের উপর নির্মমভাবে আঘাত করল ওগুলো দিয়ে, লোকজনকে বাধ্য করল পথ করে দিতে।

'সরে যাও! পথ দাও আমাদের বাদশাহ্... মহান আসাদ-আদ-দীনের জন্য! সরে যাও সবাই!'

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ভিড়ের মাঝে। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল সবাই সম্মান দেখাবার জন্য। একটু পরেই দুধ-সাদা একটা ঘোড়ায় চড়ে হাজির হলেন আসাদ-আদ-দীন। উজির সামানি রয়েছে তাঁর সঙ্গে, আর রয়েছে কালো পোশাকে ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর দল।

একটু সময়ের জন্য নীরব রইল জনতা, তারপরেই শুরু হলো জয়ধ্বনি।

'আল্লাহ্ আপনার শক্তি বৃদ্ধি করুন! আল্লাহ্ আপনার আয়ু বাড়িয়ে দিন! রাসূলের অনুগ্রহ আসুক আপনার প্রতি! আল্লাহ্ আরও বিজয় দিন আপনাকে!'

জয়ধ্বনি আর শুভকামনার জবাবে মৃদু হাসলেন বাদশাহ্। হাত নাড়লেন সমবেত জনতার উদ্দেশে।

একটু পরেই ফটকে পৌঁছুল শোভাযাত্রা। স্বর্ণমুদ্রা ভরা একটা থলে সামানির দিকে ছুঁড়ে দিলেন আসাদ—ভিখিরিদের মাঝে বিতরণ করবার জন্য। তারপর অনুসরণ করলেন বাজারের নিয়ম। ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে ঢুকলেন তিনি ভিতরে। থামলেন কুয়োর পাশে পৌঁছে। বন্দিশালার দিকে ফিরে আশীর্বাদ করলেন উপস্থিত সবাইকে। অনুমতি দিলেন উঠে দাঁড়াবার।

বন্দিশালার দায়িত্বে আছে শাকের-আল-বাহারের অনুচর আলি, তাকে ডেকে পাঠালেন বাদশাহ্। জানালেন, নিলাম শুরু হবার আগে দাসদেরকে দেখতে চান। সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলা হলো পর্দা, সূর্যের আলো পড়ল গাদাগাদি করে থাকা বন্দিদের গায়ে। ডাচম্যানের সমস্ত নাবিক আছে ওখানে, আরও আছে বিস্কেনের অভিযানে পাওয়া অল্প কিছু বন্দি।

কাছে গিয়ে ভিতরে নজর বোলালেন আসাদ-আদ-দীন। পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কম। তবে সব ধরনের বয়স আর জাতের বন্দি আছে ওখানে। ফর্সা ফ্রেঞ্চ, জলপাই রঙা ইটালিয়ান, শ্যামলা স্প্যানিয়ার্ড, কৃষ্ণাঙ্গ কাফ্রি, সংকর... হরেক রকমের বৈচিত্র্য। বৃদ্ধ আছে, যুবা আছে... আছে নিতান্ত শিশুও। কারও পরনে ভাল পোশাক, কারও আবার ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত। প্রায়-উলঙ্গের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। বন্দিদশা ছাড়া আর কোনও মিল নেই তাদের মধ্যে। অসহায় এসব মানুষকে দেখে মোটেই করুণা অনুভব করলেন না আসাদ—তাঁর চোখে এরা অবিশ্বাসী... ইসলামের শত্রু। এদেরকে দয়া দেখালে নিজেরা ধ্বংস হয়ে যাবেন।

কালোকেশী এক স্প্যানিশ সুন্দরীর উপর চোখ আটকে গেল বাদশাহ্-র। দু'হাঁটু একত্র করে মুখের সামনে এনে বসেছে সে, করুণ ভঙ্গি, কিন্তু দু'চোখের তারায় জ্বলজ্বল করছে ক্ষোভের চিহ্ন। সামানির কাঁধে ভর দিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য মেয়েটাকে জরিপ করলেন তিনি, এরপর চোখ ফেরালেন অন্যদিকে। পরমুহূর্তে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেল তাঁর। নিজের অজান্তে চাপ দিলেন উজিরের বাহুতে।

খাঁচার একপাশে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে এক অপরূপা... নারীজাতির শ্রেষ্ঠতম রূপ আর জৌলুস নিয়ে। লম্বা, একহারা দেহ—দাঁড়াবার ভঙ্গিতে আভিজাত্য। দুধ-আলতা মোলায়েম ত্বক; চোখ তো নয়, যেন দু'টুকরো নীলকান্তমণি। মাথা থেকে নেমে এসেছে রেশমের মত সোনালি কেশ, সূর্যের আলোয় চকচক করছে। পরনে একটা সাদা গাউন, গলার কাছটা বড় বলে দেখা যাচ্ছে সুডৌল গ্রীবা।

আলির দিকে তাকালেন বাদশাহ্। 'গোবরের মাঝে এই পদ্মফুলটা কোত্থেকে এল?'

'এই মেয়েকেই ইংল্যাণ্ড থেকে শাকের-আল-বাহার নিয়ে এসেছে, মালিক,' বলল আলি।

আবার চোখ ঘোরালেন আসাদ, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটার দিকে। ব্যাপারটা লক্ষ করে রক্ত জমল সুন্দর গালদুটোয়, তাতে রূপ যেন বেড়ে গেল কয়েক গুণ।

'নিয়ে এসো ওকে,' হুকুম দিলেন বাদশাহ্।

খাঁচায় ঢুকে দু'জন কাফ্রি ভৃত্য এগিয়ে গেল মেয়েটার দিকে। ধরল তাকে দু'পাশ থেকে। বাধা দিয়ে দুর্ব্যবহারের শিকার হতে চাইল না মেয়েটি, তাই নিজের মর্যাদা রেখে পা বাড়াল তাদের সঙ্গে। সোনালিচুলো এক যুবক বসে ছিল

কাছে—শীর্ণ চেহারা, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল... মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখে গোঙানি বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে। রুগ্ন দু'হাত তুলে বাধা দিতে চাইল, কিন্তু কাফ্রিদের লাঠির আঘাতে মুখ থুবড়ে পড়ল।

আসাদ-আদ-দীন বিচক্ষণ মানুষ। ফানযিলাহ্-র কথা ফেলতে পারেননি, তাই বাজারে এসেছেন এই মেয়েটিকে দেখবার জন্য। তাঁর স্ত্রী-র ধারণা, এই মেয়ের মাঝেই নাকি লুকিয়ে আছে শাকেরের বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ। বাস্তবে তেমন কিছু চোখে পড়ল না। বরং প্রিয় কর্সেয়ারের আবদারের পিছনে যুক্তি খুঁজে পেলেন—এমন সুন্দরীকে কে না পেতে চায়! তিনি নিজেও আগ্রহী হয়ে উঠছেন মেয়েটির ব্যাপারে।

নিজের অজান্তেই বাদশাহ্ হাত বাড়ালেন তাকে ছুঁয়ে দেখার জন্য। কিন্তু ঝট্ করে পিছিয়ে গেল মেয়েটি, যেন তাঁর স্পর্শে গা পুড়ে যাবে ওর।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আসাদ। 'আল্লাহ্‌র মর্জি বোঝা ভার। এমন সুন্দর ফল তিনি বিধর্মীদের নোংরা গাছে ফলিয়েছেন!'

তীক্ষ্ণ চোখে বাদশাহ্-র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে সামানি। দীর্ঘদিন সেবা করায় মনিবের মতিগতি বুঝতে পারে সে। তাই তোয়াজের ভঙ্গিতে বলল, 'রাসূলের অনুসারীদের এ-ফল পেড়ে নিতে নিষেধ নেই, মালিক।'

'বিধর্মীর মেয়ে বিধর্মীই হয়, সামানি। তার দিকে হাত বাড়ানো বারণ।'

'ধর্ম তো বদলানো যায়! ও যদি ঈমান গ্রহণ করে, তা হলে কোনও সমস্যা থাকে না। হুজুর, দ্বীনের আলো আগেও জ্বেলেছেন আপনি নারীর বুকে।'

ভুরু কোঁচকালেন আসাদ। 'ফানযিলাহ্-র কথা বলছ? হ্যাঁ,

আল্লাহ্ আমাকে ওর দিশা বানিয়েছিলেন।'

'হয়তো আবারও আপনাকে সেই দিশা বানাতে চাইছেন আল্লাহ্,' বলল সামানি। শুধু তোয়াজ নয়, তার মনের ভিতর আরেকটা দুরভিসন্ধি খেলা করছে। ফানযিলাহ্ আর তার মধ্যে বহুদিন থেকেই শত্রুতা বিরাজ করছে। ধুরন্ধর ওই বেগমের জন্য উজির হিসেবে যথাযোগ্য সম্মান পাচ্ছে না সে, ব্যবহার করতে পারছে না ক্ষমতা। যদি কোনোভাবে নতুন এক বেগম আনা যায় মহলে, সরানো যায় ফানযিলাহ্-কে... তা হলে হয়তো বদলে যাবে পরিস্থিতি। কিন্তু এতদিন তেমন কোনও সুযোগ দেখেনি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীদের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন বাদশাহ্, কাউকে বিয়ে করা তো অনেক পরের কথা। আজ... এতদিন পর এক মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। তাঁর এই মুগ্ধতাকে উস্কানি দিয়ে কামনায় পরিণত করা গেলে বড় ভাল হয়। বহুদিনের খায়েশের পালে হাওয়া লাগবে তা হলে... ফানযিলাহ্-কে রাস্তা থেকে সরাবার একটা উপায় সৃষ্টি হবে।

'আপনার পছন্দের তারিফ করতে হয়, মালিক,' গদগদ ভাষায় বলল উজির। 'পাহাড়ি তুষারের মত ফর্সা এই মেয়ে, তাফিলাতের খেজুরের মত মিষ্টি চেহারা...'

ঝট্ করে তার দিকে ঘাড় ফেরালেন বাদশাহ্। রুষ্ট গলায় বললেন, 'কিন্তু এ-চেহারা হাজারো বেগানা পুরুষ দেখেছে!'

'ওসব তো অতীত, মালিক!' সামানি বলল। 'আপনি চাইলে ভবিষ্যতে আর কেউ দেখবে না।'

ঠিক তখুনি পিছন থেকে ভেসে এল সুরেলা কণ্ঠ। 'এ আবার কে?'

বিস্ময় নিয়ে উল্টো ঘুরলেন আসাদ এবং তাঁর উজির। দেখলেন, একটা পালকি এসে থেমেছে তাঁদের পিছনে। সেখান

থেকে নেমে এসেছে ফানযিলাহ্। মুখ ঘোমটায় ঢাকা, সঙ্গে রয়েছে মারযাক আর পালকি-বাহী একদল খোজা। খোজাদলের নেতৃত্ব দিচ্ছে আইয়ুব-আল-সামিন।

চেহারা বিকৃত হলো বাদশাহ্-র। স্ত্রী-পুত্রের উপর থেকে এখনও রাগ মেটেনি তাঁর। তা ছাড়া... প্রাসাদের চার দেয়ালের ভিতরে অসৌজন্য দেখালে সেটা মেনে নেয়া যায়, কেউ তার খবর জানছে না; কিন্তু খোলা বাজারে এসে এমন তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাষায় প্রশ্ন তোলা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। তাঁর জানা নেই, মরিয়া হয়ে এ-কাজ করছে ফানযিলাহ্। উদ্বেগের সামনে হার মেনেছে সতর্কতা। ভিনদেশি মেয়েটির দিকে স্বামীর আগ্রহ লক্ষ করে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে সে, ঈর্ষার চেয়েও বেশি পাচ্ছে ভয়। বাদশাহ্-র উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেছে বেগম। নতুন কোনও বধূ যদি আসে প্রাসাদে, তা হলে সব আশা শেষ।

উপায়ান্তর না দেখে স্বামীর মুখোমুখি হয়েছে ফানযিলাহ্। মুখ ঢাকা থাকলেও তার আচার-আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে ঔদ্ধত্য। বাদশাহ্-র হিংস্র দৃষ্টিকে আমলে নিল না।

'এই মেয়েকেই যদি এনে থাকে শাকের-আল-বাহার, তা হলে বলব গুজবের কোনও সত্যতা নেই,' বলল সে। 'খামোকাই দুইশ' মুসলমানের জীবন বিপন্ন করেছে ও ইংল্যাণ্ড থেকে এই হলদেমুখী, কুচ্ছিত জানোয়ারটাকে আলজিয়ার্সে আনতে গিয়ে।'

খেপে গেলেন আসাদ-আদ-দীন। 'হলদেমুখী? কুচ্ছিত?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'তোমার শ্রবণশক্তি কমে গেছে বলে ভেবেছি এতদিন, আজ দেখছি চোখেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। সন্দেহ নেই, বুড়ো হয়ে যাচ্ছ তুমি।'

একটু যেন ঘাবড়ে গেল ফানযিলাহ বাদশাহ্-র কথা শুনে।

তার দিকে এগিয়ে গেলেন আসাদ। বললেন, 'যথেষ্ট সহ্য

করেছি তোমার শয়তানি আচরণ। বিশ্বাসীদের সমাজের কলঙ্ক হয়ে উঠছ তুমি। এর একটা বিহিত খুব শীঘ্রি করব আমি।' আলির দিকে ফিরে বন্দিনীকে খাঁচায় নিয়ে যাবার ইশারা করলেন তিনি. তারপর আবার ঘুরলেন স্ত্রী-র দিকে। 'যাও, পালকিতে ওঠো। ফিরে যাও প্রাসাদে। আর কখনও যেন তোমাকে এমন খোলা জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে না দেখি আমি!'

নীরবে আদেশটা মেনে নিল ফানযিলাহ্, ফিরে গেল পালকিতে। রুদ্র চোখে তাকে চলে যেতে দেখলেন বাদশাহ্, তারপরেও স্থির হয়ে রইলেন মূর্তির মত।

সামানি বলল, 'হুজুর, শান্ত হোন। উনি আপনার বেগম... এবারের মত নাহয় মাফ করে দিন।'

মুখ বাঁকালেন আসাদ। 'বয়স বাড়ার সঙ্গে সৌন্দর্য কমছে ওর, সামানি। সেই সঙ্গে কমছে সভ্যতা-ভব্যতা। নিচুমনের একটা ডাইনিতে পরিণত হচ্ছে, রাজপ্রাসাদে যাকে মানায় না। আল্লাহ্ সম্ভবত ওকে স্থানচ্যুত করার সঙ্কেত দিচ্ছেন আমাকে। তাই আজ যোগ্য আরেক নারীর দর্শন করিয়েছেন।'

খুশিতে নেচে উঠল উজিরের মন। তবু বোকা বোকা চেহারা করে বলল, 'কার কথা বলছেন, মালিক?'

প্রশ্নটা যেন শুনতেই পেলেন না আসাদ। ধীরে ধীরে ঘুরলেন বন্দিশালার দিকে। পর্দা আবার টেনে দেয়া হয়েছে, মেয়েটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। স্বপ্নাতুর গলায় বললেন, 'ওর হাঁটা-টা লক্ষ করেছ? চপলা হরিণীর মত, কিন্তু তাতে মিশে আছে রাজকীয় আভিজাত্য। আমার মনে হয় না আল্লাহ্ ওকে দোজখে নিক্ষেপ করবার জন্য তৈরি করেছেন!'

'আমি একমত, হুজুর। সত্যিকার কোনও ঈমানদারের সেবা করবার জন্য জন্ম হয়েছে ওর।'

'তা তো বটেই। সেবা-ই করবে ও—আমার! আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, সামানি। এখানেই থাকো তুমি। নিলাম শুরু হলে কিনে নিয়ো মেয়েটাকে। ইসলাম ধর্মে ওকে দীক্ষা দেব আমি, বাঁচাব দোজখের আগুন থেকে।'

হাসি ফুটল উজিরের ঠোঁটে। 'দাম কত দেব, মালিক?'

'দাম? আবার দামের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? এক হাজার দিনার উঠলেও কিছু যায়-আসে না, ওকে নিয়ে আসবে তুমি আমার কাছে।'

'এক হাজার!' চমকে উঠল সামানি। 'ইয়া আল্লাহ্!'

তাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলেন না আসাদ-আদ-দীন। চলে গেলেন ফটকের দিকে। প্রাসাদে ফিরবেন। বাইরে থেকে আবার ভেসে এল জয়ধ্বনি।

একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল সামানি। ভিনদেশি মেয়েটিকে কেনার দায়িত্ব পেয়ে খুশি হয়েছে, কিন্তু সমস্যা হলো—পকেট একদম ফাঁকা। দাস-বাজারের নিয়ম হলো, নগদ দাম না দিয়ে কোনও দাস কেনা যাবে না। এক হাজার দিনারের কথা বলেছেন বাদশাহ্, সে-পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে তার কাছে। তাই মনিব চলে যেতেই বাজার থেকে বেরিয়ে পড়ল সে—দিনার আনার জন্য। হাতে এখনও বেশ খানিকটা সময় আছে, ফিরে আসতে পারবে নিলামের আগে।

রাস্তা ধরে কিছুদূর যেতেই খোজা আইয়ুবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল উজিরের। নিলামের উপর নজর রাখার জন্য মাঝপথ থেকে তাকে ফেরত পাঠিয়েছে ফানযিলাহ্। বলে রাখা ভাল, মালকিনের মত সে-ও উজিরকে পছন্দ করে না। দেখা হতেই সালাম ঠুকল বটে, কিন্তু সেটা দায়সারা ভঙ্গিতে।

'আসসালামু আলাইকুম, সামানি,' বলল আইয়ুব। 'এমন

হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চললেন? জরুরি কোনও সংবাদ আছে?'

'সংবাদ? কীসের সংবাদ?' বিরক্ত গলায় বলল উজির। 'অন্তত তোমার মালকিনকে খুশি করবার মত কোনও সংবাদ নেই আমার কাছে।'

'আবার কী ঘটল? খ্রিস্টান ওই মেয়েটার ব্যাপারে কিছু নয় তো?'

জবাব দিল না, তার বদলে ধূর্ত হাসি দেখা দিল সামানির চেহারায়। নীরব ক্রোধ অনুভব করল আইয়ুব। ফানযিলাহ্-র অধীনে কাজ করে সে, বেগমের ক্ষমতা খর্ব হলে সে-ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, ঠিক ঠিক বলুন। কিছু লুকাবেন না আমার কাছে... বেগমসাহেবা খুবই নাখোশ হবেন!'

'হাহ্! বেগম না কচু!' বলল সামানি। 'তোমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, বুঝলে?'

'কী বললে, কুকুর!' রাগ আর চাপতে পারল না আইয়ুব। 'বেগমসাহেবা-কে অপমান করলে?'

'আমাকে কুকুর বললে?' এবার সামানিও খেপল। 'যাও, তা হলে তোমার মালকিনকে গিয়ে জানাও—খ্রিস্টান মেয়েটাকে কিনবার নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে বাদশাহ্। ওকে বিয়ে করবেন, ফানযিলাহ্কে লাথি মেরে তাড়াবেন প্রাসাদ থেকে। এ-ও বোলো, মেয়েটার জন্য এক হাজার দিনার পর্যন্ত খরচ করবার অনুমতি পেয়েছি আমি। আজ ও প্রাসাদে যাচ্ছেই... কারও সাধ্য নেই তা ঠেকায়। ফানযিলাহ্কে বলে দিয়ো—বাক্সপ্যাঁটরা যেন গুছিয়ে রাখে। নইলে শেষে এক কাপড়ে বেরুতে হবে প্রাসাদ থেকে।'

স্থবির হয়ে গেল আইয়ুব। তাকে ও-অবস্থায় রেখে হাসতে হাসতে চলে গেল সামানি।

'ঝাড়-বংশে নিপাত হোক তোমার,' ধাতস্থ হয়ে তাকে গালি দিল আইয়ুব। তারপর ছুটল প্রাসাদের দিকে।

খবরটা শুনে যেন বাজ পড়ল ফানযিলাহ্‌র মাথায়। চমক যখন সামলাল, তখন জ্বলে উঠল ক্রোধের আগুন। উঁচু গলায় অভিশাপ দিতে লাগল বাদশাহ্‌ আসাদ আর দাস-বাজারের ওই মেয়েটাকে।

একটু পর শান্ত হলো সে। বিশ্বস্ত খোজাকে বলল, 'এখুনি একটা কিছু করতে হবে, আইয়ুব, নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার... সেইসঙ্গে মারযাকেরও। আমি না থাকলে বাপের সামনে মাথাই তুলতে পারবে না ও। শাকের ওকে নিজের চাকর বানিয়ে ছাড়বে।' একটু ভাবল সে: 'যেভাবেই হোক, ঠেকাতে হবে সামানিকে। ও যেন কিছুতেই ওই সাদা ডাইনিটাকে কিনতে না পারে। নইলে আমাদের সঙ্গে তুমিও শেষ হয়ে যাবে, আইয়ুব।'

'বুঝতে পারছি, মালকিন,' মাথা ঝাঁকাল খোজা। 'কিন্তু ঠেকাব কীভাবে সামানিকে?'

'মেয়েটাকে ওর নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে হবে।'

'কীভাবে সেটা সম্ভব?'

'মাথায় কি গোবর নাকি তোমার? সহজ কথাও বুঝতে পারছ না? নিলামে অংশ নেবে তুমি, মেয়েটার দাম তুলে দেবে আকাশে... সামানির সাধ্যের বাইরে। যত টাকা লাগে আমি দেব! কিন্তু মেয়েটাকে হাতে পাওয়া চাই। তারপর ওকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেব আমরা। বাদশাহ্‌ যাতে আর কোনোদিন খোঁজ না পান ওর।'

'ইয়ে...' ইতস্তত করল আইয়ুব, 'আমাকে এ-কাজ থেকে

মাফ করা যায় না, মালকিন? বাদশাহ্-র বিপক্ষে যেতে বলছেন আপনি, সেটা খুবই বিপজ্জনক। মেয়েটা গায়েব হয়ে গেলে কী ঘটিয়ে বসেন, তার কিছুই বলা যায় না।'

'খামোকা ভয় পাচ্ছ। আমাদের বাদশাহ্ তো আর অল্পবয়সী যুবক না যে, একটা মেয়ের জন্য পাগল হয়ে যাবে। যুক্তিবাদী মানুষ তিনি, বাস্তবতাকে মেনে নেবেন... আগেও নিয়েছেন। আমি ওঁকে খুব ভাল করেই চিনি। আমি নিশ্চিত মেয়েটার আশা ছেড়ে দেবেন উনি, ওকে ভুলে যাবেন।'

ফানযিলাহ্-র আশ্বাসে স্বস্তি পেল না আইয়ুব। 'আমাকে রেহাই দিন, মালকিন। এসবে জড়াতে চাই না আমি।'

'জড়ানো মানে? কী এমন করতে বলেছি তোমাকে? আমার হুকুম তামিল করতে যাচ্ছ তুমি—তার বেশি কিছু তো আর নয়। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে এ-কথাই বলবে তুমি।'

'তবু...'

'চুপ!' চাবুকের মত সপাং করে উঠল ফানযিলাহ্-র গলা। 'আর কোনও অজুহাত শুনতে চাই না। যেতেই হবে তোমাকে। এদিকে এসো। দেড় হাজার দিনার আছে আমার কাছে, ওগুলো নিয়ে যাও। আশা করি ওতেই কাজ হবে।'

অগত্যা কাঁধ ঝাঁকাল আইয়ুব। এক অর্থে ভুল বলেনি তার মালকিন—স্রেফ হুকুম তামিল করতে যাচ্ছে ও। কেউ এ-জন্য দোষারোপ করতে পারবে না ওকে। তা ছাড়া কাজটা থেকে আনন্দও পাবে—দেখতে পাবে সামানির পরাজিত চেহারা, তাকে খালি হাতে ফেরাতে পারবে অসন্তুষ্ট বাদশাহ্-র কাছে... একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না এ-প্রলোভন।

ফানযিলাহ্-র কাছ থেকে দিনারের থলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও।

দশ

দাস-বাজার

দাস-বাজারে নিলাম শুরু হতে চলেছে—শিঙা আর ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা দেয়া হলো তার। ঝটপট বন্ধ হয়ে গেল সব দোকান, রত্ন-বিক্রেতাও তার বাক্স বন্ধ করে সরে গেল কুয়োর কাছ থেকে—ওখান থেকেই পরিচালিত হবে নিলাম। অল্পক্ষণেই ভিড় জমে গেল খোলা জায়গার চারপাশে।

কাফ্রি ভৃত্যরা এসে পানি ছড়াল খোলা জায়গায়, যাতে ধুলো না ওড়ে। শিঙার আওয়াজ থামল একটু পর। ফটক খুলে গেল। সাদা পোশাক আর পাগড়ি পরা তিনজন নিলাম-পরিচালক ভিতরে ঢুকল ওখান দিয়ে। কুয়োর গোড়ায় এসে থামল তারা। ওদের নেতা সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপে গিয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ ফিসফাস আর গুঞ্জন চলছিল সমবেত ক্রেতাদের মাঝে। নিলামের পরিচালকদেরকে দেখে চুপ হয়ে গেল তারা।

এবার মুখ খুলল প্রধান পরিচালক। উদাত্ত গলায় বলল, 'শুরু করছি পরম করুণাময় আল্লাহতা'লার নামে, মাটি থেকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আমাদের। সমস্ত প্রশংসা তাঁর। অসীম শক্তিমান তিনি... স্বর্গমর্ত্যের মালিক। তাঁর ইচ্ছেয় বাঁচি আমরা, তাঁর ইচ্ছেয় মরি। আসমান-জমিনের সবকিছুই চলে তাঁর

হুকুমে। মহাজ্ঞানী তিনি—সব দেখেন ও জানেন।'

'আমিন!' সমস্বরে বলে উঠল জনতা।

'দয়ালু তিনি, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন আমাদের কাছে—দ্বীনের শিক্ষা দেবার জন্য, এবং শয়তানের অনুসারীদের ধ্বংস করে দিতে।'

'আমিন!'

'এই বাজারের উপর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। আশীর্বাদ বর্ষিত হোক এখানকার ক্রেতা-বিক্রেতাদের উপর, ওদের আয়ু এবং ধনসম্পদ... দুটোই যেন দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়!'

'আমিন!' তৃতীয়বারের মত বলল জনতা।

উপরদিকে তাকিয়ে আল্লাহ্-র শুকরিয়া আদায় করল পরিচালক। তারপর বন্দিশালার দিকে ফিরে হাতের ইশারা করল। ভৃত্যরা সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে ফেলল। আগ্রহী ক্রেতা-রা প্রথমবারের মত দেখতে পেল বিক্রি হতে আসা শ'তিনেক বন্দিকে—তিনভাগে বিভক্ত বন্দিশালায় অপেক্ষা করছে তারা।

মাঝখানের অংশটায়... যেখানে রোজামুণ্ড আর লায়োনেল রয়েছে... ওটার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে দুই কাফ্রি যুবক। পেশিবহুল শরীর ওদের, নির্বিকার, বন্দিদশা নিয়ে কোনও বিকার নেই। পাহারারত কর্সেয়ারদেরকে ইশারা করল পরিচালক ওই দু'জনকে বের করে আনার জন্য। কুয়োর গোড়ায় নিয়ে যাওয়া হলো ওদের।

'আজকের প্রথম আকর্ষণ হলো এক জোড়া কাফ্রি পালোয়ান,' ঘোষণা করার সুরে বলল পরিচালক। 'ভাইসব, ভাল করে দেখুন ওদেরকে—কী শরীর... কী শক্তি! ভারী কাজ করাবার জন্য এরচেয়ে ভাল শ্রমিক আর হয় না। কেউ যদি আগ্রহী হন, তা হলে

দাম বলতে শুরু করুন।'

দুই বন্দিকে ক্রেতাদের সামনে দিয়ে ঘোরাতে শুরু করল তার সহকারীরা।

ফটকের কাছাকাছি, ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়েছে আলি। ওসমানি তাকে নির্দেশ দিয়েছে শাকেরের জাহাজের জন্য ভাল কিছু দাস নিয়ে যেতে। পালোয়ান-দু'জনকে পছন্দ হলো তার। তাই সবার আগে গলা চড়িয়ে বলল, 'শাকের-আল-বাহারের জাহাজে দাঁড় টানার জন্য এমন লোকই দরকার আমার।'

'ঠিক বলেছেন, আলি,' হাসিমুখে বলল পরিচালক। 'সাগরের বাজপাখি, ইসলামের বর্শার জাহাজে এমন তাগড়া জোয়ান-ই মানায়। বলুন, কত দাম দেবেন?'

'দুইশো দিনার।'

বাকি ক্রেতাদের দিকে ফিরল পরিচালক। 'দুইশো দিনারের ডাক পেয়েছি আমি। কেউ কি পঞ্চাশ বাড়াবেন?'

ভিড়ের মাঝ থেকে দামি পোশাক পরা এক মূর ব্যবসায়ী হাত নাড়ল। তার সামনে নিয়ে যাওয়া হলো দুই পালোয়ানকে। ওদেরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল লোকটা—হাত-পা টিপল, হাঁ করিয়ে পরীক্ষা করল জিভ-দাঁতও। সন্তুষ্ট হয়ে নতুন দাম হাঁকল সে।

'দুইশো বিশ দিনার!'

দুই বন্দিকে এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো আলির সামনে। পরিচালক বলল, 'দুইশো বিশ দিনার দাম উঠেছে, হে আলি! কসম খোদার, আসলে তিনশো হওয়া উচিত। ডাকবেন নাকি?'

'দুইশো ত্রিশ।' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল আলি।

মূর ব্যবসায়ীর দিকে ফিরল পরিচালক। 'দুইশো ত্রিশ দিনার

ডেকেছেন আলি। আপনি নিশ্চয়ই বিশ দিনার বাড়াবেন, হামিদ?'

'মাথা খারাপ?' বলল ব্যবসায়ী হামিদ। 'ও-ই কিনুক।'

হাল ছাড়তে রাজি নয় পরিচালক। 'অন্তত দশ বাড়ান।'

'এক আধলাও বাড়াতে পারব না।'

'তা হলে ওদেরকে আপনিই পেলেন, আলি,' ঘোষণা করল পরিচালক। 'দুইশো ত্রিশ দিনারের বিনিময়ে। আল্লাহকে ধন্যবাদ জানান এত সস্তায় পেয়েছেন বলে।'

দুই বন্দিকে আলি-র সহচরদের হাতে সোপর্দ করা হলো। পরিচালকের এক সহকারী এগিয়ে এল টাকা নেবার জন্য।

'এত অস্থির হবার কী আছে?' বিরক্ত হয়ে বলল আলি। 'যথাসময়ে টাকা পাবে। শাকের-আল-বাহারের নামের উপরে কি আস্থা নেই তোমাদের?'

'মাফ করবেন, জনাব,' বলল পরিচালক, 'কিন্তু এখানকার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম হলো, দাম পরিশোধ না করে দাস নিতে পারবে না কেউ।'

'নিয়ম ভাঙব না আমি। অপেক্ষা করতে চাইছি আরও দাস কিনব বলে। সবগুলোর দাম একসঙ্গে মেটালে কোনও সমস্যা আছে?'

'না, না, সমস্যা কীসের?' তাড়াতাড়ি বলল পরিচালক। বড় খদ্দেরকে চটাতে চাইছে না। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। 'আরও কিনবেন?'

'হ্যাঁ। ওই যে... ওটাকে।' হাত তুলে রোজামুণ্ডের পাশে বসে থাকা লায়োনেলকে দেখাল আলি। 'ওকে কিনে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন শাকের।'

বিস্ময় ফুটল নিলাম-পরিচালকের চেহারায়। ওই হাড়

জিরজিরে লোকটা কী কাজে লাগবে শাকেরের? কিন্তু তাই বলে বিক্রির সুযোগ হাতছাড়া করল না।

'নিয়ে এসো ওই হলুদ চামড়ার বিধর্মীটাকে!' হুকুম দিল সে।

লায়োনেলের গায়ে হাত রাখল কর্সেয়ার প্রহরী। বাধা দিতে চাইল সে, কিন্তু ঘাড়ের উপর একটা রদ্দা খেয়ে চোখে আঁধার দেখল। ফুঁপিয়ে উঠল সশব্দে। সান্ত্বনাসূচক কিছু বলল ওকে রোজামুণ্ড। তা শুনে শান্ত হলো, বিনা প্রতিবাদে বেরিয়ে এল বন্দিশালা থেকে। দুর্বল পায়ে এসে দাঁড়াল কুয়োর গোড়ায়।

'কী ব্যাপার, আলি?' ঠাট্টার সুরে বলে উঠল ব্যবসায়ী হামিদ। 'ওকে দিয়েও দাঁড় টানাবে নাকি?' অন্যেরা হেসে উঠল সে-কথা শুনে।

'অসুবিধে কী?' নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিল আলি। 'অন্তত সস্তায় তো পাব ওকে।'

'সস্তা মানে?' অবাক হবার অভিনয় করল পরিচালক। 'এমন কচি মাল আর কোথায় পাবেন? ন্যায্য দাম কত হতে পারে... একশো দিনার?'

'একশো দিনার!' ঠোঁট বাঁকাল আলি। 'এই তালপাতার সেপাইয়ের জন্য? ভালই বলেছ! বড়জোর পাঁচ দিনার দিতে পারি আমি।'

আবার হেসে উঠল জনতা। তা শুনে যেন একটু অপমানিত হলো পরিচালক। বলল, 'আপনি রসিকতা করছেন, জনাব। ভাল করে দেখুন, হালকা-পাতলা হলেও ওর মধ্যে কোনও খুঁত নেই।'

তার ইশারা পেয়ে লায়োনেলের জামা খুলে নিল এক ভৃত্য। উন্মুক্ত করে দিল ঊর্ধ্বাঙ্গ। ব্যাপারটা আত্মসম্মানে বাধল ইংরেজ

যুবকের, বুকের উপর দু'হাত এসে শরীর ঢাকল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাবুক পড়ল পিঠে। কর্কশ ভাষায় এক প্রহরী ওকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার নির্দেশ দিল।

'হ্যাঁ, এবার বিচার করুন ওর,' বলল পরিচালক। 'দেখতে-শুনতে ভাল, রোগব্যাধি নেই। ঠিকমত খাবার পেলে স্বাস্থ্যও ঠিক হয়ে যাবে। দাঁত দেখুন... কত্তো চমৎকার!'

খপ্ করে লায়োনেলের মাথা ধরল এক ভৃত্য, ওকে বাধ্য করল হাঁ করতে।

'সবই বুঝলাম,' আলি বলল। 'কিন্তু ওর হাতদুটো তো মেয়েমানুষের মত সরু!'

'দাঁড় টানতে টানতে পুরুষের হাত হয়ে যাবে,' যুক্তি দেখাল পরিচালক।

বিশ্বাস করতে পারছে না লায়োনেল, গরু-ছাগলের মত ওর দর-কষাকষি চলছে। 'নরকে যাও তোমরা!' ক্ষোভে-দুঃখে চেঁচিয়ে উঠল ও।

অসন্তোষ দেখা দিল আলির চেহারায়। নিলাম-পরিচালককে বলল, 'মেজাজ দেখেছ বিধর্মীটার? গালি দিচ্ছে আমাদের! না, না, এমন বদমেজাজী দাস কেনা-ই উচিত না। পাঁচ দিনার বলে ফেলেছি... ওটাই শেষ।'

হতাশ হয়ে লায়োনেলকে ক্রেতাদের সামনে ঘোরাবার নির্দেশ দিল পরিচালক। কিন্তু কেউই আগ্রহ দেখাল না ওর ব্যাপারে।

'পাঁচ দিনার বড্ড কম হয়ে যায়,' বলল পরিচালক। একটু গলা চড়াল। 'কেউ কি দশ দিনারও দেবেন না এই চমৎকার দাসটার জন্য?'

সাড়া পাওয়া গেল না জনতার কাছ থেকে। দুর্বল এই

যুবককে কিনে ঠকতে চাইছে না ওরা। খাইয়ে-দাইয়ে মোটা-তাজা করা তো অনেক সময়ের ব্যাপার। এত ঝামেলা করে কে? বরং স্বাস্থ্যবান দাস কিনলে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো যাবে। ক্রেতাদের মনোভাব পরিচালকও বুঝতে পারছে। অগত্যা কাঁধ ঝাঁকাল সে। আলির দিকে ফিরল।

'আপনিই জিতলেন, আলি। ও এখন আপনার সম্পত্তি... মাত্র পাঁচ দিনারের বিনিময়ে। আল্লাহ্ দু-দু'বার লাভবান করলেন আপনাকে।'

হাসল আলি। কাফ্রি দুই পালোয়ানের মত লায়োনেলকেও তার সহচরদের হাতে তুলে দিল নিলাম-পরিচালকের লোকেরা। আরও দাস চাইতে যাচ্ছিল আলি, বাধা পেল ভিড় থেকে ইহুদি এক ব্যবসায়ী মুখ খোলায়। লম্বা, মাঝবয়েসী সে—পরনে কালো আচকান, গলায় দামি রুমাল বাঁধা। কোমরের চওড়া বেল্টে ঝুলছে একটা নকশাদার ছোরা। অধৈর্য হয়ে উঠেছে, তাই ফাঁক পেয়েই হাঁক ছেড়েছে নিলাম-পরিচালকের উদ্দেশে।

বন্দিশালার খাঁচার বামপাশের অংশে, বিস্কেন-আল-বোরাকের আনা বন্দিদের ভিতর রয়েছে এক আন্দালুসিয়ান মেয়ে। বছর বিশেক বয়স, স্প্যানিশ সৌন্দর্য আগুনের মত জ্বলছে তার সারা দেহে। উজ্জ্বল শ্যামলা গায়ের রঙ, চুল মেঘের মত কালো, বাদামি চোখ আর ভুরু যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা। সাধারণ গ্রাম্য মেয়ের পোশাক তার গায়ে, দুঃখ-দুর্দশা পোহাতে পোহাতে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা, তারপরেও রূপ কমেনি একবিন্দু। এই মেয়ের উপরেই দৃষ্টি পড়েছে ইহুদি ব্যবসায়ীর, বুকের ভিতর জ্বলে উঠেছে কামনার আগুন। তাকে হাতে পাবার জন্য তর সইছে না। নিলাম-পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মেয়েটাকে দেখাল সে।

'ওই স্প্যানিশ মেয়েটাকে কিনতে চাই আমি,' বলল ব্যবসায়ী। 'পঞ্চাশ দিনার দেব।'

পরিচালক ইশারা করল। টেনে-হিঁচড়ে মেয়েটাকে খাঁচা থেকে বের করে আনল প্রহরীরা। তাকে এক নজর দেখে নিল পরিচালক। তারপর বলল, 'এমন রূপসীকে মাত্র পঞ্চাশ দিনারে পাওয়া যায় না, আব্রাহাম! এই যে... ইউসুফ ওর জন্য ষাট দিনারের বেশি খরচ করবে।' কাছে দাঁড়ানো এক মূরের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

মাথা নাড়ল মূর। বলল, 'ঘরে তিন-তিনটা বউ আমার—ওদের ঝগড়াঝাঁটিতে জীবন অতিষ্ঠ। আরেকজনকে নিয়ে মারা পড়ব নাকি?'

হাসল শ্রোতারা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাকিদের দিকে ফিরল পরিচালক। মেয়েটাকে হাঁটাতে বলল ক্রেতাদের সামনে থেকে, তাদের আগ্রহ জাগাবার জন্য। খাঁচা থেকে অসহায় চোখে বেচারির দুর্দশা দেখল রোজামুণ্ড, ভিড়ের লোকজন লোভী দৃষ্টি দিয়ে চাটতে শুরু করেছে ওকে। একজন তো হাত-ই দিয়ে বসল ওর গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠল মেয়েটা। ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, থুতু ছিটাল লোকটার মুখে। পরমুহূর্তে চাবুকের বাড়ি পড়ল বেচারির পিঠে। চুল ধরে তাকে সরিয়ে আনল এক প্রহরী, গুঁতো দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করল। জনতা হাততালি দিয়ে উঠল দৃশ্যটা দেখে।

ঘুরিয়ে আনায় কাজ হলো। এক তুর্কি ক্রেতা হাত তুলে বলল, 'এই বুনো বেড়ালকে বশ করার আনন্দ পাবার জন্য ষাট দিনার দিতে রাজি আছি আমি।'

'সাবাস! এমন পুরুষই তো চাই!' সোল্লাসে বলে উঠল পরিচালক।

কিন্তু আব্রাহাম এত সহজে হার মানতে রাজি নয়। সত্তর দিনার ডাকল সে। তুর্কি লোকটা আশি বলল। আব্রাহাম বলল নব্বুই। এরপরে নীরবতা নামল কিছুটা সময়ের জন্য।

তুর্কি লোকটাকে প্ররোচিত করতে চাইল পরিচালক। বলল, 'কী ব্যাপার, ভাই? চুপ হয়ে গেলেন কেন? একটা ইহুদির কাছে হার মেনে নেবেন? মান-ইজ্জত কি থাকবে তাতে? এখনও সময় আছে, একশো দিনার ডাকুন।'

মুখ লাল হয়ে উঠল তুর্কির। যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ডাক দিল আবার। তবে একশো নয়, পঁচানব্বুই দিনার।

কোমর থেকে একটা থলে বের করল আব্রাহাম। বলল, 'এখানে একশো দিনার আছে। দাম বড্ড চড়া হয়ে যাচ্ছে, তবু আমি এগুলো দিতে রাজি আছি।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে সবাই তাকাল তুর্কির দিকে। কিন্তু মাথা নাড়ল সে। 'নাহ্, এর বেশি সম্ভব নয় আমার পক্ষে। ও-ই নিক মেয়েটাকে।'

'মেয়েটা তা হলে আপনার, আব্রাহাম। দাম মিটিয়ে দিন।'

পরিচালকের এক সহকারীর হাতে স্বর্ণমুদ্রার থলে তুলে দিল আব্রাহাম, তারপর এগিয়ে গেল মেয়েটাকে বুঝে নেবার জন্য। ওকে ধাক্কা দিয়ে ইহুদি লোকটার কাছে পাঠাল প্রহরীরা।

শক্তিশালী দু'হাতে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরল আব্রাহাম। কুটিল গলায় বলল, 'তোমার জন্য বহু টাকা খরচ হলো আমার, স্পেনের সুন্দরী! চলো, ওগুলো কড়ায়-গণ্ডায় পুষিয়ে দেবে।'

আতঙ্ক ফুটল মেয়েটির চোখের তারায়, শরীর মোচড়াতে শুরু করল আলিঙ্গনের ভিতর। ছাড়া পেতে চাইছে। কিন্তু একটুও আলগা হলো না তার ইহুদি মালিকের বাঁধন। বরং হেসে উঠল লোকটা খিকখিক করে। আর কিছু না পেরে আচমকা

খামচি দিল সে আব্রাহামের মুখে, চামড়া তুলে ফেলল। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে গেল আব্রাহাম। আঁচড়ের উপর হাত বুলিয়ে রক্ত দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রমূর্তি ধারণ করল সে।

কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। মেয়েটার উপর চোখ পড়তেই থমকে গেল আব্রাহাম। ওর হাতে শোভা পাচ্ছে তার নকশাদার ছোরাটা। খামচি খেয়ে যখন সরে যাচ্ছিল, তখন কোমর থেকে ওটা নিয়ে নিয়েছে মেয়েটা। দর্শকরা আঁতকে ওঠার মত একটা আওয়াজ করল।

'ভালগা মা ডিয়োস!' স্প্যানিশে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। ছোরার ফলা নিজের দিকে তাক করে দু'হাতে ওটা উঁচু করল। চোখ বন্ধ করে বসিয়ে দিল বুকে। আর্তনাদ করে উঠল সে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, বুকের ক্ষত আর মুখ দিয়ে গলগল করে বেরুচ্ছে রক্ত। একটু সময়ের জন্য স্থির রইল ওভাবে, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল। প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সবকিছু দেখল রোজামুণ্ড। নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল পানি। কিন্তু একটু পরেই নিজেকে সামলাল ও। মনের ভিতর আশার আলো জ্বলে উঠেছে, স্প্যানিশ মেয়েটা দেখিয়ে দিয়ে গেছে কী করা যেতে পারে... কীভাবে চরম অসম্মান থেকে বাঁচতে পারবে ও। হ্যাঁ, আত্মহত্যা করতে হবে এই দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে চাইলে। ঈশ্বর নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন ওকে। কোন্ পরিস্থিতিতে এই মহাপাপ করতে হচ্ছে, তা তো তিনি দেখতে পাচ্ছেন!

আব্রাহামের ধাতস্থ হতে অনেকটা সময় লাগল। শেষ পর্যন্ত লাশ ডিঙিয়ে নিলাম-পরিচালকের দিকে এগোল সে। কাছে গিয়ে বলল, 'ও মারা গেছে। আমার সোনা ফেরত দাও।'

ভুরু কোঁচকাল পরিচালক। 'ভাল আবদার জুড়েছেন তো! দাস মরলে পয়সা ফেরত? অমন কোনও নিয়ম আছে নাকি?'

'ও আমার দাসী হলো কীভাবে?' প্রতিবাদ করল আব্রাহাম। 'বাজার থেকেই তো নিতে পারলাম না!'

'তাতে কী? দাম মিটিয়েছেন, আপনার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে ওকে। এরপর কিছু ঘটলে তার জন্য আমরা দায়ী নই।'

থমথমে হয়ে উঠল আব্রাহামের চেহারা। 'কী! তারমানে খামোকাই একশো দিনার খোয়ালাম আমি?'

'ভাগ্যে যা ছিল, তা-ই ঘটেছে,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল পরিচালক। 'কপালের লিখন কেউ বদলাতে পারে না। আল্লাহ্-র ইচ্ছের বিরুদ্ধে কী-ই বা করার আছে আমাদের!'

খেপে গেল আব্রাহাম। 'কথা ঘুরিয়ো না। আমি আমার একশো দিনার ফেরত চাই!'

'দেখেছেন ব্যাটার আস্পর্ধা!' জনতার উদ্দেশে বলল পরিচালক। 'আল্লাহ্-র বিরুদ্ধে আঙুল তুলছে! নষ্ট করছে বাজারের শৃঙ্খলা!'

হইচই শুরু করল উপস্থিত ক্রেতারা। বেশিরভাগই মুসলমান, তাই ইহুদি লোকটার প্রতি কোনও সহানুভূতি অনুভব করছে না।

'ভাগো এখান থেকে! তোমার চেহারা দেখতে চাই না আমরা!' শোনা গেল চিৎকার।

অসহায় বোধ করল আব্রাহাম। কেউ তার পক্ষে নেই। চেঁচামেচি বেড়ে যাওয়ায় হার মানল। বলল, 'ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি আমি।' উল্টো ঘুরল বাজার থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য।

'আপনার *সম্পত্তি* নিয়ে যান!' টিটকিরির সুরে পিছন থেকে বলল পরিচালক। ইঙ্গিত করল লাশের দিকে। 'কেনা মাল রেখে

যাবার নিয়ম নেই এখানে।’

আরেক দফা অপমানের শিকার হতে হলো আব্রাহামকে, ভৃত্যদের ডেকে স্প্যানিশ মেয়েটার প্রাণহীন দেহ তুলে নেবার সময়। চলে যাবার আগে শেষবারের মত ফিরল নিলাম-পরিচালকের দিকে। হুমকির সুরে বলল, ‘বাদশাহ্-র কাছে নালিশ জানাব আমি। আসাদ-আদ-দীন সুবিচারক, আমার টাকা ফেরত দেবেন তিনি।’

‘নিশ্চয়ই দেবেন!’ বলল পরিচালক। ‘যখন আপনি ওই লাশকে জ্যান্ত করে তুলতে পারবেন!’ হেসে উঠল নিজের রসিকতায়।

জামার হাতায় টান পড়াতে থামল সে, ঘাড় ফেরাতেই দেখল খোজা আইয়ুবকে। নিচু গলায় বাজারে আসার উদ্দেশ্য জানাল সে। ফানযিলাহ্-র নাম শুনে তটস্থ হয়ে উঠল পরিচালক। তাড়াতাড়ি নির্দেশ দিল ইংরেজ বন্দিনীকে হাজির করবার।

বিনা প্রতিবাদে কুয়োর গোড়ায় এল রোজামুণ্ড। হাঁটল এলোমেলো পায়ে, যেন ঘুমের ঘোরে পা ফেলছে। মুখ খোলার আগে ওকে ভাল করে দেখে নিল পরিচালক। তারপর শুরু করল গুণগান... যদিও তার প্রয়োজন ছিল না। উজ্জ্বল সূর্যালোকে দেবীর মত দাঁড়িয়ে আছে ও, পরনের সাদা পোশাক থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে দ্যুতি। উপস্থিত ক্রেতাদের বুকে ঝড় তুলল এই দৃশ্য।

সবার আগে হাঁক দিল এক মোটাসোটা মূর। কাফ্রি ভৃত্য কিনতে এসেছে সে, কিন্তু রোজামুণ্ডকে দেখে ভুলে গেছে প্রয়োজনের কথা। ঝুঁকি এড়াবার শুরুতেই চড়া দাম বলল, যাতে আর কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে।

‘একশো দিনার!’

'যথেষ্ট নয়,' বলল পরিচালক। 'চাঁদের মত মুখটা দেখুন। এর দাম-ই তো একশো দিনারের বেশি। শরীরের কথা নাহয় বাদ দিলাম। দয়া করে ঠিকমত দাম বলুন।'

'দেড়শো দিনার!' বলে উঠল সেই তুর্কি ক্রেতা। নতুন উদ্যম ফিরে পেয়েছে সে।

'এবারও কম বললেন। কত লম্বা ও, দেখুন। শরীরটা কেমন টানটান! চোখদুটো কত সুন্দর! এই সুন্দরী তো বাদশাহ্-র হারেমের উপযুক্ত, আর আপনারা কিনা দাসী-বাঁদীর দাম বলছেন!'

প্ররোচনায় কাজ হলো। ইউসুফ নামের সেই মূর সরাসরি দুইশো দিনার ডেকে বসল। একটু আগেই বলেছে, চতুর্থ স্ত্রী নেবার ইচ্ছে নেই তার; কিন্তু রোজামুণ্ডের রূপ দেখে খায়েশটা আবার মাথায় চেপে বসেছে।

এবারও সন্তুষ্ট হলো না পরিচালক। বন্দিনীর পাশে গিয়ে একটা হাত উঁচু করাল। বলল, 'পেলব এই বাহু দেখুন। গোলাপের মত ঠোঁট দেখুন। মাত্র দুইশো দিনারে কি পাওয়া যায় এসব? দাম বাড়ান। হামিদ, আপনি কিছু বলছেন না কেন?'

একটু বিরক্ত দেখাচ্ছে মূর ব্যবসায়ী হামিদকে। বলল, 'কী যে হয়েছে আপনাদের, বুঝতে পারছি না। এরচেয়ে কম দামে ক'দিন আগেও একসঙ্গে তিনটা দাসী কিনেছি আমি সাস্ থেকে।'

'সাসের বিশ্রী মেয়েদের সঙ্গে এমন অপরূপার তুলনা করবেন না, হামিদ। নিজেই ভেবে দেখুন, ওরা কি এর নখেরও যোগ্য?'

কাঁধ ঝাঁকাল হামিদ। 'বেশ, তা হলে দুইশো দশ দেব আমি।'

এতক্ষণ ভিড়ের পিছনে ছিল উজির সামানি। এবার সামনে এগিয়ে এল। দর কষাকষির ইচ্ছে নেই, তাই একবারেই বলে দিল দাম।

'তিনশো দিনার!' ব্যাপারটা চুকেবুকে যাবার জন্য ডাক দিল সে, কিন্তু...

'চারশো দিনার!' ভেসে এল একটা কর্কশ কণ্ঠ।

ঝট্ করে সেদিকে ফিরল সামানি, দেখতে পেল আইয়ুবের কুটিল হাসিমাখা চেহারা। গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল ভিড়ের মাঝে। সবাই উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে পাগলাটে এই ক্রেতাকে দেখার জন্য।

মূর ব্যবসায়ী ইউসুফ খেপে গেল। শাপশাপান্ত করে বলল, আর কোনোদিন পা রাখবে না আলজিয়ার্সের এই বাজারে। 'কসম খোদার, সবাইকে জাদু-টোনায় পেয়েছে,' যোগ করল সে। 'নইলে একটা খ্রিস্টান মেয়ের দাম চারশো দিনার হয়? আল্লাহ্ তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি করুন। না হলে এই দামে দাসী কিনে ফতুর হয়ে যাবে তোমরা।'

রাগী ভঙ্গিতে ভিড় ঠেলে বাজার থেকে বেরিয়ে গেল সে। কিন্তু নাটক তখনও শেষ হয়নি। সামানি তার বিস্ময়ের প্রাথমিক ধাক্কা সামলাবার চেষ্টা করছে... আইয়ুবকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একেবারেই আশা করেনি সে... এই সুযোগে নতুন ডাক দিল তুর্কি লোকটা।

'পাগলামিই হয়তো করছি,' বলল সে, 'কিন্তু এই মেয়ে আমার মন ভরিয়ে দিচ্ছে আনন্দে। আল্লাহ্ হয়তো ওকে আমার জন্যই পাঠিয়েছেন। যা থাকে কপালে... চারশো বিশ দিনার ডাকছি আমি, পরিচালক ভাই। আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন।'

কথাটা শুনে যেন চাবুকের বাড়ি খেল সামানি, ফিরে এল বাস্তবে। তাড়াতাড়ি পরিচালকের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠল,

'পাঁচশো দিনার!'

'হায় আল্লাহ্!' আঁতকে উঠল তুর্কি। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনতাও চেঁচাল *হায় আল্লাহ্* বলে।

নির্বিকার রইল আইয়ুব। শান্ত গলায় বলল, 'সাড়ে পাঁচশো!'

'ছয়শো!' পাল্টা ডাক দিল সামানি।

উপস্থিত জনতা চেঁচাচ্ছে না আর। হতভম্ব হয়ে গেছে তারা। কোনও দাসীর জন্য এমন লড়াই আগে কখনও দেখা যায়নি এই বাজারে। ওদেরকে আরও বিস্মিত করে সাতশো দিনার ডাকল আইয়ুব।

'আটশো!' খ্যাপাটে কণ্ঠে বলল সামানি।

'নয়শো।' জবাব দিল যেন আইয়ুব।

খোজার দিকে ফিরল উজির। রাগে লাল হয়ে গেছে চেহারা। ধমকের সুরে বলল, 'তুমি কি এখানে ফাজলামি করতে এসেছ?'

'ফাজলামি?' বলল আইয়ুব। 'আপনি কি আমার দুলাভাই যে ফাজলামি করব?'

মাটিতে পা ঠুকল সামানি ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে। পরিচালকের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'এক হাজার দিনার!'

তীব্র গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল ভিড়ের মধ্যে।

'চুপ করুন সবাই!' বলে উঠল পরিচালক। 'চুপচাপ আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করুন, যিনি এমন চমৎকার মূল্য পাঠাচ্ছেন আমাদের সামনে।'

'এগারোশ' দিনার!' লোকটার কথা শেষ হতেই চেঁচাল আইয়ুব।

অসহায় বোধ করল সামানি। বাদশাহ্-র বলে দেয়া সীমায় পৌঁছে গেছে সে. এরচেয়ে বেশি খরচ করতে চাইলে অনুমতি নিতে হবে। অত টাকাও নেই তার কাছে। জোগাড় করে আনতে

পারবে, কিন্তু তার সময় কোথায়? নিলাম তো আর থামিয়ে রাখা যাবে না। উভয়সঙ্কট আর কাকে বলে? দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে ওর উপর অসন্তুষ্ট হবেন বাদশাহ্... রেগে যেতে পারেন অকারণে বাড়তি টাকা জলাঞ্জলি দিলেও। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

ভিড়ের দিকে তাকাল সে। হতাশায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'এ আমি মানি না! খোজাটা মশকরা করছে আমাদের সবার সঙ্গে। কেনার কোনও ইচ্ছে নেই ওর। আপনারাই ভাবুন, সামান্য এক নফরের কাছে এত টাকা আসবে কোত্থেকে?'

কোমর থেকে মোটাসোটা একটা থলে বের করে সবাইকে দেখাল আইয়ুব। বলল, 'আমার একজন পৃষ্ঠপোষক আছে।' পিত্তি জ্বালানো ভঙ্গিতে হাসল। 'পরিচালক মহোদয়, আমি কি এগারোশ' দিনার গুনে ফেলব?'

'উজির সামানি-র যদি তাতে আপত্তি না থাকে,' বলল পরিচালক।

'জানো কার হয়ে আমি কিনতে এসেছি মেয়েটাকে?' গর্জে উঠল সামানি। 'স্বয়ং বাদশাহ্ আসাদ-আদ-দীনের হয়ে!' কয়েক পা এগিয়ে আইয়ুবের মুখোমুখি হলো। 'কত বড় সাহস তোমার, বাদশাহ্-র মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চাইছ! কী জবাব দেবে তুমি তাঁর সামনে?'

মোটেই বিচলিত হলো না আইয়ুব। বলল, 'ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, উজির। আমাদের বাদশাহ্ সুবিচারক। উন্মুক্ত নিলামে অংশ নেবার জন্য তিনি শাস্তি দেবেন না আমাকে। আমি নিশ্চিত!'

'আগুন নিয়ে খেলছ তুমি!'

'রাগে অন্ধ হয়ে গেছেন আপনি। মাথা কাজ করছে না। শান্ত

হোন।'

অগ্নিদৃষ্টি হানল সামানি, আইয়ুব তার জবাবে নিক্ষেপ করল শীতল চাহনি। কয়েক মুহূর্ত নীরবে দৃষ্টির লড়াই চলল দু'জনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত গলা খাঁকারি দিয়ে তার ইতি ঘটাল নিলাম-পরিচালক।

'ডাক এখন এগারোশ' দিনার, হে উজির। আপনি কি বাড়াবেন?'

মাথা নেড়ে পিছিয়ে গেল সামানি। 'সম্ভব নয়। এরচেয়ে বেশি ডাকার ক্ষমতা নেই আমার।'

'বেশ, তা হলে এগারোশ' দিনারের বিনিময়ে, আইয়ুব...'

কথা শেষ হলো না তার। বাজারের ফটকের দিক থেকে শোনা গেল একটা জলদগম্ভীর কণ্ঠ।

'বারোশ' দিনার!'

স্বয়ং নিলাম-পরিচালকও চমকে গেল এই ডাক শুনে। পাগলামির অবসান ঘটেছে ভেবেছিল, কিন্তু তার ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে নতুন মানুষটা। হুল্লোড় করে উঠল জনতা। সামানির মুখেও হাসি ফুটল। কে দিয়েছে ডাক, তা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু আইয়ুবের আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি হওয়ায় খুশি হয়ে উঠেছে। নিজে না পারুক, এই নতুন ক্রেতা হয়তো প্রতিশোধ নেবে ওর হয়ে। একটু পরেই কৌতূহলের অবসান ঘটল তার।

ভিড় দু'ভাগ হয়ে পথ করে দিল, সেখান দিয়ে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে এল শাকের-আল-বাহার। জনতা জয়ধ্বনি দিল তার নামে।

ফটকের দিকে পিঠ দিয়ে রেখেছে রোজামুণ্ড, অলিভারকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু ঠিকই ওর কণ্ঠ চিনতে পারল। কেঁপে

উঠল সঙ্গে সঙ্গে। আরবী ভাষা জানে না, নিলামের খুঁটিনাটি বুঝতে পারছে না, টেরই পায়নি ওকে নিয়ে কতবড় নাটক চলছিল এতক্ষণ থেকে। কিন্তু অলিভারের কণ্ঠ ওকে বিচলিত করে তুলল। ক্ষণিকের জন্য দুনিয়া দুলে উঠল চোখের সামনে। নিলামে অংশ নিতে এসেছে সে। কেন? ওকে নিজের ক্রীতদাসী বানাবার জন্য? চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরকে ডাকল রোজামুণ্ড. লোকটার ইচ্ছে যেন সফল না হয়। সবকিছু মেনে নেবে, তবু কিছুতেই মানতে পারবে না অলিভারের হাতে নিগৃহীত হবার অসম্মান। তার আগে প্রয়োজনে জীবন দেবে।

একটু পর ধাতস্থ হলো ও। উপস্থিত লোকজন তখন 'মাশাল্লাহ্, শাকের-আল-বাহার!' বলে চেঁচাচ্ছে। নিলাম-পরিচালকের সহকারীরা ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে শান্ত করবার। জনতার উচ্ছ্বাস একটু স্তিমিত হলে পরিচালক বলল:

'আল্লাহ্ দয়াময়... এমন আগ্রহী ক্রেতা পাঠিয়েছেন তিনি আমাদের মাঝে। আইয়ুব, আপনি কিছু বলতে চান?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো আইয়ুব,' খোঁচা মারল সামানি। 'চুপ করে থেকো না।'

'তেরোশ' দিনার,' অস্বস্তি নিয়ে দাম বাড়াল খোজা। পাশার ছক উল্টে গেছে।

'আরও একশো দেব আমি,' শান্তস্বরে জানাল শাকের-আল-বাহার।

'দেড় হাজার দিনার!' মরিয়ার মত বলল আইয়ুব। ফানযিলাহ্-র দেয়া পুরো টাকাই বাজি ধরে ফেলেছে। ওখান থেকে কিছুটা লাভ করবে ভেবেছিল, সে-আশায় গুড়েবালি।

কিন্তু ওর এই ডাকের মুখে অবিচল রইল শাকের-আল-বাহার। ভুরু পর্যন্ত নড়ল না, তাকাল না প্রতিদ্বন্দ্বী খোজার

দিকে। শুধু শান্তস্বরে বলল, 'আরও একশো, হে পরিচালক।'

'ষোলোশ' দিনার!' প্রায় চিৎকার করে উঠল পরিচালক। যত না বিস্ময়ে, তারচেয়েও বেশি গর্বে। আজ পর্যন্ত এত দামে কোনও ক্রীতদাস বিক্রি করেনি সে... কেউ কোনোদিন করেছে বলেও শোনেনি। হাত তুলে কৃতজ্ঞতা জানাল, 'আল্লাহ্ চাইলে কী না হয়! তিনিই আজ আমার কপালে এমন ধনী ক্রেতা জুটিয়েছেন! সব প্রশংসা তাঁর।'

এদিকে বজ্রাহতের মত স্থবির হয়ে গেছে আইয়ুব। মুখে কোনও রা নেই। আর ডাক দেবার ক্ষমতা নেই তার—দাম মেটাতে পারবে না। লোকটার এই অবস্থা দেখে খিকখিক করে হাসল সামানি। প্রতিশোধের জ্বালা অনেকখানিই মিটেছে তার। বলল, 'কী আইয়ুব, ঠোঁট সেলাই হয়ে গেল কেন? আর ডাকবে না?'

মাথা নাড়ল খোজা। 'শয়তানের দয়ায় টাকার অভাব নেই ওঁর। আমার পক্ষে পাল্লা দেয়া সম্ভব নয়।'

এই প্রথমবারের মত লোকটার দিকে তাকাল শাকের, ধক করে জ্বলে উঠল দু'চোখ। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাছে পৌঁছুল, লৌহকঠিন হাতে সাঁড়াশির মত চেপে ধরল তার গলা।

'কী বললে? শয়তানের দয়ায় ধনী হয়েছি আমি?' মৃত্যুর শীতলতা ফুটল শাকেরের কণ্ঠে। আইয়ুব হাঁসফাঁস করছে বাতাসের অভাবে, খামচি দিচ্ছে দুর্বলভাবে, কিন্তু আলগা করল না মুঠি। চাপ দিয়ে তাকে মাটিতে বসাল ও, এরপর চিৎ করে ফেলল, চেপে বসল বুকের উপর। 'আজ তুমি মরবে, বদমাশ! আমাকে অপমান করার দায়ে কবরে যেতে হবে তোমাকে।'

টকটকে লাল হয়ে উঠেছে আইয়ুবের চেহারা, চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, 'দয়া

করুন... দয়া করুন, হে শাকের-আল-বাহার। মাফ চাই... অন্যায় করে ফেলেছি আমি।'

গলার উপর থেকে চাপ একটু কমাল শাকের। নির্দেশ দিল, 'কথা ফিরিয়ে নাও। স্বীকার করো, তুমি একটা মিথ্যেবাদী কুকুর।'

'নিচ্ছি... নিচ্ছি!' তড়িঘড়ি করে বলল আইয়ুব। 'আমি আসলেই মিথ্যেবাদী কুকুর, আপনার নামে অপবাদ দিয়েছি। আপনি তো ধনী হয়েছেন আল্লাহ্‌র আশীর্বাদে... তাঁর অক্লান্ত সেবা করে!'

লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শাকের। 'এবার তোমার নোংরা জিভ এখানকার ধুলো দিয়ে পরিষ্কার করো।'

'জী?' নির্দেশটার অর্থ বুঝতে পারছে না আইয়ুব।

'মাটি চাট্‌, হারামজাদা!' পিছন থেকে গাল দিয়ে উঠল আলি।

তাড়াতাড়ি হামাগুড়ির ভঙ্গিতে গেল আইয়ুব। জিভ বের করে চাটতে শুরু করল বাজারের মাটি। শেষ পর্যন্ত যখন উঠে দাঁড়াবার অনুমতি পেল, তখন আত্মমর্যাদা মিশে গেছে ধুলোর সঙ্গে। ধূলিময় চেহারায় ফুটেছে চরম পরাজয়। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে টিটকিরি।

'এবার কেটে পড়ো এখান থেকে,' তাকে বলল শাকের। 'নইলে আমার ছেলেরা তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'

পড়িমরি করে ছুটে পালাল আইয়ুব।

শাকের ঘুরে দাঁড়ালে নিলাম-পরিচালক ঘোষণা করল, 'ষোলোশ' দিনারের বিনিময়ে এই দাসী এখন আপনার, হে শাকের-আল-বাহার। আল্লাহ্‌ আপনার বিজয় বাড়িয়ে দিন!'

তোষামোদের প্রভাব পড়ল না শাকেরের চেহারায়। ঠাণ্ডা

গলায় বলল, 'দাম মিটিয়ে দাও, আলি।' তারপর এগোল রোজামুণ্ডকে বুঝে নিতে।

আবারও মুখোমুখি হলো দুজনে। শীতল দৃষ্টিতে পুরনো প্রেমিকার দিকে তাকাল অলিভার, আর ওর সেই তাকানোতে ভয় পেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল রোজামুণ্ড। চিরচেনা মানুষটা কতখানি বদলে গেছে... কতখানি নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে, তা ওই খোজাকে শাস্তি পেতে দেখে বুঝে ফেলেছে ও। ঘৃণা আর অনুভব করছে না মেয়েটা, অস্তিত্ব জুড়ে চেপে বসেছে ভয়।

হালকা একটা হাসি দিয়ে সে-ভয় আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল অলিভার। ইংরেজিতে বলল, 'এসো।'

মাথা নেড়ে পিছিয়ে গেল রোজামুণ্ড, ইতিউতি তাকিয়ে আশ্রয় খুঁজল। সামনে এগোল অলিভার, নিষ্ঠুরের মত আঁকড়ে ধরল ওর কবজি, হিড়হিড় করে টেনে সরিয়ে আনল কুয়োর গোড়া থেকে। ছুঁড়ে দিল নিজের সঙ্গী-সাথীর দিকে।

'মুখ ঢাকো ওর,' নির্দেশ দিল সে। 'তারপর নিয়ে চলো আমার বাড়িতে।'

এগারো

সত্য প্রকাশ

নগর-প্রাচীরের বাইরে, বাব-আল-ওয়াবে শাকের-আল-বাহারের

বাড়ি। সঙ্গীসাথী আর সদ্য-কেনা দাসদের নিয়ে ও যখন সেখানে পৌঁছুল, সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। অন্ধকার, সংকীর্ণ প্রবেশপথ পেরিয়ে বাড়ির বিশাল আঙিনায় ঢোকানো হলো রোজামুণ্ড আর লায়োনেলকে। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল আকাশের নীলিমা, নামতে থাকল আঁধার। শোনা গেল মাগরিবের আজান—উদাত্ত কণ্ঠে সবাইকে নামাজ পড়বার আহ্বান জানাচ্ছে মুয়াজ্জিন।

আঙিনার ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা পাথরের ফোয়ারা। স্বচ্ছ পানি উঠে আসছে মাটি থেকে, ছাতার মত আকৃতি নিয়ে আবার শত-সহস্র কণায় খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে, আছড়ে পড়ছে গোড়ার মার্বেল-বেসিনে। ওখান থেকে রূপার পাত্রে পানি নিয়ে এল এক ভৃত্য, সেই পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে নিল শাকের, অজু করল। আরেক ভৃত্য জায়নামাজ বিছিয়ে দিয়েছে মাটিতে, তাতে নামাজের জন্য দাঁড়াল ও। সঙ্গীরাও যোগ দিল পিছনে, যার যার আলখাল্লা বিছিয়ে নিয়েছে জায়নামাজের মত করে।

বন্দিদের ঘুরে দাঁড়াতে হলো, পাছে ওদের কারণে কোনও ব্যাঘাত ঘটে প্রার্থনায়। চুপচাপ তাকিয়ে রইল তারা আঙিনার একপাশের বাগানের দিকে। রঙ-বেরঙের ফুল ফুটেছে ওখানে, সুগন্ধে মৌ মৌ করছে চারদিক। দু'জন মালী পানি দিচ্ছে গাছের গোড়ায় আর ফুলের কেয়ারিতে।

নামাজ শেষে উঠে পড়ল শাকের। ভারিক্কি গলায় আরবীতে কী যেন নির্দেশ দিল, তারপর ঢুকে গেল বাড়িতে। শাকেরের দুই কাফ্রি দেহরক্ষী এগিয়ে এল, লায়োনেল আর রোজামুণ্ডকে ইশারা করল হাঁটতে। বাড়ির দরজা পেরিয়ে সিঁড়িতে গেল ওরা, উঠতে শুরু করল উপরে। একটু পরেই ছাদের পাশের মস্ত এক ঝুলবারান্দায় পৌঁছুল। পুবের ঐতিহ্য অনুসারে এ-জায়গা বাড়ির

গৃহকর্ত্রীর জন্য বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু এ-বাড়িতে প্রথমবারের মত নারীর পা পড়ছে এখানে, কারণ শাকের অবিবাহিত।

ঝুলবারান্দার চারপাশ চারফুট উঁচু প্যারাপেট দিয়ে ঘেরা। কিনারে দাঁড়ালে চোখে পড়ে পাহাড়ি ঢাল ধরে বিস্তৃত কসবাহ্ নগরীর পূর্ব অংশ। আরও চোখে পড়ে বন্দর আর খাঁড়ি। দূরে, খাঁড়ির মাঝখানে মাথা তুলে রেখেছে কৃত্রিম এক দ্বীপ—খ্রিস্টান ক্রীতদাসদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে ওটা *পেনন* দুর্গের পাথর দিয়ে, বহুদিন আগে স্প্যানিয়ার্ডদের হাত থেকে এই দুর্গ জয় করে নিয়েছিলেন খায়রুদ্দিন বারবারোসা। সাঁঝের আঁধার এখন জেঁকে বসছে সবকিছুর উপরে, দিনের সমস্ত রঙ হারিয়ে প্রতিটা ভবন ধারণ করেছে ধূসর বর্ণ। পশ্চিমদিকে রয়েছে বাড়ির বাগানটা, ওখানকার গাছে গাছে কলকাকলি করছে নীড়ে ফেরা পাখির দল। এরপর রয়েছে পাহাড়ি এক উপত্যকা, নিচু এক টিলার গা বেয়ে ওটার বুকে নেমে এসেছে ঝর্ণাধারা, আবছাভাবে শোনা যাচ্ছে ব্যাঙের ডাক।

দুটো লম্বা বর্শার সাহায্যে ঝুলবারান্দার দক্ষিণ পাশের দেয়াল থেকে খাটানো হয়েছে শামিয়ানা। তার তলায় রয়েছে গদিমোড়া ডিভান আর সিল্কের অনেকগুলো ছোট বালিশ। কাছে আছে একটা নিচু টেবিল—হাতির দাঁতে গড়া, কিনারাগুলো সোনা দিয়ে গিল্টি করা। শামিয়ানার উল্টোপাশে, প্যারাপেট ঘেঁষে শোভা পাচ্ছে অনেকগুলো ফুলের টব, তাতে গোলাপের গাছ। ফুল ফুটেছে সবগুলোয়। আলোকস্বল্পতার কারণে কালচে-বাদামি দেখাচ্ছে রক্তলাল গোলাপগুলোকে।

আবছা আলোয় মুখ চাওয়াচাওয়ি করল লায়োনেল আর রোজামুণ্ড, দুজনের মুখই ফ্যাকাসে হয়ে আছে। ওদের কয়েক গজ পিছনে অনড় প্রহরায় রয়েছে দুই দেহরক্ষী। হঠাৎ ফুঁপিয়ে

উঠল লায়োনেল, দু'হাতে মুখ ঢাকল। ঊর্ধ্বাঙ্গ এখন আর অনাবৃত নয় তার, বাজার থেকে বেরুনোর সময় একটা পুরনো কোর্তা পরিয়ে দেয়া হয়েছে, তারপরেও আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে সে।

'শক্ত হও,' ধীর কণ্ঠে বলল রোজামুণ্ড। 'এভাবে ভেঙে পোড়ো না।'

'হায় ঈশ্বর, তোমাকেও এমন অসম্মান সইতে হলো!' বলল লায়োনেল। 'আমার যা হবার হয়েছে, কিন্তু তোমাকে কেন তিনি ওই অমর্যাদা আর নিষ্ঠুরতার শিকার বানালেন?'

ওর বাহুতে হাত রাখল রোজামুণ্ড। 'কী-ই বা আর সয়েছি?' বলল ও। আশ্চর্যরকম দৃঢ় শোনাল কণ্ঠ। 'আমাকে করুণা কোরো না, লায়োনেল... কারণ সব ভোগান্তির ইতি ঘটাতে চলেছি আমি খুব শীঘ্রি। চাইলেও আর কেউ আমাকে অসম্মান করতে পারবে না।' অদ্ভুত একটা হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

'কীভাবে?' বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল লায়োনেল।

'জীবনের ভার যখন বড্ড বেশি হয়ে যায়, তখন সেটার হাত থেকে মুক্তি পাবার তো একটাই উপায় থাকে!'

গোঙানি বেরুল লায়োনেলের মুখ দিয়ে... বরাবরের মত। ধরা পড়ার পর থেকে গোঙানি ছাড়া আর কিছুই করেনি সে। রোজামুণ্ডের যদি বিচার-বিবেচনা করবার মত মানসিকতা থাকত, তা হলে নিঃসন্দেহে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠত লায়োনেলের প্রতি। সত্যিকার পুরুষ হলে ছেলেটা এভাবে ভেঙে পড়ত না। যত বাধাই আসুক, চেষ্টা করত নিজেকে আর হবু স্ত্রীকে মুক্ত করতে... তাতে জীবন গেলে যাক। কিন্তু সে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে কাপুরুষের মত গোঙাচ্ছে, কাতরাচ্ছে।

একটু পর বড় বড় মশাল নিয়ে কয়েকজন ভৃত্য এল

ঝুলবারান্দায়। দেয়ালের খাঁজে ঝুলিয়ে দিল মশালগুলো। আগুনের কাঁপা কাঁপা শিখায় আলোকিত হয়ে উঠল জায়গাটা। চলে গেল ভৃত্যরা। আর তার পর পরই দরজায় উদয় হলো দীর্ঘদেহী এক মূর্তি।

শাকের-আল-বাহার।

এক মুহূর্তের জন্য নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে। আচরণে দম্ভ, চেহারা নির্বিকার। শান্ত চোখে জরিপ করল দুই বন্দিকে। তারপর ধীর পায়ে এগোল। খাটো একটা কাফ্তান পরেছে, কোমরে সোনার কটিবন্ধনী—মশালের আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে ওটা থেকে। দু'হাত আর হাঁটুর নীচ-টা অনাবৃত। পায়ে সোনালি কারুকাজের তুর্কি চপ্পল। মাথায় সাদা পাগড়ি, কপালের উপরটাতে জ্বলজ্বল করছে দামি একটা রত্ন।

মনিবের ইশারা পেয়ে ঝুলবারান্দা থেকে বেরিয়ে গেল দুই দেহরক্ষী। বন্দিদের সঙ্গে শাকের এখন একা।

মাথা ঝুঁকিয়ে রোজামুণ্ডকে অভিবাদন জানাল ও। হাত নেড়ে চারপাশ দেখাল। বলল, 'আজ থেকে এ-জায়গা তোমার। কারণ ক্রীতদাসী নয়, স্ত্রী-র মত তোমাকে রাখতে চাই আমি। বাড়ির ওপরতলা মুসলিম-রা তাদের স্ত্রী-র জন্য বরাদ্দ করে। আশা করি জায়গাটা তোমার পছন্দ হয়েছে।'

ভাইয়ের কথা শুনেও শুনতে পাচ্ছে না লায়োনেল। মড়ার মত সাদা হয়ে গেছে তার মুখ। কী করা হতে পারে ওকে নিয়ে, তা ভেবে শুকিয়ে যাচ্ছে বুক। আর কোনও কিছু নেই তার চিন্তা-চেতনায়।

রোজামুণ্ড ঠিক তার বিপরীত। বাজারের ভয় কাটিয়ে উঠেছে, চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে চোখ রাখল অলিভারের চোখে। সুন্দর মুখটা আবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। উদ্ধত সুরে প্রশ্ন করল, 'কী করতে

চাইছ তুমি আমাকে নিয়ে?'

'কী করতে চাইছি?' বাঁকা সুরে বলল অলিভার। রোজামুণ্ডের উপর যথেষ্ট রাগ আর ক্ষোভ আছে ওর, কিন্তু মনে মনে এ-মুহূর্তে মেয়েটার সাহসের প্রশংসা না করে পারল না। বুকও কেমন যেন করে উঠল। দ্রুত আবেগটাকে চাপা দিল ও। কঠোর সুরে বলল, 'আমাকে প্রশ্ন করবার কোনও অধিকার নেই তোমার। একটা সময় ছিল, রোজামুণ্ড, যখন আমি তোমার দাস হয়ে ছিলাম... ভালবাসার দাস! কিন্তু হৃদয়হীনতা আর অবিশ্বাস দিয়ে তার প্রতিদান দিয়েছ তুমি, ভেঙে দিয়েছ সেই প্রেমের শেকল। কিন্তু আজ আমি তোমাকে যে-শেকল পরাচ্ছি, তা এত সহজে ভাঙতে পারবে না।'

'কী বলতে চাও?'

রোজামুণ্ডের দিকে একটু এগোল অলিভার। রুদ্রকণ্ঠে বলল, 'তুমি এখন আমার ক্রীতদাসী। বাজার থেকে গরু, ছাগল বা উটের মত কেনা একটা জন্তু, যার দেহ-মন আমার সম্পত্তি। যা খুশি করতে পারি আমি তোমার সঙ্গে, সব মুখ বুজে সহ্য করতে হবে! ভালবাসতে বললে ভালবাসতে হবে, চুমো খেতে বললে চুমো খেতে হবে... যদি আঘাত করতে চাই, তা হলে গাল বাড়িয়ে দিতে হবে। নিজের কোনও ইচ্ছে বা মত নেই আর তোমার, আমার ইচ্ছেই তোমার ইচ্ছে। আমার প্রতিটা আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে তোমাকে। অবাধ্য হলে জুটবে ভয়ঙ্কর শাস্তি!'

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল রোজামুণ্ডের। বিশ্বাস করতে পারছে না, অলিভার এমন ঘৃণাভরা কথা উচ্চারণ করতে পারে ওর সম্পর্কে।

ফিসফিসিয়ে ও বলল, 'তুমি... তুমি পশু হয়ে গেছ!'

'তুমিই তৈরি করেছ এই পশু—প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করে। আর সেজন্যেই এখন আটকা পড়েছ দাসত্বের বন্ধনে।'

'ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন!'

'প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ। তিনি যেন তোমাকেও ক্ষমা করেন।'

অলিভারের কথা শেষ হতেই ঘরঘর করে উঠল লায়োনেল। ফোঁপাতে চাইছিল, কিন্তু গলায় আটকে গেছে আওয়াজটা। ধীরে ধীরে তার দিকে ফিরল অলিভার। এক মুহূর্ত দেখল ভাইকে, তারপর হেসে উঠল।

'হাহ্! আমার এককালের ভাই! ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, তাই না, লায়োনেল? ভাল করে ওকে দেখো, রোজামুণ্ড। দুর্দশায় কী হাল হয়েছে এই বীরপুরুষের! অথচ ওকেই অবলম্বন বানাতে চাইছিলে তুমি। আমাকে ছেড়ে বিয়ে করতে চলেছিলে ওকে। দেখো আমার প্রিয় ভাইয়ের অবস্থা!'

অপমানের এই সুর ক্ষণিকের জন্য বিদ্রোহী করে তুলল লায়োনেলকে। রাগান্বিত গলায় ও বলল, 'তুমি আমার ভাই নও! তোমার মা ছিল এক চরিত্রহীনা... তাকে বিয়ে করে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছিল বাবা।'

থমকে গেল অলিভার। ওকে দেখে মনে হলো এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে লায়োনেলের উপর। কিন্তু আশ্চর্য দক্ষতায় নিজেকে সামলাল। থমথমে গলায় বলল, 'ওই নোংরা জিভে আর একবারও যদি আমার মায়ের কথা উচ্চারণ করো, তা হলে জিভটা ছিঁড়ে নেব আমি। এমন নয় যে, কেউ বদনাম করলেই কলঙ্কিত হবে আমার মহান মা, কিন্তু তাই বলে তোমার মুখ থেকে অমন কথা সহ্য করব না আমি। বাজে কথা যদি বলতে হয়, নিজের জন্মদাত্রী সম্পর্কে বলো। আমি খুব মজা করে

শুনব।'

হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল লায়োনেল, ঝাঁপ দিল অলিভারকে লক্ষ্য করে। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওর গলার নাগাল পাবার জন্য। সফল হলো না সে-প্রচেষ্টা। আলতো পায়ে সরে গিয়ে ওকে ফাঁকি দিল অলিভার, পিছন থেকে ছোবল দিল, সাঁড়াশির মত ধরে ফেলল ভাইয়ের ঘাড়। চাপ দিয়ে তাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে ফেলল মাটিতে। শরীর মোচড়াল লায়োনেল, কিছুতেই ছাড়াতে পারল না নিজেকে।

'আমার শক্তি দেখে অবাক হচ্ছ?' উপহাসের সুরে বলল অলিভার। 'যদি জানতে ছ'টা মাস কীভাবে কাটিয়েছি আমি, তা হলে অবাক হতে না। যদি ক্রীতদাস হিসেবে ছ'মাস দাঁড় টানার অভিজ্ঞতা থাকত, তা হলে বুঝতে—কেন আমার শরীর লোহায় পরিণত হয়েছে... কেন সমস্ত মানবিক অনুভূতি হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়েছি আমি।'

টান দিয়ে লায়োনেলকে দাঁড় করাল ও। ছুঁড়ে ফেলল গোলাপের টবের সারির উপর। ধুমধাম শব্দে কয়েকটা টব ভাঙল, মাটি আর গোলাপের ডালপাতা বর্ষণের মত নেমে এল লায়োনেলের গায়ে।

কথায় পেয়ে বসেছে অলিভারকে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চলল, 'কী জানো তুমি মাল্লার জীবন সম্পর্কে? বিশ্রাম নেই ওদের, দিন-রাত একটা কাঠের বেঞ্চে ন্যাংটো হয়ে বসে থাকতে হয় শেকল-পরা অবস্থায়... মল-মূত্র আর মানব-আবর্জনার মাঝখানে। টানতে হয় দাঁড়। সইতে হয় রোদ-বৃষ্টির অত্যাচার। থামার উপায় নেই, ক্লান্ত হবার উপায় নেই... দুর্বলতা দেখালেই পিঠে নেমে আসে চাবুকের আঘাত! বুঝতে পারছ কেমন জীবন ওটা?' মাথা ঝাঁকাল ও। 'বুঝবে... হাতে-কলমে বুঝবে।

যে-নরকযন্ত্রণা সয়েছি আমি তোমার কারণে, তা এবার তোমাকেও সইতে হবে।'

দম নেবার জন্য থামল অলিভার। লায়োনেল কোনও কথা বলল না। শরীর কুঁকড়ে পড়ে আছে মাটিতে। দপ্ করে যেভাবে জ্বলে উঠেছিল আক্রোশ, তা নিভে গেছে ওভাবেই।

'আজ তোমাকে এখানে এনেছি কেন, জানো?' খেই ধরল অলিভার। 'তোমার শাস্তির ষোলোআনা পূর্ণ করতে। আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তুমি, খুনি সাজিয়েছ আমাকে, ধ্বংস করেছ আমার সুনাম, দখল করেছ সব সহায়-সম্পত্তি... তারপর আবার বিয়ে করার চেষ্টা করেছ আমারই প্রেমিকাকে! অক্ষমণীয় অপরাধ এসব, শুধু দৈহিক শাস্তি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত হয় না এর। তাই মানসিক শাস্তিও পেতে হবে তোমাকে। যে ভয়ানক মনোযন্ত্রণায় ভুগেছি আমি, তা ভুগতে হবে তোমাকেও!' রোজামুণ্ডের দিকে তাকিয়ে হিংস্র ভঙ্গিতে হাসল ও। 'আশা করি ওকে তুমি ভালবাসো, লায়োনেল। তোমার ওই আত্মাহীন হৃদয়ে একটু হলেও দুর্বলতা আছে রোজামুণ্ডের জন্য। ওটাই আমার অস্ত্র, ভাই! আজ তোমাকে এখানে এনেছি ভালবাসার মানুষের পরিণতি জানাবার জন্য... কী কঠিন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে ওর ভাগ্যে, তা বুঝিয়ে দেবার জন্য। এবার তোমাকে হাসিমুখে জাহাজে পাঠাতে পারি আমি। দাঁড় টানার প্রবল কষ্টের মাঝেও মরমে মরমে মরবে তুমি রোজামুণ্ডের কথা ভেবে... তোমার কারণে কী ভোগ করতে হচ্ছে ওকে, তা উপলব্ধি করে। সারাক্ষণ তোমার চোখে ভাসবে আমার হাতে ওর নিপীড়িত হবার দৃশ্য। চাবুকের আঘাতের চেয়েও বেশি ক্ষত-বিক্ষত হবে তোমার হৃদয়!'

'তুমি পিশাচ!' হাহাকার করে উঠল লায়োনেল। 'নরক থেকে

উঠে আসা পিশাচ তুমি!'

'নিজেই যে-পিশাচকে সৃষ্টি করেছ, ছোট্ট ভাই আমার, তাকে গাল দেয়া অন্তত তোমার মুখে শোভা পায় না।'

'ওর কথায় কান দিয়ো না, লায়োনেল,' বলে উঠল রোজামুণ্ড। 'যত চেষ্টাই করুক শয়তানটা, আমি কিছুতেই নিজের সম্মান বিসর্জন দেব না। ওর অশুভ ইচ্ছে কোনোদিন সফল হবে না।'

'বড়াই না করলেই ভাল করবে,' বলল অলিভার। 'তাতে জেদ চেপে যেতে পারে আমার।'

'নিকুচি করি তোমার জেদের, বদমাশ!'

'গাল দিচ্ছ কেন? আজ আমি যা... তোমরাই তা বানিয়েছ আমাকে।'

'আমরা তোমাকে মিথ্যেবাদী আর কাপুরুষ বানিয়েছি? আর কিছু তো নও তুমি!'

'কাপুরুষ?' ভুরু কোঁচকাল অলিভার। তাকাল লায়োনেলের দিকে। 'তুমি আমাকে কাপুরুষ বলেও প্রমাণ করেছ নাকি? হুম, মনে হচ্ছে খুব মজার কোনও গল্প হবে ওটা।' হাসল রোজামুণ্ডের দিকে ফিরে। 'একটু বলবে, কখন-কোথায় কাপুরুষত্ব দেখিয়েছি আমি?'

'এখন যা করছ, সেটাই কি যথেষ্ট নয়?' মুখ ঝামটা দিল রোজামুণ্ড। 'অসহায় দু'জন মানুষকে যেভাবে ভোগাচ্ছ?'

'এখনকার কথা শুনতে চাই না। এখন যদি কাপুরুষ হয়েও থাকি, সেটা তোমাদেরই কর্মফল। আমি জানতে চাই অতীতের কথা। কর্নওয়ালে কখন কাপুরুষত্ব দেখিয়েছি আমি?'

'অতীতের কথা বলছ তুমি? আমার কাছে? এত সাহস তোমার?'

'অতীতের কথা বলবার জন্যই তোমাকে ইংল্যাণ্ড থেকে এনেছি আমি। তখন সবকিছু তোমার কাছে গোপন রেখে বড্ড বোকামি করেছি আমি। পরে যখন বলতে চেয়েছি, সুযোগ দাওনি তুমি...'

'হ্যাঁ, তোমার কথা না শুনে অন্যায়ই করেছি বটে,' বিদ্রূপের সুরে বলল রোজামুণ্ড। 'ভাইয়ের খুনির সঙ্গে হাসিমুখে কথা বললেই বেশি শোভন হতো। তাই না?'

'আমি পিটারের খুনি নই,' বলল অলিভার। 'এ-কথা তখনও তোমাকে বলেছি আমি।'

'মিথ্যে কথা! নিজেকে বাঁচাবার জন্য ওসব বলেছ তুমি।'

'তা-ই তোমার ধারণা? একজন মিথ্যেবাদীকে ভালবেসেছিলে তুমি? তার সঙ্গে পুরো জীবন কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে?'

'তখন তোমার স্বরূপ জানা ছিল না আমার। জানতাম না, তোমার হিংসার সামনে পরাজিত হতে পারে প্রেম। অবুঝের মত তোমাকে মন-প্রাণ সঁপে শাস্তি পেয়েছি আমি... কে জানে, হয়তো ওটাই আমার প্রাপ্য ছিল।'

'ভুল বলছ। আমার প্রেমে কোনও খাদ ছিল না। মনের হিংসা-বিদ্বেষকে আমি দূর করে দিয়েছিলাম শুধু তোমার কথা ভেবে। আমার ভালবাসা ছিল নিখুঁত... পবিত্র!'

'এসব আর শুনিয়ো না আমাকে!' মুখ ফিরিয়ে নিল রোজামুণ্ড।

'কেন শোনাব না?' তেতে উঠল অলিভার।

'কারণ তোমার কথাগুলো আমাকে লজ্জা দেয়... মনে করিয়ে দেয়, একটা সময়ে নির্বোধের মত আমি কাকে ভালবেসেছিলাম!'

'লজ্জা?' বাঁকা হাসি ফুটল অলিভারের ঠোঁটে। 'কৃতকর্মের জন্য যদি লজ্জা পেতে হয়, তা হলে সেটা আজ তুমি পাবে, রোজামুণ্ড। আমার সব কথা শোনার পরে। এবং আজ তোমাকে সব শুনতেই হবে—কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না, তোমার কোনও আপত্তিতে কাজ হবে না। এরপর দেখব তোমার প্রতিক্রিয়া। সব শোনার পর বুঝতে পারবে, অযৌক্তিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আমাকে পিটারের খুনি ভেবে কতবড় ভুল করেছিলে।'

'অযৌক্তিক সাক্ষ্য-প্রমাণ?'

'অবশ্যই! নইলে তো ট্রুরো-র বিচারকই আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেন।'

'আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ তুমি,' বলল রোজামুণ্ড। 'মাস্টার বেইন কখনও বলেননি তুমি খুনি নও। তিনি শুধু বলেছেন, পিটার তোমাকে খেপিয়ে দিয়েছিল... আঘাত করেছিল তোমাকে। তোমার রাগকে যুক্তিসঙ্গত বলে ভেবে নিয়েছিলেন তিনি, তাই কোনও ব্যবস্থা নেননি। কিন্তু অলিভার... ওই যুক্তি আমাকে দেখিয়ে কাজ হবে না। কারণ আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তুমি, পিটারের কোনও আচরণেই রাগ করবে না তুমি... প্রতিশোধ নেবে না। সে-প্রতিজ্ঞা তুমি ভঙ্গ করেছ।'

ওর আক্রমণাত্মক কথাবার্তা শুনে ধৈর্য ধরে রাখা মুশকিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল অলিভার। বিড়বিড় করল, 'খোদা আমাকে শক্তি দিন!' তারপর রোজামুণ্ডকে বলল, 'একতরফাভাবে আমাকে দোষারোপ করছ তুমি, রোজামুণ্ড। অপমান করে চলেছ। কিন্তু উত্তেজিত হতে চাই না আমি। কারণ আজ রাতে অনেক কিছুই তোমাকে বোঝাতে হবে আমার। শোনো, মাস্টার বেইন আমাকে সহানুভূতি দেখিয়ে রেহাই

দেননি। তিনি জানতেন, আমি নির্দোষ।'

'কার দোহাই দিচ্ছ? উনি নিজেই তো পিটার আর তোমার মধ্যকার ঝগড়ার সাক্ষী ছিলেন। নিজের চোখে তোমাকে ওর পিছু নিতে দেখেছেন।'

'সেটা ছিল ক্ষণিকের উত্তেজনা। কিন্তু পরে আমি ভেবে দেখলাম...'

'পরে মানে কখন? আমার ভাইটাকে খুন করার পর?'

'আবার বলছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল অলিভার, 'ও-কাজ আমি করিনি।'

'তা হলে আবার তুমি মিথ্যে কথা বলছ।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল অলিভার। তারপর বলল, 'ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো, আজ পর্যন্ত কাউকে বিনা কারণে মিথ্যে কথা বলতে শুনেছ তুমি? প্রতিটা মিথ্যের পিছনেই একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকে—শয়তানি বা ব্যক্তিগত লাভের জন্য মিথ্যে বলে লোকে, কিংবা নিজের কাপুরুষত্ব লুকানোর জন্য।' পাশ ফিরে চাইল ও লায়োনেলের দিকে, 'আর হ্যাঁ, কখনও কখনও মিথ্যে বলে অন্যকে বাঁচানোর জন্য... আত্মত্যাগী মানসিকতা থেকে।' রোজামুণ্ডের চোখে চোখ রাখল আবার। 'আজ আমি কেন মিথ্যে বলব বলে মনে হয় তোমার? কী লাভ হবে আজ তোমাকে বানোয়াট কথা শুনিয়ে? ইতোমধ্যেই তোমার নির্দয় আচরণের জন্য ঘৃণা প্রকাশ করেছি আমি, সেজন্য শাস্তি শুনিয়ে দিয়েছি... এরপরে আর মিথ্যে গল্প শোনাবার প্রয়োজন কোথায় আমার?'

'তা হলে সত্যটাই বা শোনাবে কেন?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল রোজামুণ্ড।

'তোমার মনে উপলব্ধি জাগাবার জন্য—কত বড় অন্যায় করেছ তুমি আমার সঙ্গে... এই শাস্তি কেন তোমার প্রাপ্য।

নিজেকে মহান আত্মত্যাগী যেন না ভাবতে পারো, কারণ এতসব দুর্ভোগের মূলে রয়েছে তোমারই একগুঁয়েমি আর অবিশ্বাস।'

'আমাকে বোকা ভেবেছ তুমি, অলিভার?'

'শুধু বোকা না, তারচেয়ে অধম তুমি।'

'যাক, সত্যি কথাটা বলে দিলে,' থমথমে কণ্ঠে বলল রোজামুণ্ড। 'কিন্তু একটা বিষয় জেনে রেখো—আমার মত পাল্টাবে না কিছুতেই। যত কিছুই করো... যা-ই বলো... কিছুতেই তাতে মুছে যাবে না তোমার বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ। আমার ভাইয়ের লাশের পাশ থেকে তোমার বাড়ির দরজা পর্যন্ত গিয়েছিল রক্তের দাগ, তুমি পিছু নিয়েছিলে ওর, শত্রুতা ছিল তোমার পিটারের সঙ্গে!'

'তুমি যেমন প্রমাণের কথা বলছ, তেমনি আমিও প্রমাণ দেখাতে পারব। আমার নির্দোষিতার প্রমাণ!'

'তা-ই? তা হলে রানির প্রতিনিধি আসার আগেই লেজ তুলে পালিয়ে গিয়েছিলে কেন?'

ভুরু কোঁচকাল অলিভার। 'পালিয়ে গিয়েছিলাম? আমি? এ আবার কেমন কথা?'

'ও! তা হলে তুমি বলতে চাও, কর্নওয়াল থেকে পালাওনি তুমি? এটাও তোমার বিরুদ্ধে আরেকটা অপবাদ?'

চিন্তায় ডুবে গেল অলিভার। এবার দেখতে পাচ্ছে লায়োনেলের দূরদর্শী পরিকল্পনার স্বরূপ। ও-ই গুজব ছড়িয়েছে অলিভারের পালানোর। সবার মনে তাই বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে ওর অপরাধের। নির্দোষ হলে তো কেউ পালায় না। মাথা নিচু হয়ে গেল ওর। কী করেছে ও! রোজামুণ্ডকে দায়ী করেছে দুর্ভোগের জন্য... কিন্তু এতসব মিথ্যে প্রমাণ দেখার পর কী করে ওর উপর আস্থা রাখবে মেয়েটা? ভাইয়ের মৃত্যুতে মানসিকভাবে

দুর্বল ছিল বেচারি, সেটার সুযোগ নিয়ে ওর মন বিষিয়ে দিয়েছে লায়োনেল। সামান্য দ্বিধাদ্বন্দ্ব যদি থাকতও, সেটা মিলিয়ে গেছে অলিভারের পালাবার কথা শুনে। ও আসলে পরিস্থিতির শিকার... ষড়যন্ত্রের শিকার... ঠিক অলিভারের মত! অথচ ওকেই আজ অপহরণ করে এনেছে, পরিয়েছে দাসত্বের শেকল!

তীব্র অনুশোচনায় জ্বলে উঠল অলিভারের অন্তর। ফিসফিস করে উঠল, 'হায় খোদা! কী করেছি আমি?'

রোজামুণ্ডের দিকে তাকাল ও, আবার ফিরিয়ে নিল চোখ। শীর্ণ, ক্লিষ্ট মুখটা ওর হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছে।

'ঠিকই তো,' বলল অলিভার, 'আর কী-ই বা বিশ্বাস করবে তুমি?'

'এখনও কি বলবে আমি ভুল বুঝেছি তোমাকে?' বলল রোজামুণ্ড। 'বেদনাদায়ক সত্যকে দেখতে পাইনি আমি?'

'সত্য?' প্রতিধ্বনি করল অলিভার। 'সত্যকে দেখলে চিনতে পারবে? পার্থক্য করতে পারবে মিথ্যের সঙ্গে? কারণ সত্যটা যে বড়ই ভয়ঙ্কর, রোজামুণ্ড। বিশ্বাসের অযোগ্য!'

'বিশ্বাসের অযোগ্য!'

'হ্যাঁ, এখুনি শুনবে সেটা। তোমার ভাই আমার হাতে মারা পড়েনি... মারা পড়েছে এক ভীরু কাপুরুষের হাতে, যার প্রতি আমার কিছু পবিত্র কর্তব্য ছিল। খুনের পর পরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে সে আমার কাছে আসে আশ্রয় পাবার জন্য... শরীরে একটা ক্ষত নিয়ে। সেই ক্ষত থেকে চুইয়ে পড়া রক্তই সবাই দেখেছে আমার বাড়ির বাইরে। ধরে নিয়েছে, ওটা আমার রক্ত। আমাকে দোষারোপ করেছে। কিন্তু মাস্টার বেইন করেননি। কারণ ওঁর কাছে গিয়েছিলাম আমি, সার অ্যাণ্ড্রুর উপস্থিতিতে নিজের পুরো শরীর দেখিয়েছি... একটাও ক্ষত ছিল না ওতে।

তাই ওঁরা একটা প্রমাণপত্র লিখে দিয়েছিলেন আমাকে, আমি সেটা অনেক চেষ্টা করেও তোমাকে দেখাতে সক্ষম হইনি। আমার নির্দোষিতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল ওটা। রানির প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে দেবার জন্য ওটাই যথেষ্ট ছিল, পালানোর প্রয়োজন ছিল না আমার...'

আবছাভাবে মনে পড়ল রোজামুণ্ডের—এমন একটা প্রমাণপত্রের কথা বলবার চেষ্টা করেছিলেন মাস্টার বেইন, কিন্তু তাঁর কথায় কোনও কান দেয়া হয়নি তখন। অলিভারের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগে তাঁকে অগ্রাহ্য করেছিল সবাই। সার অ্যান্ড্রু তাঁকে সমর্থন দিলে হয়তো ঘটনা অন্যরকম হতে পারত, কিন্তু তার আগেই বেচারা মারা যান।

'যা হোক,' বলে চলল অলিভার, 'এতকিছুর মাঝেও আমি সত্যিকার খুনির পরিচয় প্রকাশ করিনি। আগেই বলেছি, ওকে রক্ষা করা নিজের পবিত্র কর্তব্য বলে ভেবেছিলাম আমি। কিন্তু কাপুরুষটা তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। বুকে সাহস না থাকলে যা হয় আর কী, সারাক্ষণ ভয় পেয়েছে সে—এই বুঝি সব ফাঁস করে দিই আমি! ওকে খুনি হিসেবে প্রমাণ করাটাও কঠিন ছিল না—গায়ে ক্ষত তো ছিলই, আরও ছিল মালপাসের এক সস্তাদরের মেয়ে... তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই ফাঁস হয়ে যেত, পিটার আর ওর মধ্যে মেয়েটাকে নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। ওই মেয়েটার জন্য পিটারকে শেষ পর্যন্ত মরতে হয়েছে...'

'থামো!' ফুঁসে উঠল রোজামুণ্ড। 'আমার মরা ভাইটার নামে বাজে কথা বোলো না!'

'শান্ত হও,' বলল অলিভার। 'কাউকে ছোট করবার ইচ্ছে নেই আমার। শুধু সত্য ঘটনা বলছি তোমাকে। বাধা দিয়ো না, শুনে যাও পুরোটা। তো যা বলছিলাম,... ওই কাপুরুষটা ভয়

পাচ্ছিল আমাকে। নিজের দোষ ঢাকবার জন্য আমাকেই শেষ পর্যন্ত বলির পাঁঠা বানাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এক রাতে ভাড়াটে লোক দিয়ে অপহরণ করায় আমাকে, একটা জাহাজে তুলে দেয় দাস হিসেবে বিক্রি করবার জন্য। আমার গায়েব হয়ে যাবার রহস্য এটাই, রোজামুণ্ড। দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছিলাম আমি, সময় বুঝে দংশন করেছে আমাকে। মিথ্যে খুনের অভিযোগে ফাঁসিয়েছে, তারপর আবার বিক্রি করে দিয়েছে দাস হিসেবে... যাতে নিজে নিষ্কলুষ থাকতে পারে, আমার সমস্ত সহায়-সম্পত্তি দখল করতে পারে, তারপর আবার বিয়ে করতে পারে আমারই এককালের প্রেমিকাকে!'

থমকে গেল রোজামুণ্ড। চরম বিস্ময় নিয়ে বলল, 'তুমি কি... তুমি কি বলতে চাইছ... লায়োনেল...'

'মিথ্যে বলছে ও!' মরিয়ার মত চেঁচিয়ে উঠল লায়োনেল। 'ওর কথায় দিয়ো না, রোজামুণ্ড! বিশ্বাস কোরো না ওকে!'

'আমি তা করছিও না,' নিজেকে সামলে নিল রোজামুণ্ড।

রাগে লাল হয়ে উঠল অলিভারের চেহারা। ভাইয়ের দিকে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল ও। নতুন আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেল লায়োনেল।

ভাইয়ের পোশাকের বুক মুঠো করে ধরল অলিভার। বলল, 'আজ রাতে সমস্ত সত্য প্রকাশ হবে, লায়োনেল। দরকার হলে গরম চিমটা দিয়ে তোমার ভিতর থেকে বের করে আনা হবে সব।'

টান দিয়ে তাকে ঝুলবারান্দার মাঝখানে নিয়ে এল ও, রোজামুণ্ডের সামনে হাঁটু গেড়ে বসাল। বলল, 'কর্সেয়ারদের অত্যাচার কেমন হয়, জানো লায়োনেল? পেটের কথা মুখে আনার জন্য এখানে যা করা হয়, সে-তুলনায় ব্রিটিশদের

অত্যাচার রীতিমত ছেলেখেলা।'

সাদা হয়ে গেছে রোজামুণ্ডের চেহারা। বলল, 'ছেড়ে দাও ওকে! তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ, অলিভার!'

'এখনও কিছুই দেখোনি।' ভাইকে ছেড়ে দিয়ে তালি বাজাল অলিভার। 'কী দিয়ে শুরু করব, লায়োনেল? আঙুলের ফাঁকে আগুন ধরিয়ে দেব? নাকি জ্বলন্ত দুটো বালা পরাব দু'হাতে?'

পাগড়িপরা একটা ছায়ামূর্তি উদয় হলো ঝুলবারান্দায়।

লায়োনেলের চুল ধরে ওদিকে মুখ ঘোরাল অলিভার। বলল, 'তাকাও ওর দিকে। ভাল করে তাকাও! চিনতে পারো ওকে?'

লায়োনেলের শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল।

হাসল অলিভার। 'হ্যাঁ, ও-ই জ্যাসপার লেই। সেই লোক, যাকে তুমি টাকা দিয়েছিলে আমাকে অপহরণ করবার জন্য... আমাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেবার জন্য। কপাল খারাপ, কাজটা শেষ করতে পারেনি বেচারা। তার আগেই স্প্যানিয়ার্ডদের হাতে ধ্বংস হয়ে যায় ওর জাহাজ, আমার সঙ্গে ধরা পড়ে ওদের হাতে। বহু ঘাটে জল খাবার পর অবশেষে ওকে আমি বাগে পেয়েছি। এখন ও আমার দলে যোগ দিয়েছে ক্ষমা পাবার আশায়।' রোজামুণ্ডের দিকে তাকাল ও। 'চাইলে জ্যাসপারের মুখে সব শোনাতে পারি তোমাকে, কিন্তু যা একগুঁয়ে স্বভাব তোমার; বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। তাই লায়োনেলের মুখ থেকেই সব শোনাব তোমাকে। লেই, আলিকে বলো এক জোড়া লোহার বালা যেন আগুনে গরম করে দেয়। আশা করি আমার ভাইয়ের মুখ খোলানোর জন্য ওগুলোই যথেষ্ট হবে।'

মাথা নুইয়ে চলে গেল লেই।

'দেখা যাক, স্বীকারোক্তি না দিয়ে কেমন করে থাকো তুমি,' লায়োনেলকে বলল অলিভার।

'কিচ্ছু স্বীকার করব না আমি,' জেদী গলায় বলল লায়োনেল। 'অত্যাচার করে বড়জোর আমাকে দিয়ে মিথ্যে বলিয়ে নিতে পারবে তুমি।'

'মিথ্যে বলানোর জন্য তো অত্যাচারের প্রয়োজন নেই। ওটা তোমার মুখ দিয়ে এমনিতেই বৃষ্টির মত ঝরে। আমরা শুনব সত্যটা... বিস্তারিতভাবে! রোজামুণ্ডকে তুমি খুলে বলবে, সেই রাতে কীভাবে তুমি মালপাসে যাবার পথে ঘাপটি মেরে ছিলে। পিটার ওখানে পৌঁছুনোমাত্র কীভাবে পিছন থেকে ওর উপর হামলা চালিয়েছিলে...'

'না! অমন কিছু ঘটেনি!'

তা অলিভারও জানে। কিন্তু ইচ্ছেকৃতভাবে ফাঁদ পেতেছে ও। লায়োনেলের আঁতে ঘা দিয়ে সত্য কথা বলিয়ে নেবার মতলব। ওর ভাই ধূর্ত হতে পারে, কিন্তু এখন ও-ও কম ধূর্ত নয়।

'ঘটেনি মানে!' বলল অলিভার। 'আলবত ঘটেছে! খামোকা অত্যাচার সইতে যেয়ো না, লায়োনেল। আমাকে যা যা বলেছিলে, সেগুলোই বলো রোজামুণ্ডকে। তলোয়ার বাগিয়ে ঝোপের পিছনে বসে ছিলে তুমি, তাই না? পিটার পৌঁছুনোমাত্র ছুটে গিয়েছিলে পিছন থেকে, ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই তলোয়ার বিঁধিয়ে দিয়েছিলে পিঠে।' জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল। 'আহা রে! বেচারা খাপ থেকে নিজের তলোয়ারটাও বের করতে পারেনি।'

'তুমি যে মিথ্যে কথা বলছ, তা তো এমনিতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।' বলল লায়োনেল। 'পিটারের লাশের পাশে পড়ে ছিল ওর তলোয়ার। খাপ থেকে বের করতে না পারলে ওটা ওখানে পড়ল কী করে?'

মাথা নাড়ল অলিভার। 'ও মারা যাবার পর তুমিই ওটা বের করে মাটিতে ফেলেছ। কাউকে বুঝতে দিতে চাওনি, ওকে তুমি পিছন থেকে খুন করেছ।'

অভিযোগটা পুরুষত্বের চরম অপমান। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লায়োনেল, 'যিশুর কিরে, মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছ তুমি! আমি ওকে ন্যায্য সুযোগ দিয়েছিলাম...'

এটুকু বলেই থেমে গেল সে। আচমকা টের পেয়েছে, উত্তেজনার বশে কী বলে ফেলেছে। রোজামুণ্ডের দৃষ্টি ততক্ষণে বিস্ফারিত হয়ে গেছে। অলিভারের ঠোঁটে ফুটে উঠেছে বিজয়ের ক্ষীণ হাসি। হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল লায়োনেল।

'থামলে কেন?' বলল অলিভার। 'ন্যায্য লড়াইয়ের প্রমাণটাও দাও! বলো, পিটারের তলোয়ারে আহত হয়েছিলে তুমি। বাড়ি পর্যন্ত চলে যাওয়া রক্তের দাগই তো তোমার সাহসিকতার প্রমাণ!'

নীরবতা নেমে এল।

'লায়োনেল!' অবশেষে চেঁচিয়ে উঠল রোজামুণ্ড। এক পা এগোল ও, আবার পিছাল। 'এ... এসব কি সত্যি?'

'কেন, নিজের কানেই কি শোনোনি ওর কথা?' বিদ্রূপ করল অলিভার।

দুলতে শুরু করল রোজামুণ্ডের দেহ। একবার লায়োনেল, আরেকবার অলিভারের দিকে তাকাচ্ছে। চেহারায় প্রকট হয়ে উঠছে বেদনা। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল অলিভার, মনে হচ্ছে জ্ঞান হারাবে মেয়েটা, তেমন কিছু ঘটলে ধরে ফেলবে। কিন্তু অজ্ঞান হলো না রোজামুণ্ড, কাঁপা কাঁপা পায়ে ডিভানের কাছে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল। মুখ ঢাকল দু'হাতে।

'ঈশ্বর ক্ষমা করুন আমাকে!' ফুঁপিয়ে উঠল ও।

লায়োনেল খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রোজামুণ্ডের দিকে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে কাছে গেল। বাধা দিল না অলিভার, এবার ও দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ওর, লায়োনেল এবার আরও ভালমত ফাঁসবে... রোজামুণ্ডকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে।

'রোজামুণ্ড!' হাহাকার করে উঠল লায়োনেল। 'দয়া করো! ভুল বুঝো না আমাকে। একটু ব্যাখ্যা করতে দাও ব্যাপারটা!'

'বলো, বলো!' ফোড়ন কাটল অলিভার। 'দেখা যাক, নতুন কী কাহিনি ফেঁদেছ তুমি।'

খোঁটায় কাজ হলো, শেষ প্রতিরোধও চূর্ণ হলো লায়োনেলের। বলল, 'রোজামুণ্ড, ও যা বলছে, তার একটা বর্ণও সত্যি নয়। পিটারকে পিছন থেকে খুন করিনি আমি। যা করেছি, তা সম্পূর্ণ আত্মরক্ষার খাতিরে। হ্যাঁ, ঝগড়া হয়েছিল আমাদের... বিশেষ একটা ব্যাপার নিয়ে। কপাল খারাপ, সেদিন রাতে দেখা হয়ে যায় আমাদের। আমাকে অপমান করতে শুরু করে পিটার। শেষ পর্যন্ত তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করে বসে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমিও তলোয়ার বের করি। লড়াই হয় আমাদের, তাতে ও...' আকুতি ফুটল কণ্ঠে। 'বিশ্বাস করো, এ-ই আসল ঘটনা। তোমার সামনে হাঁটু গেড়ে কসম কাটছি আমি!'

'থামো! থামো তুমি!' চরম ঘৃণা নিয়ে বলল রোজামুণ্ড।

'না, আমাকে বলতে দাও। পায়ে পড়ি, আমার কথা শোনো। দয়া করো আমাকে!'

'দয়া! কীসের দয়া?'

'পিটারের মৃত্যুটা ছিল দুর্ঘটনা। বিশ্বাস করো, ওকে খুন করবার কোনও ইচ্ছে ছিল না আমার। আমি শুধু নিজের প্রাণ

বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু লড়াইয়ের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা খুব কঠিন, উত্তেজনার বশে অনেক কিছুই ঘটে যায়... আমার বেলাতেও তা-ই ঘটেছে। পুরোটাই একটা দুর্ঘটনা!'

চোখ মুছল রোজামুণ্ড। কঠিন হয়ে উঠল চেহারা। 'আর পরে যা ঘটেছে? ভাইকে খুনি বানিয়েছ সবার চোখে... সেটাও কি দুর্ঘটনা?'

মাথা নিচু করে ফেলল লায়োনেল। 'বড্ড ভুল হয়ে গেছে আমার, রোজামুণ্ড। ভালবাসার খাতিরে নাহয় ক্ষমা করো আমাকে...'

'খবরদার! ভালবাসার কথা উচ্চারণ করবে না তোমার ওই নোংরা মুখে!'

'কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালবাসি! আমার ভুলটুকুর চেয়ে ভালবাসার ওজন কি বেশি নয়?'

'ভালবাসার ওজন বেশি? তোমার মিথ্যেবাদিতা, নীচতা আর বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে? হায় ঈশ্বর! কী বলছ তুমি!'

'তা হলে নাহয় নিজের মহত্ত্ব দিয়েই ক্ষমা করো আমাকে...'

'এবার তুমি রোজামুণ্ডকে বিরক্ত করছ, লায়োনেল!' গমগম করে উঠল অলিভারের গলা। 'আমাকেও! পারলে ব্যাখ্যা করো, আমাকে অপহরণ করিয়েছিলে কেন? কেন জ্যাসপার লেইকে নির্দেশ দিয়েছিলে আমাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে? আছে কোনও জবাব? না থাকলে এখানেই থামাও তোমার মায়াকান্না। সত্যিকার পুরুষের মত কৃতকর্মের ফল ভোগ করবার জন্য তৈরি হও।'

জ্যাসপার লেইয়ের গলা খাঁকারি শোনা গেল। ফিরে এসেছে সে। জানাল, গরম লোহার বালা নিয়ে আসছে আলি।

'ওসবের আর দরকার নেই।' অলিভার বলল। 'এই

দাসটাকে নিয়ে যাও। আলিকে বলবে, কাল সকালে আমার জাহাজের মাল্লাদের মাঝে আমি ওকে শেকল পরা অবস্থায় দেখতে চাই।'

'না! যাব না আমি!' বলল লায়োনেল। 'রোজামুণ্ড, মানা করো ওকে।'

কিচ্ছু বলল না রোজামুণ্ড, মুখ ফিরিয়ে নিল। ঘাড় ধরে লায়োনেলকে দাঁড় করাল লেই। তারপর ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। একটু পরেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল ওরা। ঝুলবারান্দায় রয়ে গেল শুধু অলিভার আর রোজামুণ্ড।

বারো

ফানযিলাহ্-র কৌশল

ডিভানের উপর শরীর কুঁকড়ে রেখেছে রোজামুণ্ড, মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদছে। ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল অলিভার, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উল্টো ঘুরল। প্যারাপেটের পাশে গিয়ে বাইরে দৃষ্টি ফেলল ও। চাঁদের আলোয় স্নান করছে কসবাহ নগরী। দূরে কোথাও ডেকে উঠল একটা নিশাচর পাখি। তার সঙ্গে তাল মেলাল একদল ব্যাঙ।

অবশেষে প্রকাশ পেয়েছে সত্য। রোজামুণ্ডের মুখের উপর ছুঁড়ে দিতে পেরেছে অলিভার সেই সত্যকে। কিন্তু যতটা আনন্দ

অনুভব করবে ভেবেছিল, তা করছে না। বরং মন ভারী হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারছে, প্রতিহিংসার নেশায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল ও। তাই বিজয়টা তেতো ঠেকছে জিভে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল অলিভার। তারপর ফিরে এল ডিভানের কাছে। রোজামুণ্ডের উদ্দেশে বলল, 'সবই তো শুনলে! আমি খুশি যে অত্যাচার ছাড়াই সত্যটা বলে দিয়েছে লায়োনেল। নইলে হয়তো বিশ্বাস করতে না তুমি।' একটু থামল ও রোজামুণ্ডের জবাব শোনার জন্য। কিন্তু মেয়েটা নীরব থাকায় আবার মুখ খুলল। 'আমাকে ফেলে ওকেই বিয়ে করতে যাচ্ছিলে তুমি! আমার উপর বিশ্বাস না রেখে কতবড় ভুল করেছ, তা আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার।'

ডিভান থেকে মাথা তুলল রোজামুণ্ড। রূঢ় গলায় বলল, 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি তোমাদের দু'জনের মধ্যে পার্থক্য কত সামান্য! আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল, রক্তের সম্পর্কের দুই ভাইয়ের স্বভাব-চরিত্র আলাদা হতে পারে না। এখন সেসব জানছি আমি... খুবই খারাপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।'

ওর এই কথা শুনে আবার রেগে গেল অলিভার, দূর হয়ে গেল মনের আর্দ্রতা। 'কী বললে তুমি?'

'ভুল কিছু বলেছি? এতদিন মূর্খ ছিলাম, এখন পুরুষের মন-মানসিকতা সম্পর্কে জানতে শুরু করেছি আমি।'

ঠোঁট বেঁকে গেল অলিভারের। 'আশা করি এই জ্ঞান তোমার ভিতরে সেই তিক্ততা জাগিয়ে তুলবে, যা তোমার মন-মানসিকতা আমার ভিতরে জাগিয়েছিল। আমি ভেবে পাই না, কাউকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসলে একটা মেয়ে তার সম্পর্কে মিথ্যে অপবাদ বিশ্বাস করে কী করে?'

'করুণা ভিক্ষা আশা করছ আমার কাছে? তা হলে

প্রার্থনা—আমাকে পুরনো লজ্জার কথা মনে করিয়ে দিয়ো না।'

'কোন্ লজ্জা? তোমার বিশ্বাসহীনতার? নাকি আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করবার?'

'ওসবের কোনোটাই না। আমার একমাত্র লজ্জা হচ্ছে, কোনোদিন তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম। এরচেয়ে বড় লজ্জা আর কিছু নেই... এমনকী দাস-বাজারে পশুর মত বিক্রি হওয়াটাও নয়! মানুষ নও তুমি, পিশাচ। আমার অসহায়ত্ব, আমার অনিচ্ছাকৃত ভুলের কথা জানবার পরেও কষ্ট দিয়ে চলেছ পুরনো স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে!'

'এ তো কিছুই না। তোমার অপরাধ অনেক বড়। আমার জীবনের অনেকগুলো বছর নষ্ট হয়ে গেছে, মোড় ঘুরে গেছে জীবনের, সবকিছু হারিয়েছি, পরিণত হয়েছি ঘৃণিত এক জলদস্যুতে... এসবের জন্য তুমিই দায়ী।'

'আমি দায়ী?' শীতল গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'আমার কারণে এসব জুটেছে তোমার কপালে?'

'নয়তো কী? যদি ওভাবে মুখ ফিরিয়ে না নিতে তুমি, মিথ্যে অভিযোগে কান না দিতে, বিশ্বাস রাখতে আমার উপর... তা হলে ঘটনা অন্যরকম হতে পারত। লোকের চোখে খুনি সাব্যস্ত হতাম না আমি, লায়োনেলও সুযোগ পেত না আমার পিঠে ছোরা বসানোর। বরং ও-ই ঝুলত ফাঁসিতে।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রোজামুণ্ড। 'তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কিছুই বুঝতে চাও না। হ্যাঁ, স্বীকার করছি—পিটারের খুনি নও তুমি, সেটা আজ প্রমাণ করেছ। কিন্তু পাশাপাশি আরও কী প্রমাণ করেছ, জানো? প্রমাণ করেছ যে, খুনির চেয়েও ভয়ঙ্কর তুমি... মানবহত্যার চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ করতে পারো অবলীলায়। তোমার অন্ধকার দিক আজ প্রকাশ পেয়ে গেছে,

অলিভার। আজ আমি স্বচক্ষে দেখেছি, প্রতিহিংসা আর ঘৃণায় ভরা কত বড় একটা অমানুষ তুমি!' উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল ও। 'কর্নওয়ালের এক ভদ্রঘরের খ্রিস্টান ছিলে তুমি, অলিভার। অথচ আজ পরিণত হয়েছ এক ধর্মত্যাগী বিবেকহীন দস্যুতে। কেন? শুধুই প্রতিশোধ নেবার জন্য। হিংসার সামনে ঈশ্বরকে ত্যাগ করেছ তুমি।'

ওর ক্রুদ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল অলিভার, একটুও ঘাবড়াল না। রোজামুণ্ডের কথা শেষ হলে বলল, 'মেয়েরা নাকি সবকিছু বুঝতে পারে। মন দেবার আগে আমার এতসব খুঁত তুমি ধরতে পারোনি বুঝি? বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার! থাক, ফালতু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।' পায়ের শব্দ হওয়ায় ঘাড় ফেরাল ও। দু'জন ভৃত্য উদয় হয়েছে খাবারের থালা নিয়ে। 'এই তো, খাবার এসে গেছে। আশা করি তোমার যুক্তির চেয়ে ক্ষুধার জ্বালা বেশি।'

ডিভানের পাশের টেবিলের উপর থালা নামিয়ে রাখল ভৃত্যরা। রুটি আর মাংস নিয়ে এসেছে। সঙ্গে বোতল-ভরা খাওয়ার পানি। সালাম দিয়ে চলে গেল দুই ভৃত্য।

'খেতে এসো,' রোজামুণ্ডকে বলল অলিভার।

'খাবার চাই না আমি!' ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিল মেয়েটা।

শীতল দৃষ্টিতে তাকাল অলিভার। 'এখন থেকে তোমার চাওয়া-না-চাওয়ার কোনও দাম নেই, মেয়ে। মনিবের হুকুমমত চলতে হবে তোমাকে। খেতে বলছি, খাও।'

'না... খাব না আমি।'

'খাবে না? দাসীর মুখে অমন কথা শোভা পায় না। এসো বলছি!'

'পারব না, খেতে পারব না আমি।'

'দাসী যদি মনিবের হুকুম মানতে না পারে, তা হলে তার মৃত্যু অনিবার্য,' হুমকি দিল অলিভার।

'তা হলে মেরেই ফেলো আমাকে!' ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল রোজামুণ্ড। 'মানুষ খুন করায় তো অভ্যস্ত হয়ে উঠেছ। আমাকে খুন করলে ধন্য হব।'

'ভেবো না আমার হাত কাঁপবে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল অলিভার। 'দরকার হলে অবশ্যই তোমার প্রাণ নেব আমি। তবে সেটা নিজের ইচ্ছেয়, তোমার ইচ্ছেয় নয়। তুমি আমার সম্পত্তি, না খেয়ে শুকিয়ে গেলে আমারই ক্ষতি। খেতে বসো। নইলে চাবুকপেটা করে খাওয়ানো হবে।'

কয়েক মুহূর্ত উদ্ধতের মত দাঁড়িয়ে রইল রোজামুণ্ড। কিন্তু অলিভারের পাথরের মত মুখ দেখে বুঝতে পারল, মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত হার মানল ও। টেবিল থেকে তুলে নিল একটা থালা, তা দেখে মুচকি হাসি ফুটল অলিভারের ঠোঁটে।

টেবিলের উপর চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল রোজামুণ্ড। কিছু খুঁজছে। না পেয়ে অলিভারের দিকে তাকাল। বলল:

'ছুরি-চামচ কোথায়? নাকি চাইছ আমি খালি হাতে রুটি-মাংস ছিঁড়ে খাই?'

ভুরু কোঁচকাল অলিভার, সন্দিহান হয়ে উঠেছে। কণ্ঠ স্বাভাবিক রেখে বলল, 'রাসূলের নীতিতে ছুরি বা চামচের জায়গা নেই। আল্লাহ দুটো হাত দিয়েছেন সবাইকে, খাবার মুখে দেবার জন্য ওগুলোই যথেষ্ট।'

'রাসূলের কথা বলে মশকরা করছ নাকি? ওই নীতি আমি মানব কেন? আমি মুসলমান নই। খেতেই যদি হয়, অসভ্যের মত খাব না। খ্রিস্টান রীতিতে খাব।'

কাঁধ ঝাঁকাল অলিভার। কোমরের খাপ থেকে নিজের ছোরা

খুলে নিল, ওটা ছুঁড়ে দিল রোজামুণ্ডের দিকে। 'ঠিক আছে, আপাতত এ-ই দিয়ে কাজ চালাও।'

ছোরাটা হাতে তুলে নিল রোজামুণ্ড। বলল, 'যাক, ধন্যবাদ পাবার মত অন্তত একটা জিনিস দিয়েছ আমাকে।' বলেই ওটার ফলা তাক করল নিজের বুকের দিকে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল অলিভারের শরীরে। দ্রুত সামনে বাড়ল ও, সাপের মত ছোবল দিয়ে ধরে ফেলল মেয়েটার হাত। মোচড় দিয়ে বাধ্য করল ছোরাটা ফেলে দিতে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল রোজামুণ্ড। ছোরাটা কোমরের খাপে ঢুকিয়ে ফেলল অলিভার।

'ভেবেছ বিশ্বাস করেছি তোমাকে?' হাসিমুখে বলল ও। 'হার মেনে নেবার নাটক করছ, তা বুঝতে পারিনি? বোকা মেয়ে কোথাকার, আমাকে ধোঁকা দেয়া এত সহজ নয়। আমি স্রেফ তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। তাতে তুমি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছ।'

'তা হলে আমার ইচ্ছে তুমি জানতে পেরেছ,' গোঁয়ারের মত বলল রোজামুণ্ড। 'এ-জীবন আমি রাখব না!'

'সহজে সে-ইচ্ছে পূরণ হবে না।'

অগ্নিদৃষ্টি হানল রোজামুণ্ড। 'জীবন দেয়া কি খুব কঠিন? ছুরি ছাড়াও আরও অনেক কায়দা আছে। অনেক বড়াই করছ তুমি, অলিভার, আমার দেহ আর মনের মালিক ভাবছ নিজেকে। কিন্তু সত্যি কথা হলো, বাজার থেকে আমার দেহটাকেই শুধু কিনেছ তুমি... ওর উপর যত খুশি অত্যাচার চালাতে পারো, ব্যবহার করতে পারো যথেচ্ছভাবে। কিন্তু মন কখনও বিকোয় না, ওর উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই তোমার। আমার জীবন-মরণ তোমার হাতে বলে দাবি করছ... হাহ্, শুধু মরণটাই তুমি নিশ্চিত করতে পারো, জীবন নয়।'

ওর এই কথার উপযুক্ত জবাব দিতে যাচ্ছিল অলিভার, বাধা পেল হন্তদন্ত হয়ে ঝুলবারান্দায় নতুন একটা ছায়ামূর্তি উদয় হওয়াতে। মাথা ঘোরাতেই আলিকে দেখতে পেল। সে জানাল, এক মহিলা এসেছে নীচে, শাকের-আল-বাহারের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

'মহিলা?' বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল অলিভার। 'নাসরানি মহিলা?'

'জী না, হুজুর,' মাথা নাড়ল আলি। 'মুসলিম। বোরখা পরে এসেছে।'

'মুসলিম মহিলা! এখানে? অসম্ভব!'

ঠিক তখুনি বোরখা-পরা মহিলাটি সিঁড়ি থেকে বেরিয়ে এল ঝুলবারান্দায়।

ঝট্ করে তার দিকে ঘুরল আলি। 'অ্যাই! তোমাকে নীচে অপেক্ষা করতে বলেছি না? এখানে এসেছ কেন?' তাড়াতাড়ি ক্ষমা চাইল শাকেরের কাছে। 'মাফ করবেন, মালিক। বেটি আমার পিছু পিছু চলে এসেছে। তাড়িয়ে দেব?'

'থাকুক,' হাত নাড়ল অলিভার। 'তুমি যেতে পারো।'

কুর্নিশ করে বিদায় নিল আলি। নবাগতার মুখ খোলার অপেক্ষায় রইল অলিভার; কিন্তু আলির পায়ের আওয়াজ পুরোপুরি মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত নড়ল না সে। এরপর হাত তুলল মুখের কাছে; চুলের তলায় আটকানো বাঁধন খুলল, ফলে সরে গেল ঘোমটা। উদ্ভাসিত হলো পরিচিত একটা চেহারা।

চমকে উঠল অলিভার। নিজের অজান্তেই পিছিয়ে গেল এক পা। বলে উঠল, 'ফানযিলাহ! এসবের মানে কী?'

জবাব না দিয়ে হাসল ফানযিলাহ। শান্তভাবে ঘোমটা আবার বাঁধল মুখে। চেহারা লুকাল।

'আপনি এভাবে... আমার বাড়িতে এসেছেন কেন?' হতভম্ব গলায় বলল অলিভার। 'বাদশাহ্-র কানে যদি এ-খবর যায়, তা হলে কী ঘটবে ভেবে দেখেছেন? চলে যান... চলে যান এখুনি!'

'তুমি বা আমি যদি মুখ না খুলি, তা হলে বাদশাহ্-র কানে কিছুই পৌঁছুবে না,' ফানযিলাহ্ বলল। 'এত ভড়ং করবারও দরকার নেই। আমরা কেউই জন্মগত মুসলমান নই। পরপুরুষের সামনে যাবার অভিজ্ঞতা আছে আমার। তুমিও নিশ্চয়ই জীবনে বহু বেগানা নারী দেখেছ?'

'এটা আপনার জন্মভূমি সিসিলি নয়,' গম্ভীর গলায় বলল অলিভার। 'ওখানকার রীতি-রেওয়াজ এখানে অচল।'

হাত তুলে ওকে থামাল ফানযিলাহ্। 'বক্তৃতা দিয়ে আমাকে শুধু শুধু দেরি করাচ্ছ তুমি।'

'তা হলে তাড়াতাড়ি আপনার কাজ শেষ করে বিদায় হোন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সরাসরি কাজের কথা পাড়ল ফানযিলাহ্। রোজামুণ্ডকে ইশারা করে বলল, 'ব্যাপারটা তোমার ওই দাসীকে নিয়ে। আজ আমার এক অনুচরকে পাঠিয়েছিলাম বাজার থেকে ওকে কিনে নেবার জন্য...'

'আমি জানি,' বাধা দিয়ে বলল অলিভার।

'কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে আমার লোক। তুমি বাড়তি দাম হেঁকে কিনে নিয়েছ ওকে।'

'নতুন কিছু বলুন।'

'যা খরচ হয়েছে তোমার, সেটা যদি পুষিয়ে দিই, ওকে আমার কাছে বিক্রি করবে?'

'দুঃখিত, ফানযিলাহ্। মেয়েটা বিক্রির জন্য নয়।'

'দাঁড়াও, এখুনি শেষ কথা বলে দিয়ো না,' মরিয়ার মত বলে উঠল ফানযিলাহ্। 'জানি চড়া দাম দিয়েছ তুমি... মেয়েটা অমন

দামের উপযুক্তই বটে। আমারও ওকে খুব পছন্দ হয়েছে। আর পছন্দের জিনিস আমি নিজের দখলে রাখতে ভালবাসি। এক ধরনের ঝোঁক বলতে পারো। তাই একটা প্রস্তাব দিচ্ছি—তিন হাজার দিনার পাবে, ওকে তুলে দাও আমার হাতে।'

বিস্ময়ের বদলে এবার সন্দেহ ভর করল অলিভারের মনে। মতলব কী এই মহিলার? কী ফন্দি এঁটেছে সে রোজামুণ্ডকে নিয়ে?

'তিন হাজার দিনার দেবেন?' ভুরু নাচাল ও। 'কেন?'

'বললাম তো, ঝোঁক।'

'এত দামি একটা ঝোঁক ওঠার কারণ জানতে পারি?'

'ওর মালিক হতে চাই আমি,' কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল ফানযিলাহ্।

'কেন এমন ইচ্ছে জাগল, সেটাই তো জানতে চাইছি,' অলিভারের কণ্ঠ আশ্চর্যরকমের শান্ত।

'বড্ড বেশি প্রশ্ন করো তুমি,' একটু যেন রেগে গেল ফানযিলাহ্।

কাঁধ ঝাঁকাল অলিভার। হাসল। 'আর আপনি খুব কম জবাব দেন।'

মাপা দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করল ফানযিলাহ্। বোঝার চেষ্টা করল, অলিভারকে টলানো সম্ভব কি না।

'অতশত বুঝি না, শাকের,' শেষ পর্যন্ত বলল সে, 'তিন হাজার দিনারে মেয়েটাকে বিক্রি করবে কি না বলো।'

'এক কথায়... না।'

'করবে না? তিন হাজার দিনার কম মনে হচ্ছে?' বিস্ময় ফুটল ফানযিলাহ্-র গলায়।

'ত্রিশ হাজার দিলেও করব না,' চাঁছাছোলা ভঙ্গিতে বলে দিল

অলিভার। 'ও আমার সম্পত্তি; আর সম্পত্তিটা এখুনি হাতছাড়া করবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। খামোকা এ-নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সময়ই শুধু নষ্ট করবেন। তারচেয়ে চলে যান। আপনার উপস্থিতি আমাদের দুজনের জন্যই বিপজ্জনক।'

মেঘ জমল ফানযিলাহ্‌র চেহারায়। অলিভার নির্বিকার। নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা পরের কিছুটা সময়। দুজনের কেউই খেয়াল করল না, রোজামুণ্ড কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। আরবী না জানলেও ওদের হাবভাব দেখে বুঝে নিয়েছে ও আলোচনার বিষয়।

এক পা সামনে এগোল ফানযিলাহ্। 'বিক্রি করবে না?' হিসিয়ে উঠল সে অলিভারকে উদ্দেশ করে। 'এত নিশ্চিত হয়ো না, শাকের। তোমাকে বাধ্য করা হবে! আমি না, খোদ আসাদ করবেন। নিজেই আসছেন তিনি... মেয়েটাকে নেবার জন্য!'

'আসাদ?' চমকাল অলিভার।

'বাদশাহ্-র নাম ভুলে গেছ? আসাদ-আদ-দীনের কথা বলছি আমি! এখনও সময় আছে, আমার সঙ্গে সওদা করে লাভবান হও। বাদশাহ্-র কাছে এত দাম পাবে না।'

মাথা নাড়ল অলিভার। 'আপনাদের কারও সঙ্গেই সওদা করবার ইচ্ছে নেই আমার। বললাম তো, মেয়েটাকে বিক্রি করব না আমি।'

'ঠেকাতে পারবে আসাদকে?' খোঁচা মারা সুরে বলল ফানযিলাহ্। 'মেয়েটাকে উনি নিয়ে ছাড়বেন... বিক্রি করো, বা না-ই করো!'

'আচ্ছা!' চোখ ছোট হয়ে এল অলিভারের। 'এ-কারণেই ছুটে এসেছেন আপনি! মোটেই কৌশলী বলা যাবে না আপনাকে, ফানযিলাহ্। অল্পতেই সব ফাঁস করে দিলেন।

বাদশাহ্-র সুনজর আপনার উপর থেকে সরে গিয়ে এই নতুন দাসীর উপর পড়তে পারে, এই ভয় কাজ করছে আপনার মধ্যে। তাই বাদশাহ্-র হাত পড়বার আগেই ওকে সরিয়ে ফেলতে চাইছেন। ভুল বললাম?'

ঘোমটার কারণে চেহারা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ফানযিলাহ্-র পুরো শরীর রাগে কেঁপে উঠতে দেখল ও। খ্যাপাটে কণ্ঠে সে বলল, 'যদি ওটা সত্যও হয়, তাতে তোমার কী?'

'কিছুই না,' সোজাসাপ্টা ভাষায় বলল অলিভার। 'আপনার কপালে কী ঘটল না-ঘটল, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না।'

'ঘামানো উচিত,' আকুতি ঝরল ফানযিলাহ্-র গলায়। 'তোমার একজন বন্ধু আমি, শাকের। সবসময়ই ছিলাম। বাদশাহ্-র কাছে সবসময় প্রশংসা করেছি তোমার, আমার অনুরোধেই তোমাকে ধাপে ধাপে পদোন্নতি দিয়েছেন তিনি।'

'তা-ই?' সকৌতুকে বলল অলিভার।

'যত খুশি হাসো, কিন্তু সত্যি কথা বলছি আমি। আমি যদি না থাকি, তুমি তোমার সবচেয়ে বড় মিত্রকে হারাবে। আমার জায়গায় যে আসবে, সে তোমার প্রতি অনুরক্ত না-ও হতে পারে। এমন হতে পারে, মিথ্যে কথা বলে বলে তোমার ব্যাপারে বাদশাহ্-র মন বিষিয়ে তুলল সে! এই খ্রিস্টান মেয়েটার কথাই ধরো—দেশের মাটি থেকে ওকে অপহরণ করে এনেছ তুমি। এই মেয়ে কোনোদিন তোমাকে সহ্য করবে না। কোনোদিন কদর করবে না তোমার।'

'ওসব নিয়ে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে,' রুক্ষ গলায় বলল অলিভার। 'এই দাসী আমার। আসাদ ওকে কোনোদিনই পাবেন না।'

'বোকা কোথাকার! স্বেচ্ছায় যদি না দাও, বাদশাহ্ ওকে

কেড়ে নেবেন।'

তাচ্ছিল্য দেখা দিল অলিভারের চেহারায়। 'আমার কাছ থেকে যদি ওকে কেড়ে নিতে পারেন উনি; আপনার কাছ থেকে তো আরও সহজেই পারবেন। আমার ধারণা, সেটা আপনার জানাও আছে। আর সে-কারণে সিসিলিয়ান-সুলভ দুষ্ট কোনও ফন্দিও এঁটে রেখেছেন। ঠিক কী করতে চাইছেন, বলুন তো? বাদশাহ্ যখন জানবেন আপনার কীর্তির কথা, তখন কীভাবে বাঁচাবেন নিজেকে?'

'ওসবের পরোয়া করি না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ফানযিলাহ্। 'বাদশাহ্ কিছু টের পাবার আগেই বন্দরের পানির তলায় চলে যাবে মেয়েটার লাশ—পায়ে ভারী পাথর বাঁধা অবস্থায়। রেগে গিয়ে হয়তো চাবুকপেটা করবেন আমাকে তিনি, কিন্তু ওই পর্যন্তই। রাগ কমে যাবার পর আবার আমার কাছেই ফিরতে হবে তাঁকে।'

তীব্র এক ক্রোধ অনুভব করল অলিভার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এই মহিলা ঠাণ্ডা মাথায় রোজামুণ্ডকে খুন করতে চাইছে। তার টুঁটি চেপে ধরার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করল। বলল, 'ভাল চান তো এখুনি এখান থেকে চলে যান, ফানযিলাহ্। এই দাসীকে কারও হাতেই তুলে দেব না আমি। হোন তিনি আসাদ-আদ-দীন, বা খোদ শয়তান!'

শেষ কথা বলে দিয়েছে ও। কণ্ঠ শুনেই ফানযিলাহ্ বুঝতে পারল তা। নতুন কৌশল খাটাল সঙ্গে সঙ্গে—আগেই ঠিক করে রেখেছে এমনটা ঘটলে কী করবে।

'তা হলে একটাই পথ তোমার সামনে, শাকের,' বলল সে। 'বিয়ে করে ফেলো মেয়েটাকে... এবং খুব তাড়াতাড়ি। কারণ ওই একটা বাধাই শুধু ঠেকাতে পারবে বাদশাহ্কে। ধার্মিক

মানুষ তিনি; আর যা-ই করুন, কারও ঘরের বউকে তুলে নেবেন না। বরং পবিত্র এই বন্ধনকে শ্রদ্ধা দেখাবেন।'

'ওতে আপনার উদ্দেশ্যও সফল হবে, তাই না?' গম্ভীর হয়ে গেল অলিভার।

'অস্বীকার করছি না।'

হেসে উঠল অলিভার। 'আপনি কৌশলী নন—এ-কথা বলে বড্ড ভুল করেছি আমি। কৌশলী তো বটেই, সেইসঙ্গে সাপের মত ধূর্ত আপনি। ভাল একটা চাল দিয়েছেন—এক ঢিলে মারতে চাইছেন দুই পাখি! বিয়ে হলে মেয়েটা বাদশাহ্-র নাগালের বাইরে চলে যাবে... সেইসঙ্গে ওকে বিয়ে করায় বাদশাহ্ আমার উপরেও খেপে যাবেন! বাহ্, ভাল ফন্দি এঁটেছেন!'

'আমার পরামর্শের ভুল অর্থ করছ তুমি, শাকের। আমি শুধু বন্ধু হিসেবে...'

কথা শেষ হলো না ফানযিলাহ্-র। তার আগেই দূর থেকে ভেসে এল হাঁকডাক আর ঘোড়ার খুরের টগবগানি। প্যারাপেটের পাশে ছুটে গেল সে। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাল বাইরে। পরক্ষণে আতঙ্ক ফুটল কণ্ঠে।

'সর্বনাশ! আসাদ-আদ-দীন! এসে পড়েছেন উনি!'

অলিভারও তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দলবল নিয়ে এগোতে থাকা বাদশাহ্-র শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হুম, মনে হচ্ছে একটা অন্তত সত্য কথা বলেছেন আপনি। বাদশাহ্ সত্যি সত্যি আসছেন আমার বাড়িতে।'

ওর দিকে ফিরল ফানযিলাহ্। 'বাকি কথার সত্যতাও খুব শীঘ্রি টের পাবে তুমি। কিন্তু... কিন্তু আমার কী হবে? আসাদ যদি আমাকে এখানে দেখে ফেলেন, নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড দেবেন!'

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' বলল অলিভার। 'তবে এত

ভয় পাবারও কিছু নেই। বোরখা আছে আপনার গায়ে, চেহারা দেখা যাবে না। এক কাজ করুন, নীচে চলে যান। আঙিনার ছায়ার ভিতর লুকিয়ে পড়ুন। বাদশাহ্ যখন উপরে উঠবেন, তখন বেরিয়ে যেতে পারবেন বাড়ি থেকে। ধরে নিচ্ছি আর কোনও সঙ্গীসাথী আনেননি আপনি?'

'না,' মাথা নাড়ল ফানযিলাহ্। 'এখানে আসার খবর গোপন রাখতে চেয়েছি আমি। আশা করছি তুমিও মুখ খুলবে না।'

'নিশ্চিত থাকুন,' কথা দিল অলিভার। মহিলাকে অপছন্দ করলেও এক অর্থে তার সাহসের প্রশংসা করতে বাধ্য হচ্ছে। এত বছর বাদশাহ্-র হারেমে কাটাবার পরেও ফানযিলাহ্ তার সিসিলিয়ান বিদ্রোহী সত্তা পুরোপুরি বিসর্জন দেয়নি। চরম ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে স্বামীর বিরুদ্ধে, অক্ষুণ্ন রাখতে চাইছে স্ত্রী হিসেবে নিজের আসন—পদ্ধতি একটু অন্যরকম আর কী। তাই বলে এই প্রচেষ্টাকে দুয়ো দেয়া যায় না।

ঝুলবারান্দার দরজা দিয়ে বেরুনোর আগে থামল ফানযিলাহ্। ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি সত্যিই ওকে বিক্রি করবে না তো?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল অলিভার। 'নির্ভয়ে থাকুন।'

তেরো

বিয়ে

ফানযিলাহ্ চলে যাবার পর অপেক্ষা করতে থাকল অলিভার, কখন আলি এসে বাদশাহ্-র আগমনী বার্তা ঘোষণা করে। কিন্তু তেমনটা ঘটল না। আলি উপস্থিত হলো ঠিকই, তবে ঘোষণা দেবার জন্য নয়... পথ দেখাতে। ওর পিছু পিছু ঝুলবারান্দায় বেরিয়ে এলেন স্বয়ং আসাদ-আদ-দীন। নীচে অপেক্ষা করবার মত ধৈর্য হয়নি তাঁর।

'আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হোক তোমার উপর, শাকের-আল-বাহার,' অভিবাদন জানালেন বাদশাহ্।

'আপনার উপরেও, মহানুভব।' মাথা নুইয়ে সালাম দিল অলিভার। 'আপনার পদধূলি পড়ায় আমার গরীবখানা ধন্য হলো।' ইশারা করল আলিকে চলে যেতে।

'শুনে খুশি হলাম,' বললেন বাদশাহ্। 'কিন্তু আজ আমি এসেছি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইতে।'

'ছি, ছি, এসব কী বলছেন? চাইতে হবে কেন, আমার সবকিছু তো আপনারই সম্পত্তি।'

আসাদ-আদ-দীনের চঞ্চল দৃষ্টি অলিভারকে পেরিয়ে নিবদ্ধ হলো ডিভানে বসে থাকা রোজামুণ্ডের উপর। গম্ভীর গলায়

বললেন, 'ওই মেয়েটার জন্য এসেছি আমি। ইংল্যাণ্ড থেকে তোমার কুড়িয়ে আনা মুক্তো... ওকে খুব মনে ধরেছে আমার। তাই সামানিকে বলেছিলাম ওকে কিনে নিতে। কিন্তু গাধাটা ব্যর্থ হয়েছে। খবরটা পেয়ে প্রথমে খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, ভেবেছিলাম বুঝি দূরদেশের কোনও দাস-ব্যবসায়ীর কাছে হারিয়েছি ওকে। পরে যখন শুনলাম, আমার প্রিয় শাকের-আল-বাহার ওকে কিনে নিয়েছে, তখন দূর হয়ে গেল সব দুঃখ। আমি জানি, বাদশাহ্‌কে খুশি করবার জন্য তুমি সবকিছু ত্যাগ করবে। মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দাও, বাছা।'

দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলছেন বাদশাহ্। তাঁকে কীভাবে হতাশ করবে, ভেবে পেল না অলিভার। দ্বিধান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তাই।

'তোমার ক্ষতি পুষিয়ে দেব আমি,' বললেন আসাদ। 'ষোলোশ' দিনার খরচ করেছ তো? তার সঙ্গে আরও পাঁচশো পাবে ক্ষতিপূরণ বাবদ। তাড়াতাড়ি জবাব দাও, আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছি।'

মলিন হাসি ফুটল অলিভারের ঠোঁটে। 'এই মেয়েটার ব্যাপারে আমিও আপনার মতই অধৈর্য, মালিক। পাঁচ-পাঁচটা বছর ওর কথা ভেবে জ্বলেছি আমি। শেষ পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছি সুদূর ইংল্যাণ্ডের মাটিতে। আপনি আমার মনের অবস্থা জানেন না, মহানুভব, জানলে...'

'আরে! তুমি দেখছি পাকা ফেরিঅলা!' বলে উঠলেন আসাদ। 'অবশ্য বুদ্ধির খেলায় কেউ যে তোমার সমতুল্য নয়, তা তো জানিই। ঠিক আছে, ইচ্ছেমত দাম হাঁকো। যা লাভ চাও, তা-ই পাবে। আমি আর সময় নষ্ট করতে রাজি নই।'

'প্রশ্নটা লাভ-ক্ষতির নয়, মালিক,' শান্তস্বরে বলল অলিভার।

'মেয়েটাকে বিক্রি করব না আমি।'

চোখ পিট পিট করলেন বাদশাহ্, হতবাক হয়ে গেছেন। মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

'ব্... বিক্রি করবে না?' বিস্ময়ে কথা আটকে গেল তাঁর।

'দাম হিসেবে আপনার পুরো বাদশাহী-ও যদি দিতে চান, তবু না,' বলল অলিভার। অস্বাভাবিক দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে কণ্ঠে। 'অন্য যে-কোনও কিছু চান, আমি আপনার পায়ে সমর্পণ করব আনুগত্য আর ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে।'

'কিন্তু আমি যে আর কিছুই চাই না,' অস্থিরতা প্রকাশ পেল আসাদের গলায়। সেইসঙ্গে উষ্মা। 'আমি শুধু ওই দাসীকে চাই।'

'তা হলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হচ্ছি আমি। অনুরোধ করছি আপনার দৃষ্টি ওর উপর থেকে সরিয়ে নিতে।'

খেপে গেলেন বাদশাহ্। 'ফিরিয়ে দিচ্ছ তুমি আমাকে?'

'আমার দুর্ভাগ্য!'

নীরবতা নেমে এল খানিকক্ষণের জন্য। মেঘ জমল বাদশাহ্‌র চেহরায়, আগুন জ্বলে উঠল দু'চোখের তারায়। একটু পর যখন মুখ খুললেন, কণ্ঠে মৃত্যুর শীতলতা। 'আচ্ছা, ব্যাপার তা হলে এ-ই? যতটা ভেবেছিলাম, ফানযিলাহ্-র কথায় দেখছি তারচেয়ে বেশি সত্যতা আছে! হুম!' অগ্নিদৃষ্টি হানলেন তিনি অবাধ্য কর্সেয়ারের দিকে।

'দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

অলিভারের কথায় প্রভাবিত হলেন না আসাদ। চাপা ক্ষোভের সুরে বললেন, 'ভাল করে ভেবে দেখো, শাকের-আল-বাহার, কে তুমি... কে তোমাকে আজকের অবস্থানে এনেছে। আমার এই দু'হাত দিয়ে ধনী বানিয়েছি তোমাকে,

আমার দয়ায় কর্সেয়ার-বাহিনীর সেনাপতি হয়েছ তুমি। পুরো আলজিয়ার্সে আমার পরেই তোমার স্থান। অথচ কৃতার্থ হবার বদলে কী করছ তুমি? এতদিনে একটামাত্র জিনিস চেয়েছি তোমার কাছে, সেটাই দিতে রাজি হচ্ছ না! অকৃতজ্ঞতারও একটা সীমা থাকা উচিত।'

'যদি জানতেন এর সঙ্গে আমার কতকিছু...'

'কিছুই জানার প্রয়োজন নেই আমার,' গর্জে উঠলেন আসাদ-আদ-দীন। 'আমার ইচ্ছের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনও কিছুই হতে পারে না।' শান্ত হলেন পরমুহূর্তে। একটা হাত রাখলেন শাকেরের চওড়া কাঁধে। 'থাক, আর রাগারাগি করব না। ঝোঁকের মাথায় নাহয় একটা ভুল করে ফেলেছ। তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি আমি, সে-কারণে সব ভুলে যেতে রাজি আছি।'

'ভালই যদি বাসেন আমাকে, তা হলে দয়া করে মেয়েটার কথা মুছে ফেলুন আপনার হৃদয় থেকে।'

'এখনও প্রত্যাখ্যান করছ?' আবার কর্কশ হয়ে উঠল বাদশাহ্-র কণ্ঠ। 'সাবধান শাকের, ভুলে যেয়ো না আমি কে। ধুলো থেকে উঠিয়ে এনেছি তোমাকে, আবার মিশিয়ে দিতে পারি সেই ধুলোতেই। দাসত্বের যে-শেকল থেকে মুক্ত করেছি তোমাকে, আবার সেই শেকলই পরিয়ে দিতে পারি চোখের পলকে!'

'অবশ্যই পারেন,' স্বীকার করল অলিভার। 'কিন্তু তারপরেও নিজের সম্পত্তি আঁকড়ে ধরে রাখব আমি। এই দাসীকে আমিই জোগাড় করেছি, কিনেও নিয়েছি ন্যায্য দাম দিয়ে। এর উপরে আমার চেয়ে বেশি অধিকার আর কারও নেই। দয়া করুন, মালিক...'

'আমি যদি ওকে ছিনিয়ে নিতে চাই?' হুমকি দিলেন আসাদ।

'প্রাণ থাকতে তা হতে দেব না আমি,' শান্ত গলায় বলল অলিভার।

'কী!' চেঁচিয়ে উঠলেন বাদশাহ্। 'অকৃতজ্ঞ কুকুর কোথাকার! তুমি আমাকে বাধা দেবে?'

'আল্লাহ্-র কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেন আমাকে অমন লজ্জাজনক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য না করেন।'

'এটাই তোমার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ, তবে তার সঙ্গে যোগ করতে চাই—আমি আপনার দাস, হে আসাঁদ।'

ক্রুদ্ধচোখে অলিভারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন বাদশাহ্। তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন ঝুলবারান্দা থেকে। শোনা গেল তাঁর হুমকি, 'দেখে নেব!'

মূর্তির মত তাঁর গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল অলিভার, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরল। দেখল, রোজামুণ্ডের দৃষ্টি সেঁটে আছে ওর উপর। কী বলবে ভেবে পেল না, মাথা নামিয়ে একপাশে সরে গেল ও। ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করা দরকার। ভয়ানক একটা কাজ করেছে—বিরুদ্ধাচরণ করেছে আসাদ-আদ-দীনের। খুব যে ভেবে-চিন্তে করেছে, তা নয়। মনের ভিতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে বিদ্রোহ। বাদশাহ্-র হারেমের রক্ষিতা হিসেবে ভাবতেই পারেনি রোজামুণ্ডকে। বুঝতে পারছে অলিভার, রোজামুণ্ডের প্রতি ওর ভালবাসা এখনও মিলিয়ে যায়নি। গেলে এমন উত্তাল হয়ে উঠত না হৃদয়, বরং বাদশাহ্-র হাতে ওকে তুলে দিয়ে শাস্তির ষোলোকলা পূর্ণ করত।

আপন চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল অলিভার, সংবিৎ ফিরে পেল রোজামুণ্ডের তীক্ষ্ণকণ্ঠের প্রশ্ন শুনতে পেয়ে।

'ওঁকে ফিরিয়ে দিলে কেন?'

বিস্মিত হয়ে উল্টো ঘুরল অলিভার। 'তুমি আমাদের কথা বুঝতে পেরেছ?'

'প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট,' ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে বলল রোজামুণ্ড। 'কেন ফেরালে ওঁকে?'

ওর দিকে এগিয়ে গেল অলিভার। 'কেন জানতে চাইছ?'

'বোঝার চেষ্টা করছি তোমাকে। ব্যাপার কী, নিজের হাতে আমাকে শায়েস্তা করবার জন্য উতলা হয়ে পড়েছ? অন্য কারও হাতে শাস্তি পেলে তাতে মন ভরবে না?'

চেহারায় তিক্ততা ফুটল অলিভারের। 'আমার কাজের এমন অর্থ করা তোমাকেই মানায়।'

'আমি শুধু সম্ভাবনার কথা বলেছি। অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে। সেজন্যেই জানতে চাইছি।'

'ধারণা করতে পারো, বাদশাহ্-র কবলে পড়লে কী দশা হতে পারে তোমার?'

শরীর একটু কেঁপে উঠল রোজামুণ্ডের। নামিয়ে নিল চোখ। নিচু গলায় বলল, 'শাকের-আল-বাহারের কবলে পড়ার চেয়ে খুব কি খারাপ হবে সেটা?'

'যদি বোঝাতে চাও যে, আমার আর বাদশাহ্-র মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতে পাও না তুমি, তা হলে খামোকাই তাঁকে বাধা দিয়েছি আমি।' অলিভার বলল। 'চাইলে যেতে পারো ওঁর কাছে। কিন্তু জেনে রাখো, আমি প্রতিশোধের নেশায় আপত্তি জানাইনি, আপত্তি জানিয়েছি শুধু তোমার মঙ্গলের জন্য। হারেমে তোমাকে কল্পনা করতেই শিউরে উঠেছি আমি।'

'নিজের কথা ভাবলেও ওভাবেই শিউরে ওঠা উচিত।'

মুখ ঘোরাল অলিভার। নিচু গলায় বলল, 'হয়তো উচিত...

সত্যিই হয়তো উচিত।'

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল রোজামুণ্ড। কড়া গলায় কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু সুযোগ পেল না। আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছে অলিভার।

'হায় খোদা!' বলে উঠল ও। 'এটাই দরকার ছিল আমার চোখ খুলে দেবার জন্য। আমাকে বোঝানোর জন্য—কত নিকৃষ্ট একটা কাজ করেছি আমি। প্রতিহিংসা আমাকে পরিচালিত করেছে, কিন্তু বাদশাহ্ পরিচালিত হচ্ছেন তারচেয়েও খারাপ একটা রিপুর তাড়নায়। না, ওঁর হাতে তোমার সর্বনাশ হতে দেব না আমি!'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রোজামুণ্ড, এগোল অলিভারের দিকে, অদ্ভুত এক দোলায় দুলছে ওর হৃদয়। চেহারাতেই প্রকট হয়ে উঠেছে দ্বিধাদ্বন্দ্বের ছাপ। কিন্তু অলিভার সেটা খেয়াল করল না। ওর দিকে ফিরে বলল:

'একটাই পথ আছে... ফানযিলাহ্-র দেখিয়ে দেয়া পথ।' একটু ইতস্তত করল ও। 'আমাদের বিয়ে হতে হবে!'

যেন আঘাত করা হয়েছে, এই ভঙ্গিতে এক পা পিছিয়ে গেল রোজামুণ্ড। চমকে উঠে বলল, 'বিয়ে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল অলিভার। তারপর ব্যাখ্যা করল, এক মুসলিমের স্ত্রীর দিকে অন্য মুসলিমের দৃষ্টি দেয়াও ভয়ানক অন্যায়। খাঁটি ধার্মিক আসাদ-আদ-দীন কিছুতেই এমন অন্যায় করবেন না। 'একমাত্র এভাবেই তোমাকে ওঁর থাবা থেকে বাঁচাতে পারব আমি।'

রোজামুণ্ড ওর কথায় প্রভাবিত হলো না। শান্ত গলায় বলল, 'খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চাইছ তুমি, অলিভার। কিন্তু দুঃখিত, এ বিয়ে আমি করতে পারব না।'

'করতেই হবে!' জোর গলায় বলল অলিভার, একটু রেগে গেছে। 'নইলে আজ রাতেই বাদশাহ্-র হারেমে যেতে হবে তোমাকে। তাও স্ত্রী হিসেবে নয়, ক্রীতদাসী হিসেবে! ওহ্, বিশ্বাস করো আমাকে... অন্তত নিজের জন্য! বিশ্বাস তোমাকে করতেই হবে!'

'বিশ্বাস?' যেন হেসে উঠল রোজামুণ্ড। 'তোমাকে? ধর্মত্যাগী একজন জলদস্যুকে বিশ্বাস করি কীভাবে, বলতে পারো?'

নিজেকে সামলাল অলিভার। মেয়েটাকে বোঝাবার জন্য শান্ত থাকা প্রয়োজন ওর। বলল, 'তুমি পাষাণীর মত কথা বলছ, রোজামুণ্ড। আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার সময় এড়িয়ে যাচ্ছ অতীতকে। মিথ্যে খুনের দায়ে ফাঁসানো হয়েছিল আমাকে, অপহরণ করে দাস বানানো হয়েছিল... এই দুনিয়ায় যাদেরকে আমি আপন বলে ভাবতাম, তারাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল আমার সঙ্গে। সেসবেরই ফলাফল আজকের আমি। মানুষ আর ঈশ্বরের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম। হ্যাঁ, মুসলমান হয়েছি আমি, ধর্মত্যাগ করে জলদস্যুতা বেছে নিয়েছি... কিন্তু এ-সবই করেছি আর কোনও দরজা খোলা ছিল না বলে, শেকল-পরা মাল্লার দুর্বিষহ জীবন থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ছিল বলে!' দুঃখ ভর করল ওর চেহারায়। 'এতসব জানবার পরেও তুমি ক্ষমা করতে পারছ না আমাকে?'

কাঁপন উঠল রোজামুণ্ডের বুকে। কণ্ঠের রূঢ়তা হারিয়ে গেল, রইল কেবল ক্ষোভ। দুখি গলায় বলল, 'যত অবিচারই হোক তোমার প্রতি; তাই বলে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে পারো না। অনেক নীচে নেমে গেছ তুমি, অলিভার। এ-অবস্থায় আর যা-ই করি, তোমাকে বিশ্বাস করতে পারব না আমি।'

মাথা হেঁট হয়ে গেল অলিভারের। রোজামুণ্ডের কথাগুলো

অন্তরে বিঁধেছে। ম্লান গলায় ও বলল, 'আমি জানি। তবুও তোমাকে আজ মিনতি করছি আমার উপর বিশ্বাস রাখার জন্য। আমার জন্য নয়, তোমার নিজের জন্য। প্রমাণ চাও?' খাপমুক্ত করে ছোরাটা আবার ও বাড়িয়ে ধরল রোজামুণ্ডের দিকে। 'রাখো এটা তোমার কাছে। আমার তরফ থেকে কোনও ধরনের বেঈমানীর আভাস পেলেই ব্যবহার কোরো এটা—নিজের বুকে, বা আমার বুকে!'

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল রোজামুণ্ড, তারপর নিজের হাতে নিল ছোরাটা।

'ভয় হচ্ছে না তোমার,' বলল ও, 'এখুনি এটা ব্যবহার করতে পারি আমি?'

'তোমাকে বিশ্বাস করছি আমি,' বলল অলিভার। 'আশা করব প্রতিদানে তুমিও বিশ্বাস করবে আমাকে। তা ছাড়া... খারাপ কিছু ঘটলেও ওটা দরকার হবে তোমার। বাদশাহ্-র হারেম আর মৃত্যুর মধ্যে যদি একটাকে বেছে নিতে হয়, আমি তোমাকে দ্বিতীয়টা বেছে নেবার পরামর্শ দেব। আর হ্যাঁ, ওটা এখুনি করতে যেয়ো না। জীবনের আশা থাকার পরেও মরতে চায় শুধু বোকারা।'

'কীসের আশা? তোমার সঙ্গে বাকি জীবন কাটাবার?'

'না,' অলিভার মাথা নাড়ল। 'যদি আস্থা রাখো আমার উপর, তা হলে কথা দিচ্ছি, সমস্ত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করব আমি। শোনো, কাল ভোরে একটা জাহাজ নিয়ে অভিযানে যাবার কথা আছে আমার। সবার চোখ এড়িয়ে তোমাকে ওই জাহাজে তুলব আমি, সুযোগ বুঝে ইটালি বা ফ্রান্সে নামিয়ে দেব, যাতে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারো।'

'কিন্তু তার আগে আমাকে তোমার বউ হতে হবে,' মনে

করিয়ে দিল রোজামুণ্ড।

হাসল অলিভার। 'তুমি কি ভাবছ আমি তোমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছি? হায় খোদা, আমার সদিচ্ছা কি কিছুতেই বুঝবে না তুমি? মুসলমানের বিয়ে তো খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমি ওটাকে বিয়েই বলব না। ব্যাপারটা শুধুই তোমাকে বাঁচাবার একটা ঢালমাত্র।'

'যদি পরে কথা না রাখো তুমি?'

'কথা যদি না রাখি,' কাঁধ ঝাঁকাল অলিভার, 'তোমার কাছে ছোরাটা তো থাকছে!'

ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল রোজামুণ্ড। তারপর বলল, 'বেশ। বিয়েটা তা হলে কীভাবে হবে?'

মুসলিমদের নিয়ম ব্যাখ্যা করল অলিভার—সাক্ষীর উপস্থিতিতে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা যায় যে-কোনও অবিবাহিতা নারীকে, মেয়েটির সম্মতিক্রমে অবশ্যই। তবে বিয়ের বৈধতা দেবার জন্য প্রয়োজন হয় একজন কাজী বা তার ঊর্ধ্বতন কোনও ব্যক্তির। ওর কথা শেষ হবার আগেই বাইরে থেকে ভেসে এল হৈচৈ। দেখা গেল অনেকগুলো মশালের আবছা আভা।

'ওই যে, দলবল নিয়ে এসে পড়েছেন বাদশাহ্,' বলল অলিভার। গলা কেঁপে উঠল উদ্বেগে। 'বলো রোজামুণ্ড, তুমি রাজি আছ আমার প্রস্তাবে?'

'কিন্তু এ-মুহূর্তে কাজী পাবে কোথায়?' শঙ্কিত গলায় জানতে চাইল রোজামুণ্ড। ইতিবাচক সম্মতি প্রকাশ পেল তাতে।

'আমি বলেছি কাজী বা তার ঊর্ধ্বতন কোনও ব্যক্তি। বাদশাহ্ নিজেই আমাদের বিয়ের বৈধতা দেবেন। তাঁর সঙ্গীসাথীরা সাক্ষী হবে।'

'উনি যদি রাজি না হন?' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল রোজামুণ্ড। 'ঈশ্বর! লোকটা কিছুতেই রাজি হবে না!'

'আমরা তো আর অনুমতি চাইতে যাচ্ছি না। সরাসরি আশীর্বাদ চাইব।'

'খেপে যাবে তো! নিশ্চয়ই ভাববে কৌশল খাটাচ্ছ তুমি। প্রতিশোধ নিতে পারে!'

'সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া না,' একমত হলো অলিভার। 'কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই আমাদের। যদি ব্যর্থ হই...'

'আমার কাছে ছোরা আছে!' বাক্যটা শেষ করল রোজামুণ্ড।

'আর আমার কপালে জুটবে ফাঁসির দড়ি বা তলোয়ার,' যোগ করল অলিভার। 'শান্ত থাকো। ওই তো, এসে পড়েছে।'

কিন্তু না, পায়ের শব্দের পিছু পিছু হাজির হলো আলি। উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, 'মালিক, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসেছেন আসাদ-আদ-দীন!'

'ভয়ের কিছু নেই,' অলিভার নির্বিকার। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ওর কথা শেষ হতেই ঝড়ের মত উদয় হলেন আসাদ-আদ-দীন। সঙ্গে জনাবারো দেহরক্ষী নিয়ে এসেছেন অবাধ্য সেনাপতিকে শায়েস্তা করবার জন্য। মশালের আলোয় চকচক করছে তাদের হাতের নাঙ্গা তলোয়ার।

শাকের-আল-বাহারের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন বাদশাহ্। দু'হাত ভাঁজ করে বজ্রকঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আমি ফিরে এসেছি, বাছা। দেখতেই পাচ্ছ, সোজা আঙুলে ঘি না ওঠায় আঙুল বাঁকা করবার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি। তারপরেও আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি তোমাকে সুমতি দেবার।'

'সুমতি হয়েছে, মহানুভব,' বলল অলিভার।

'আল্লাহ্ দয়াময়!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন আসাদ-আদ-দীন। হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'তা হলে পাঠাও মেয়েটাকে।'

পিছিয়ে গেল অলিভার, রোজামুণ্ডের হাত তুলে নিল নিজের হাতে। বাদশাহ্-র দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'পরম করুণাময় আল্লাহ্-র নামে, হে আসাদ-আদ-দীন, আপনার এবং উপস্থিত অন্যান্য সাক্ষীদের সামনে এই মেয়েকে আমি রাসূলের নিয়ম অনুসারে স্ত্রী বলে গ্রহণ করছি। বলুন আমিন!'

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল আসাদ-আদ-দীনের। তাঁর চোখের সামনে ঘটে গেছে অকল্পনীয় কাণ্ডটা, আর তিনি নিজে সেটার বৈধতা-দানকারী কর্তৃপক্ষ হয়ে গেছেন। গলার রগ ফুলে উঠল তাঁর, চোখ দিয়ে বেরুতে শুরু করল আগুনের হলকা।

বাদশাহ্-র প্রতিক্রিয়ায় বিচলিত হলো না অলিভার। ডিভান থেকে একটা চাদর তুলে নিল, ঘোমটার মত পরিয়ে দিল রোজামুণ্ডকে। ঢেকে দিল মুখ।

বলল, 'আজ থেকে এই চেহারা পরপুরুষের দেখা নিষিদ্ধ। যদি কেউ এ ঘোমটা সরাবার চেষ্টা করে, আল্লাহ্ যেন তার উপর গজব বর্ষণ করেন। কেউ যদি ওর দিকে হাত বাড়ায়, আল্লাহ যেন তার হাত কেটে নেন। আমিন!'

দুর্ধর্ষ এক কাজ করেছে অলিভার। আসাদ-আদ-দীন বিমূঢ় হয়ে গেছেন। পিছনে শিকারী কুকুরের মত তলোয়ার বাগিয়ে অপেক্ষা করছে দেহরক্ষীরা, হুকুম পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু এল না কোনও হুকুম। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন বাদশাহ্। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছেন, দুলছেন খানিকটা, লাল থেকে ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে চেহারা। যুদ্ধ করছেন ভিতরে ভিতরে—একদিকে সীমাহীন ক্রোধ, অন্যদিকে তাঁর অনড় ধর্মবিশ্বাস।

'এবার আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন, মহানুভব,' বলল

অলিভার, 'কেন মেয়েটাকে হাতছাড়া করতে রাজি হইনি আমি? অবিবাহিত থাকায় বহুবার আমাকে কটাক্ষ করেছেন আপনি, বলেছেন বিয়ে করাটা খাঁটি মুসলমানের দায়িত্ব। এতদিনে পছন্দসই একজনকে খুঁজে পেয়েছি, ওকে দেখামাত্র বিয়ে করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনিই বলুন, যাকে বউ বলে ভেবেছি, তাকে অন্য কারও কাছে বিক্রি করি কীভাবে?'

অনেকক্ষণ কোনও জবাব দিলেন না বাদশাহ্। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'যা হবার তা হয়ে গেছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, তাঁর ইচ্ছেতেই সব হয়। আমি তাতে বাধা দেবার কে?'

'আমিন!' উঁচু গলায় বলল অলিভার। কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে সর্বশক্তিমানের প্রতি।

আরও কিছু বলতে চাইছিলেন আসাদ-আদ-দীন, কী ভেবে যেন মত পাল্টালেন। পরাজিত ভঙ্গিতে উল্টো ঘুরলেন তিনি। দেহরক্ষীদের উদ্দেশে বললেন, 'চলো, যাওয়া যাক। এখানে আর কিছু করার নেই আমাদের।'

চোদ্দ

সঙ্কেত

প্রাসাদ-কামরার জানালা থেকে আসাদ-আদ-দীনকে উত্তেজিত

অবস্থায় প্রথমবার ফিরতে দেখল ফানযিলাহ্। সে নিজেও তখন হাঁপাচ্ছে, প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এসেছে শাকের-আল-বাহারের বাড়ি থেকে। ওর কয়েক মিনিট পরেই ফিরেছেন বাদশাহ্।

দেহরক্ষী-বাহিনীর প্রধান আবদুল মুখতারের নাম ধরে আসাদকে ডাকাডাকি করতে শুনল ও। একটু পরেই ছোটাছুটি শুরু হলো আঙিনায়। জনাবারো দেহরক্ষী একত্র হলো, তাদেরকে নিয়ে ঝড়ের বেগে আবার বেরিয়ে গেলেন বাদশাহ্।

মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে মারযাক। পিতা বেরিয়ে যেতেই উল্লসিত গলায় বলল, 'এইবার জমবে খেলা! কুত্তাটা বেয়াদবি করে বসেছে আব্বার সঙ্গে। আজ রাতেই শেষ হয়ে যাবে শাকের-আল-বাহারের সমস্ত গর্ব আর অহঙ্কার!' দু'হাত তুলল মুখের সামনে। 'আল্লাহ্-র অশেষ দয়া।'

ছেলের উচ্ছ্বাসে যোগ দিল না ফানযিলাহ্। দ্বিধাদ্বন্দ্বে দুলছে তার হৃদয়। সন্দেহ নেই, শাকের-আল-বাহারকে পথ থেকে সরাতে হবে... আর মোক্ষম একটা অস্ত্রও পাওয়া গেছে তার জন্য। কথা হলো, সেই অস্ত্রের আঘাতে সে নিজেও কি আহত হবে না? চমৎকার এক কৌশল খাটিয়ে শাকেরকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে ফানযিলাহ্, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে ফাঁদটা পুরোপুরি নিখুঁত হয়নি। শাকের পরাজিত হলে খ্রিস্টান মেয়েটা এসে যাবে আসাদ-আদ-দীনের হাতে... আর তার মানে প্রাসাদের রানির পদ থেকে পতন ঘটবে তার। ছেলের জন্য এটুকু ত্যাগ স্বীকার করা মায়ের কর্তব্য, কিন্তু কেন যেন মন মানছে না। শাকেরের পাশাপাশি খ্রিস্টান মেয়েটাকেও যদি সরিয়ে দেয়া যেত দৃশ্যপট থেকে, তা হলেই চূড়ান্ত বিজয় ঘটত তার। অথচ এখন... ছেলের জন্য খুশি হতে পারছে না, বুকের ভিতরটা খচ্ করে উঠছে

নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবলে।

মনের এই অশান্ত অবস্থা নিয়ে তাই অপেক্ষা করতে থাকল ফানযিলাহ্। কান দিল না ছেলের বকবকানিতে—দেবে কেন, মারযাক আনন্দিত নিজের কথা ভেবে। একবারও চিন্তা করছে না মা-কে নিয়ে, তাকিয়ে দেখছে না জন্মদাত্রীর উদ্বেগমাখা চেহারা। নিজের অজান্তে ফানযিলাহ্ একটু বিরক্ত হয়ে উঠল ছেলের প্রতি।

অনেকক্ষণ পর বাদশাহ্‌কে ফিরতে দেখল মা-ছেলে। দেহরক্ষীদের মধ্যে কোনও ধরনের উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হলো না, আসাদও ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন পরাজিত ভঙ্গিতে। হাঁটলেন ক্লান্ত পায়ে, মাথা নিচু করে বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখেছেন, দু'হাত শরীরের পিছনে। চঞ্চল চোখে তাঁর পিছনে নজর বোলাল ফানযিলাহ্ আর মারযাক—খ্রিস্টান দাসীকে দেখবে বলে আশা করল, হাত-পা বেঁধে তাকে নিয়ে আসবে বাদশাহ্-র সঙ্গীরা... কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু ঘটল না।

বাদশাহ্-র কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল, দেহরক্ষীদেরকে চলে যেতে বলছেন। কুর্নিশ করে বিদায় নিল তারা। এরপর চাঁদের আলোয় প্রাসাদ-আঙিনায় একাকী পায়চারি করতে লাগলেন আসাদ-আদ-দীন। হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল, মনের ভিতর ঝড় বইছে তাঁর।

বিস্ময় বোধ করল ফানযিলাহ্ আর মারযাক। কী ঘটেছে? বাদশাহ্ কি দু'জনকেই হত্যা করে এসেছেন নাকি? সম্ভাবনাটা অমূলক নয়। বিদ্রোহ করায় এমনিতেই শাকেরের কপালে মরণ লেখা ছিল, এরপর হয়তো খ্রিস্টান মেয়েটাও প্রত্যাখ্যান করেছে তাঁকে... বাধা দিয়েছে। রাগের মাথায় তাকেও হয়তো প্রাণদণ্ড দিয়েছেন বাদশাহ্। ব্যাপারটা ভাবতেই ফানযিলাহ্-র রক্ত নেচে

উঠল। এক ঢিলে দুই পাখি শিকার হয়ে গেছে তা হলে। কিন্তু আসলেই কি তাই? নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তাই ডেকে পাঠাল খোজা আইয়ুবকে। দেহরক্ষীদের নেতা আবদুল মুখতারের কাছ থেকে সব জেনে আসবার জন্য নির্দেশ দিল।

কিছুক্ষণ পর ফিরল আইয়ুব—দুঃসংবাদ নিয়ে। শাকের-আল-বাহার খ্রিস্টান মেয়েটিকে বিয়ে করেছে। পরাজয় মেনে নিয়ে ফিরে এসেছেন আসাদ-আদ-দীন। ওর দু'জনেই বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। বলা বাহুল্য, খবরটা শুনে চরম হতাশায় ডুবে গেল মা-ছেলে।

ঝটকা-টা খুব দ্রুত সামলে নিল ফানযিলাহ্। ঘটনা যে এদিকে গড়াতে পারে, তা একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না ওর কাছে। ও-ই তো বুদ্ধিটা ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছিল শাকেরের মাথায়। যা চাইছিল, তা হয়নি—মারা পড়েনি দুর্ধর্ষ কর্সেয়ার; তারপরেও যা ঘটেছে, তা একদিক থেকে মন্দের ভাল। অন্তত প্রাসাদে ওর অবস্থান অটুট রইল। আসাদ-আদ-দীন আর যা-ই করুন, একটা বিবাহিত মেয়েকে তুলে এনে নিজের হারেমে ঢোকাবেন না। তার ওপর মেয়েটাকে বিয়ে করে বাদশাহ্-র বিরাগভাজন হয়েছে শাকের, তাকে এবার সহজেই আসাদের চোখের বালিতে পরিণত করা যাবে।

কীভাবে এগোতে হবে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে ফানযিলাহ্। আসাদ-আদ-দীনের ধর্মভীরুতাকে কাজে লাগিয়েছে শাকের-আল-বাহার; তাকেও একই কাজ করতে হবে। ধর্মের প্রতি বাদশাহ্-র অনুরাগকে ব্যবহার করেই স্বার্থসিদ্ধি করবে সে।

একটা ওড়না তুলে নিল ফানযিলাহ্, ভাল করে শরীর আর মুখ ঢাকল, তারপর চপল পায়ে সিঁড়ি ধরে নেমে এল আঙিনায়।

এককোনায় খাটানো শামিয়ানার নীচে আশ্রয় নিয়েছেন তখন আসাদ, তক্তপোশে বসে আছেন ধ্যানমগ্ন হয়ে। সাবধানে তাঁর পাশে গিয়ে বসল সে, হাত রাখল কাঁধে।

'আমার প্রাণের মালিক,' নরম গলায় বলল ফানযিলাহ্, 'আপনি দুঃখ পাচ্ছেন!' কণ্ঠে উপচে পড়ছে সহানুভূতির সুর।

একটু যেন চমকে উঠলেন আসাদ। মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন স্ত্রীর দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কে বলেছে তোমাকে?'

'আমার হৃদয়,' গদগদ ভাষায় বলল ফানযিলাহ্। 'দুঃখে আপনার হৃদয় ভারী হলে আমারটা কি আর হালকা থাকতে পারে? আপনি অশান্তির আগুনে পুড়লে আমি কীভাবে শান্তিতে থাকি? কামরায় বসেও আপনার মনের অবস্থা অনুভব করেছি আমি, বুঝেছি এ-মুহূর্তে আপনার জন্য আমার প্রয়োজনীয়তা। দুঃখ ভাগাভাগি করতে তাই ছুটে এসেছি, পারলে পুরোটাই নিজে নিয়ে নেব।'

বাদশাহ্-র চেহারায় তারল্য এল। সত্যিই এখন একজন সহমর্মী দরকার তাঁর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্বামীর মুখ থেকে পুরো ঘটনা জেনে নিল ফানযিলাহ্। বাদশাহ্-র কথা শেষ হলে ফেটে পড়ল রাগে।

'কুকুর কোথাকার!' শাকেরের উদ্দেশে গাল দিয়ে উঠল সে। 'অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ কুকুর! ওর ব্যাপারে আগেই আপনাকে আমি সতর্ক করেছিলাম, হে স্বামী, কিন্তু আপনি তো আমার কথা কানেই তোলেননি। তারপরেও... দেরিতে হলেও শাকেরের স্বরূপ আপনি দেখেছেন, এটাই আল্লাহ্-র অশেষ দয়া। আর আপনাকে ধোঁকা দিতে পারবে না ও। এবার নির্দ্বিধায় শয়তানটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারেন আপনি আলজিয়ার্স থেকে, ওকে মিশিয়ে দিতে পারেন ধুলোয়।'

কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না আসাদ-আদ-দীন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন সামনের দিকে। একটু পর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। নীতিপরায়ণ তিনি, সেইসঙ্গে বিবেকবান—জলদস্যু-দলের নেতার মধ্যে এমন গুণ কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে অনেকের কাছে।

'সব আল্লাহ্-র ইচ্ছাতে ঘটেছে,' ভারিক্কি গলায় বললেন তিনি। 'ইসলামের সবচেয়ে বড় সৈনিকের বিরুদ্ধে তাই প্রতিশোধ নেয়া সাজে না আমার। ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে গিয়ে আমি ইসলামের বিজয়-অভিযানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারি না।'

'এই কথা তো শাকের চিন্তা করেনি, স্বামী,' বলল ফানযিলাহ্। 'ব্যক্তিগত খায়েশকে প্রাধান্য দিয়েছে সে। অগ্রাহ্য করেছে নেতার আদেশ!'

'হ্যাঁ। যদি সম্ভব হতো, অবশ্যই একটা শিক্ষা দিতাম ওকে।' মাথা ঝাঁকালেন আসাদ। 'কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র ত্যাগ স্বীকার করতে হবে আমাকে। প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষার চাইতে আল্লাহ্-র প্রতি আমার দায়িত্ববোধ অনেক বেশি। সামান্য একটা ক্রীতদাসীর জন্য মুসলমানদের সবচেয়ে বড় আশা... সবচেয়ে বড় যোদ্ধাকে বিসর্জন দিতে পারব না। বিধর্মীদের ধ্বংস করে শাকের ইসলামের পতাকাকে দিনে দিনে শক্তিশালী করে তুলছে। এর বিনিময়ে একটা দাসীকে সে চাইতেই পারে। মেয়েটাকে আমারও পছন্দ হয়েছিল বলে বঞ্চিত করব ওকে? শাস্তি দেব? এরপরে যদি থেমে যায় আমাদের বিজয়ের রথ, আল্লাহ্-র কাছে কী জবাব দেব তখন?'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, আপনি এখনও ওকে ইসলামের সবচেয়ে বড় সৈনিক বলছেন!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল

ফানযিলাহ্।

'আমার বলায় কিছু যায়-আসে না, ওর কাজই এ-কথা বলছে।'

'আমি অন্তত একটা কাজের কথা জানি, যেটা কোনও খাঁটি মুসলমান করতে পারে না। একটা নাসরানি মেয়েকে বিয়ে করেছে সে! বিয়ের আগে কলেমা পড়ায়নি ওকে। অথচ রাসূল (সাঃ)-এর পরিষ্কার নির্দেশ আছে, বিধর্মীকে যেন বিয়ে না করে কেউ। পবিত্র এই নিয়ম ভঙ্গ করেছে শাকের। অবজ্ঞা করেছে আল্লাহ্, রাসূল আর আপনাকে!'

গম্ভীর হয়ে গেলেন আসাদ। অভিযোগ মিথ্যে নয়, ব্যাপারটা আসলে এর আগে মাথাতেই আসেনি তাঁর। তারপরেও মনের ভিতর থেকে তাড়না অনুভব করলেন শাকের-আল-বাহারের পক্ষ নেবার।

নিচু গলায় তিনি বললেন, 'তাড়াহুড়োয় হয়তো একটু ভুল করে ফেলেছে ও। যতকিছুই হোক, আমি মেয়েটাকে জোর করে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। নিয়ম-কানুন মেনে বিয়ে করবার সময় পায়নি ও।'

হতাশায় গোঙানি বেরিয়ে এল ফানযিলাহ্-র গলা দিয়ে। 'হে স্বামী, আপনি দেখছি দয়ার সাগর! এতকিছুর পরেও শাকেরের হয়ে সাফাই গাইছেন? ভুল করেছে ও? ভালমত ভেবে দেখুন, যত তাড়াহুড়োই থাকুক, খাঁটি মুসলমান কি এমন একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম ভুলে যেতে পারে? তা ছাড়া... কলেমা পড়তে কতক্ষণই বা লাগে?'

'তিলকে তাল বানাবার চেষ্টা করছ তুমি, বেগম,' বিরক্ত গলায় বললেন আসাদ। 'এ-বিষয়ে আর কিছু শুনতে চাই না। আর কোনও কথা থাকলে বলো।'

'কথা অবশ্যই আছে। অনেক কথা। কিন্তু সেগুলো আপনার কানে কতখানি পৌঁছুবে, তা বুঝতে পারছি না। চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরও আপনি শাকেরকে মাফ করে দিচ্ছেন। এ অবস্থায় কিছু বলে তো লাভ নেই।'

'কথা পেঁচিয়ো না। যা বলার, সরাসরি বলো।'

'ওর সবচেয়ে বড় অপরাধটাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, হে স্বামী। যে-ধর্মবিশ্বাস, আর যে-সৃষ্টিকর্তার কথা ভেবে আপনি ওকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন, ও তো ওসবকে স্রেফ স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার বানিয়েছে! ব্যক্তিগত লাভের জন্য আল্লাহ্ আর ইসলামকে ব্যবহার করা গুনাহ্ নয়?'

'ব্যাখ্যা করো!' আদেশের সুরে বললেন আসাদ। কণ্ঠে কর্কশ ভাব ফিরে এসেছে।

'ধর্মকে... আর আপনার ধর্মভীরুতাকে ঢাল বানিয়েছে শাকের, নাসরানি মেয়েটা-সহ আশ্রয় নিয়েছে তার পিছনে। বিয়ে করায় সাত খুন মাফ... কিন্তু আমার বিশ্বাস ও বিয়ে করেছে স্রেফ মেয়েটাকে আপনার নাগাল থেকে দূরে সরাবার জন্য, ঘর-সংসার শুরু করবার কোনও ইচ্ছে নেই ওর।'

'ওটা একটা কৌশল বলতে চাইছ? তবু আমি নিরুপায়। আইনসম্মতভাবে বিবাহিত ওরা। দম্পতি হিসেবে যেটুকু মর্যাদা প্রাপ্য, তা আমাকে দিতেই হবে।'

'আল্লাহ্ আপনাকে এমন মনোভাবের জন্য নিঃসন্দেহে পরকালে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু জেনে রাখুন, ইহকালে শাকের আপনার পিছনে হাসবে—সবার কাছে বলে বেড়াবে, কত সহজে ও আপনাকে বোকা বানাতে পেরেছে!'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন বাদশাহ্। চলে গেলেন আঙিনার মাঝখানে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে শুরু করলেন পায়চারি। বাধা দিল

না চতুর ফানযিলাহ্, শামিয়ানার নীচে আয়েশ করে বসল। বিষ ঢেলে দিয়েছে স্বামীর মনে, এখন ওটার কাজ শুরু হবার অপেক্ষা।

হঠাৎ আসাদকে থেমে দাঁড়াতে দেখল। আকাশের দিকে দু'হাত তুললেন তিনি মোনাজাতের ভঙ্গিমায়, বুঝি সাহায্য চাইছেন সর্বশক্তিমানের কাছে। বিড়বিড় করে কিছু বলতে শোনা গেল তাঁকে।

একটু পর ফিরে এলেন তিনি স্ত্রী-র কাছে। এখনও দ্বিধান্বিত। ফানযিলাহ্-র কথায় যে সত্যতা আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শাকেরের প্রতি স্ত্রী-র তীব্র বিদ্বেষও তাঁর অজানা নয়। মারযাক্কে সিংহাসনে বসানোর বাসনায় ক্রমাগত মিথ্যে অপবাদ দেয়ায় অভ্যস্ত। ওর কথায় নেচে উঠে কিছু করে বসা ঠিক হবে না। তা ছাড়া দুর্ধর্ষ যুবকটির প্রতি তাঁর নিজের ভালবাসাও কম নয়। বারংবার নিজেকে প্রমাণ করেছে সে। সিদ্ধান্ত নেবার বেলায় সবকিছুই মাথায় রাখতে হবে। দোটানায় পড়ে কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারছেন না বাদশাহ্, অশান্ত হয়ে উঠেছে মন।

ফানযিলাহ্ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এক হাত উঁচিয়ে তাকে থামালেন আসাদ। বললেন, 'যথেষ্ট! এ-ব্যাপারে এখন আর কিছু শুনতে বা বলতে চাই না আমি। সব আল্লাহ্-র উপর ছেড়ে দিচ্ছি। রাতটা যাক, হয়তো ঘুমের মাঝেই আমাকে সঠিক পরামর্শ দেবেন তিনি।'

পাশ ফিরে সিঁড়ির দিকে এগোলেন তিনি। ফানযিলাহ্ পিছু নিল। প্রাসাদে প্রবেশ করল দু'জনে।

রাতভর ঘুমাল না বেগম। স্বামীর পায়ের কাছে মাথা রেখে মেঝেতে বসে রইল। বলা যায় না, যদি রাত-দুপুরে ঘুম ভাঙে

বাদশাহ্-র, তখন নিজ হাতে তাঁর যত্ন-আত্তি করবে। অবশ্য তেমন কোনও সুযোগ পেল না। বালিশে মাথা ঠেকাবার একটু পরেই ভারী শ্বাস ফেলতে শুরু করলেন আসাদ। তাঁর ঘুম ভাঙল ফজরের আজানের সময়।

শান্তভাবে বিছানা ছাড়লেন বাদশাহ্। ফানযিলাহ্-র দিকে ফিরেও তাকালেন না। জিজ্ঞেস করলেন না, সারা রাত সে পায়ের কাছে পড়ে ছিল কেন। তার বদলে হাত-মুখ ধুয়ে ভৃত্যদেরকে ডেকে পাঠালেন। পোশাক পাল্টে তৈরি হলেন বাইরে বেরুবার জন্য। মনে হলো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

'আল্লাহ্ কি তবে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন?' কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইল ফানযিলাহ্। 'কী ঠিক করলেন, হে স্বামী?'

'এখন পর্যন্ত... কিছুই না।' আসাদ নির্বিকার।

'তা হলে কোথায় যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল ফানযিলাহ্।

'একটা সঙ্কেতের খোঁজে,' সংক্ষেপে বললেন আসাদ। কিছু ব্যাখ্যা করলেন না। স্ত্রী-কে চিন্তায় ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে।

তাড়াতাড়ি মারযাককে ডাকল ফানযিলাহ্। নির্দেশ দিল পিতার সঙ্গে যাবার। কী করতে হবে ওকে, তা বুঝিয়ে দিল এক নিঃশ্বাসে। শেষে যোগ করল, 'তোমার ভাগ্য এখন তোমারই হাতে, মারযাক। দেখো, ওটা যেন মুঠো গলে না পালায়।'

আঙিনায় ছুটে গেল শাহজাদা। আসাদ তখন একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছেন। সঙ্গে রয়েছে উজির সামানি, বিস্কেন-আল-বোরাক সহ আরও কিছু পদস্থ যোদ্ধা। মারযাকও অনুমতি চাইল যাবার জন্য। দায়সারা ভঙ্গিতে রাজি হলেন বাদশাহ্, একটু পরে সবাই বেরিয়ে পড়ল প্রাসাদ থেকে।

পিতার পাশে পাশে যাচ্ছে মারযাক, বাকিদের সামনে রয়েছে

ওরা। প্রথমে কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল। তারপর ইতস্তত করে মারযাক বলল, 'আমার একটা আর্জি আছে, আব্বা। এবারের অভিযান থেকে শাকের-আল-বাহারকে সরিয়ে নিন আপনি।'

ভুরু কুঁচকে ছেলের দিকে তাকালেন আসাদ-আদ-দীন। 'ও যদি না যায়, তা হলে কাকে পাঠাব?'

'আমার উপর একটিবার আস্থা রেখে দেখুন,' আকুতি ফুটল মারযাকের কণ্ঠে।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন আসাদ। 'জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এসেছে তোমার, মারযাক? জাহাজ নিয়ে সাগরে আত্মহত্যা করতে চাইছ কেন?'

'আপনি অবিচার করছেন আমার প্রতি!' প্রতিবাদ করে উঠল মারযাক।

'মোটেই না। আমি বরং দয়া দেখাচ্ছি তোমাকে। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে যেতে মানা করছি।'

আর কোনও কথা হলো না তাঁদের মধ্যে।

বন্দরের জেটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে শাকের-আল-বাহারের জাহাজ। রওনা হবার জন্য তৈরি। গ্যাঙওয়ে ধরে শেষ মুহূর্তের মালামাল ওঠাচ্ছে কুলিরা, গুটিয়ে নেয়া হচ্ছে বাড়তি দড়িদড়া। আসাদ-আদ-দীন যখন সঙ্গীসাথী নিয়ে ওখানে পৌঁছুলেন, তখন জাহাজে তালপাতার বিশাল এক বস্তা তুলছে চার কাফ্রি কুলি।

পুপ-ডেকে দেখা গেল শাকের-আল-বাহারকে। সঙ্গে রয়েছে ওসমানি, আলি, জ্যাসপার লেই সহ আরও কয়েকজন তাদেরকে নানা রকম নির্দেশনা দিচ্ছে সে। পাটাতনে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে লারোক আর ভিজিটেলো নামে দুই দলত্যাগী

কর্সেয়ার—জাতে ফরাসি আর ইটালিয়ান ওরা—মালামাল ওঠানো তদারক করছে প্রথমজন, কোন্‌টা কোথায় যাবে বলে দিচ্ছে; দ্বিতীয়জন খেয়াল রাখছে শেকলপরা মাল্লাদের দিকে।

তালপাতার বস্তাটা মূল মাস্তুলের গোড়ায় রাখার নির্দেশ দিচ্ছিল লারোক, কিন্তু শাকের বাধা দিল। বলে দিল ওগুলো জাহাজের পিছনদিকে... পুপ-হাউসে রাখার জন্য।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন আসাদ, হাঁটতে শুরু করলেন গ্যাঙওয়ের দিকে। পাশে পাশে চলল মারযাক, শেষবারের মত আর্জি পেশ করল—আর কিছু না হোক, বাদশাহ্ নিজেই যেন কর্তৃত্ব নেন এই অভিযানের, ওকে কায়িয়া বানান। রহস্যময় একটা হাসি দিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন আসাদ, মুখে কিছু বললেন না। উঠে এলেন জাহাজের পাটাতনে।

পুপ ডেক থেকে তড়িঘড়ি করে নেমে এল শাকের-আল-বাহার। সালাম দিয়ে বলল, 'কী সৌভাগ্য আমার, মহানুভব! আমরা জাহাজ ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, আপনি আসায় ভালই হলো। আপনার আশীর্বাদ পেলে আমাদের যাত্রা শুভ হবে।'

তীক্ষ্ণচোখে ওকে দেখলেন আসাদ-আদ-দীন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দু'জনের মাঝখানে বিশাল এক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। শাকের সম্মান দেখিয়ে কথা বলছে বটে, কিন্তু কোথায় যেন একটু আন্তরিকতার অভাব লক্ষ করছেন তিনি।

'আশীর্বাদের চেয়েও বেশি কিছু করবার পরামর্শ পেয়েছি আমি। এই অভিযানে নিজেই নেতৃত্ব দেব।' বললেন বাদশাহ্। নজর সরাননি শাকেরের উপর থেকে। তাঁর কথা শোনামাত্র একটু কেঁপে উঠল ওর চোখের পাতা।

'আপনি নেতৃত্ব দেবেন?' হালকা গলায় বলল শাকের। 'কে দিয়েছে এই পরামর্শ?' মুচকি হাসি হাসল।

চোখদুটো জ্বলে উঠল বাদশাহ্-র। এক পা সামনে এগোলেন। 'হাসছ কেন?'

'মাফ করবেন, তবে হাসার মতই কথা,' তাড়াতাড়ি বলল শাকের। 'পরামর্শটা অদ্ভুত কি না!'

মেঘ জমল বাদশাহ্-র চেহারায়। 'এর মধ্যে অদ্ভুতের কী দেখলে?'

কথা গুছিয়ে নিল শাকের। গম্ভীর হয়ে বলল, 'এমন একটা অভিযানে আপনাকে যাবার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে, যা মোটেই বিশ্বাসীদের সিংহের জন্য উপযুক্ত নয়, মালিক। আপনার নাম শুনেই রক্ত নেচে ওঠে আমাদের, সেই প্রেরণায় ছিনিয়ে আনি জয়... উপস্থিতির কোনও প্রয়োজন পড়ে না। এবারও পড়বে বলে মনে করি না। স্পেনের একটা নিঃসঙ্গ জাহাজের উপর হামলা চালাব আমরা—যুদ্ধজাহাজ নয়, মালবাহী জাহাজ! এতো সাধারণ অভিযানে মোটেই মানায় না আপনাকে। আপনি তো যাবেন বড় বড় যুদ্ধে—নিজের নৌ-বহর নিয়ে স্প্যানিশ আর্মাডার সঙ্গে লড়াইয়ে!'

মাপা দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করলেন আসাদ। শীতল গলায় বললেন, 'গতকালের তুলনায় তুমি দেখছি অনেক বদলে গেছ, বাছা।'

'বদলে গেছি, মহানুভব?'

'অবশ্যই! গতকাল তুমি নিজেই আমাকে সাধাসাধি করছিলে অভিযানে যাবার জন্য। মনে করিয়ে দিচ্ছিলে পুরনো দিনের কথা, আমাকে লোভী করে তুলছিলে... অথচ এখন দেখছি তোমার সুর পাল্টে গেছে।' পরিষ্কার অভিযোগ ফুটল তাঁর কণ্ঠে। 'মত পাল্টেছ কেন?'

ইতস্তত করল শাকের, বেকায়দা একটা পরিস্থিতিতে পড়ে

গেছে। চোখ বোলাল আশপাশে—বাদশাহ্-র কনুই ঘেঁষে দাঁড়ানো মারযাক, পিছনের সামানি-বিস্কেন... সবাই প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। জবাব না দিয়ে পার পাওয়া যাবে না।

গলা খাঁকারি দিয়ে ও বলল, 'গতকাল যে-সব যুক্তি দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন প্রস্তাবটা, তার মর্ম বুঝেছি আমি, মহানুভব। তা ছাড়া... ভালমত ভেবেচিন্তে দেখলাম, এই অভিযান আপনার জন্য বড্ড ছোট হয়ে যায়। তাই...'

আবছা একটা হাসি দেখা দিল মারযাকের ঠোঁটে, যেন শাকেরের আপত্তির আসল কারণ ধরতে পেরেছে। না পারলেও অবশ্য ক্ষতি নেই, বাদশাহ্‌কে নিরুৎসাহিত করতে গিয়ে নিজের পায়ে কুড়াল মেরে বসেছে গাধাটা। যে সঙ্কেতের খোঁজে এসেছেন আসাদ, তা দিয়ে ফেলেছে। নিজে যেটা করতে সক্ষম হয়নি, সেটা এবার শাকেরই করে দিয়েছে। কারণ ওর বিরূপ মনোভাব দেখে বাদশাহ্ অভিযানে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

'হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, তুমি চাও না আমি এ-অভিযানে যাই,' বললেন আসাদ, হাসছেন। 'যদি তা-ই হয়, ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক। কারণ পুত্রের প্রতি দায়িত্বে যথেষ্ট অবহেলা করেছি আমি এতদিন, আজ তার সংশোধন করব বলে ঠিক করেছি। তোমার সঙ্গে আমরা এই অভিযানে যাচ্ছি, শাকের-আল-বাহার... আর আমি নিজেই তুলে নিচ্ছি নেতৃত্ব-ভার। শিক্ষানবীশ হিসেবে মারযাক আমার সঙ্গে থাকবে।'

আর কোনও প্রতিবাদ করল না শাকের, মাথা নুইয়ে মেনে নিল বাদশাহ্-র সিদ্ধান্ত। যখন মুখ খুলল, তাতে মিশে রইল এক

ধরনের আনন্দ।

'আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শুনে খুশি হলাম, মহানুভব। অভিযানের ক্ষুদ্রতা নিয়ে আর কিছু বলব না আপনাকে। কারণ আপনি সঙ্গে যাওয়ায় আমিই লাভবান হচ্ছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্-র!'

পনেরো

সমুদ্রযাত্রা

উজির সামানিকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেলেন আসাদ-আদ-দীন, পরবর্তী কয়েক মিনিটে জরুরি কিছু নির্দেশ দিলেন—তাঁর অনুপস্থিতিতে কী করতে হবে না হবে, সে-বিষয়ে। কথা শেষ হলে জাহাজ থেকে নেমে গেল উজির, বাদশাহ্ হুকুম দিলেন জাহাজ ছাড়বার।

গ্যাঙওয়ে টেনে নেয়া হলো, খুলে ফেলা হলো শেষ দড়িগুলো। সারেং বাজাল শিঙা। লগি দিয়ে ঠেলে জেটির পাশ থেকে খোলা পানিতে সরিয়ে আনা হলো জাহাজ। শিঙার দ্বিতীয় আওয়াজে একসঙ্গে নামানো হলো সবক'টা বৈঠা। চাবুক হাতে নিয়ে ক্রীতদাস মাল্লাদের মাঝে অবস্থান নিল লারোক আর ভিজিটেলো, চেঁচিয়ে হুকুম দিল সবাইকে তৈরি হতে। শিঙার তৃতীয় আওয়াজে একসঙ্গে সামনে ঝুঁকল আড়াইশ' দেহ, টান দিল দাঁড়ে। এগোতে শুরু করল শাকের-আল-বাহারের

জমকালো জাহাজ, সূচনা ঘটল ওদের রোমাঞ্চকর সমুদ্রযাত্রার। মাস্তুলের ডগায় পত পত করে উড়ছে কর্সেয়ারদের লাল-সবুজ পতাকা। সেদিকে মাথা তুলে শ্লোগান দিয়ে উঠল নাবিকের দল।

ফুরফুরে বাতাস বইছে উপকূলের দিক থেকে, ওটাই লায়োনেলের একমাত্র স্বস্তি। নইলে মাল্লার বেঞ্চির ভয়াবহ পরিবেশ কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। বাকিদের মত শেকল পরানো হয়েছে তাকে, খুলে নেয়া হয়েছে সমস্ত পরিধেয়, কোমরে একটা কৌপিন ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। নিচু ওয়েইস্ট ডেকের উপরে, ডানদিকের প্রথম বেঞ্চিতেই বসানো হয়েছে লায়োনেলকে। অল্প একটু এগিয়েছে জাহাজ, এর মাঝে ওর অদক্ষ ভঙ্গিতে দাঁড় টানা পছন্দ হলো না সারেঙের। পিছনে এসে সজোরে চাবুক চালাল। ফটাস করে প্রচণ্ড শব্দ হলো, কাঁধের পিছনটা কেটে গিয়ে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল লায়োনেল, তাড়াতাড়ি সমস্ত শক্তি ঢেলে দিল দাঁড় টানায়। জাহাজ যখন বন্দর-মুখে পৌঁছুল, তখন দরদর করে ঘামছে সে, টনটন করছে শরীরের প্রতিটা পেশি। পরিষ্কার বুঝতে পারল, এ-কাজ তাকে দিয়ে হবে না। শরীরটা মোটেই উপযুক্ত নয়। আরাম-আয়েশে সারাটা জীবন কাটিয়েছে লায়োনেল, কায়িক পরিশ্রম কাকে বলে সেটাই জানা নেই।

আর কিছুক্ষণ দাঁড় টানতে হলে হয়তো অজ্ঞান হয়ে যেত বেচারা, কিন্তু কপাল ভাল—বন্দর-মুখ পেরিয়ে খোলা সাগরে পৌঁছুতেই বেড়ে গেল বাতাসের বেগ। আসাদের নির্দেশে জাহাজ চালানোর কাজ তদারক করছে শাকের-আল-বাহার, চড়া গলায় নির্দেশ দিল সবক'টা পাল খুলে দিতে। একটু পরেই বেলুনের মত ফুলে উঠল ওগুলো। বাতাসের সাহায্য পেয়ে জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছুটতে শুরু করল জাহাজ। গতি বেড়ে গেল কয়েক গুণ। দাঁড়

তুলে নেবার নির্দেশ দিল শাকের, মাল্লারা এবার বিশ্রাম নিতে পারে। এ-কথা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল ক্রীতদাসদের মাঝে। নিচু গলায় যে-যার স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাল জোরালো বায়ুপ্রবাহের জন্য।

জাহাজের বো-টা বেশ চওড়া, লোহায় মোড়ানো ডগা, গুঁতো মেরে শত্রু-জাহাজের গায়ে ফুটো তৈরি করার জন্য আদর্শ। ওখানকার পাটাতনে সমবেত হয়েছে একদল কর্সেয়ার। এ-মুহূর্তে কোনও কাজ নেই ওদের, তাই অলস ভঙ্গিতে আড্ডা দিচ্ছে, উপভোগ করছে সাগরের মুক্ত বাতাস। ফাঁকে ফাঁকে সেরে নিচ্ছে ব্যক্তিগত কাজ—কেউ সুঁই-সুতো নিয়ে পোশাক ঠিক করছে, কেউ বা শান দিচ্ছে ছুরি-তলোয়ারে। হেঁড়ে গলায় গান ধরল একজন, তা শুনে হুল্লোড় করে উঠল বাকিরা।

জাহাজের পিছনদিকে রয়েছে বিশাল এক কেবিন। ওটায় ঢোকার জন্য রয়েছে দুটো দরজা। লাল রঙের পর্দা ঝুলছে দরজায়, মাঝখানে কাস্তের মত বাঁকা সবুজ চাঁদ—কর্সেয়ারদের প্রতীক। কেবিনের ছাদে রয়েছে বড় বড় তিনটে গোল লণ্ঠন, সোনালি কারুকাজ-মণ্ডিত ফ্রেমে শোভা পাচ্ছে ওগুলো। কেবিনের সামনে, পুপ্-ডেকের প্রায় অর্ধেকটা দখল করে রেখেছে একটা সবুজ শামিয়ানা। ওটার তলায় পাতা হয়েছে তক্তপোশ, মারযাক-সহ ওখানে বসেছেন আসাদ-আদ-দীন। বিস্কেন-আল-বোরাক এবং বাদশাহ্-র অন্যান্য সহযাত্রীরা দাঁড়িয়ে আছে পুপ-ডেকের সামনের দিকে, নজর রাখছে নীচের মাল্লাদের উপর।

রূপালী কোর্তা-পাজামা আর পাগড়ি পরা শাকের-আল-বাহার নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে আছে বামদিকের বুলওঅর্ক ধরে। দূরে আবছা হয়ে আসা আলজিয়ার্সের তটরেখার দিকে তাকিয়ে

আছে উদাস দৃষ্টিতে।

কয়েক মিনিট ওকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করলেন আসাদ-আদ-দীন, তারপর ডেকে পাঠালেন। তাড়াতাড়ি তাঁর শামিয়ানার নীচে হাজির হলো শাকের, শ্রদ্ধাবনত ভঙ্গিতে দাঁড়াল বাদশাহ্-র সামনে। কথা বলার আগে ওর মুখভঙ্গি নিরীখ করলেন আসাদ, মারযাকের চেহারায় তখন মিটিমিটি হাসি খেলা করছে।

'তোমাকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে দেয়া দরকার, শাকের,' একটু পর বললেন বাদশাহ্। 'ভেবো না কাল রাতের ঘটনার কারণে আজ আমি হাজির হয়েছি এখানে। তোমাকে তো বলেছি, ছেলের প্রতি একটা দায়িত্ব আছে আমার... এতদিন তা অবহেলা করেছি, কিন্তু আর তা করা সম্ভব নয়। সেটাই এই অভিযানে যাবার পিছনে মূল কারণ।' কণ্ঠ শুনে মনে হলো অজুহাত দেবার চেষ্টা করছেন।

পিতার কথা, বা বলার ভঙ্গি... কোনোটাই পছন্দ হলো না মারযাকের। ব্যাপার কী, তাঁর মত প্রতাপশালী একজন মানুষ কেন নমনীয়তা দেখাচ্ছেন অবাধ্য এই যুবকের প্রতি?

মাথা ঝোঁকাল শাকের। 'মহানুভব, আপনার সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করবার অধিকার নেই আমার। কীসের পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, সেটাও জানার দরকার নেই। জানা দরকার শুধু আপনার ইচ্ছে, ওটাই আমার জন্য হুকুম।'

'সত্যি?' তিক্ত গলায় বললেন আসাদ। 'কাজে-কর্মে তো অন্য ধারণার জন্ম দিচ্ছ আমার মনে।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'অস্বীকার করব না, গতকাল রাতে তুমি যা করেছ, তাতে অসন্তুষ্ট হয়েছি আমি। তারপরেও আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে আমাকে, তোমার স্ত্রী-র চিন্তা মুছে ফেলতে হবে হৃদয় থেকে। তা

আমি করেছিও। তুমিও সব ভুলে যাও। এই দেখো না, আবার আমরা একসঙ্গে পাড়ি জমিয়েছি স্প্যানিয়ার্ডদের উপর মরণ-আঘাত হানার জন্য! আমাদের মধ্যকার বিভেদ যেন আল্লাহ্-র কাজে বাধা সৃষ্টি না করে।'

'আমিন, মহানুভব!' গাঢ় স্বরে বলল শাকের। 'আমার ভয় হচ্ছিল...'

'আর না!' ওকে বাধা দিলেন বাদশাহ্। 'কোনও ভয় নেই তোমার। সবসময় তোমাকে নির্ভীক দেখেছি আমি, আর সেজন্যেই তোমাকে নিজের সন্তানের মত ভালবেসেছি।'

চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল মারযাকের। এত সহজে শাকেরের সঙ্গে ওর পিতার সংঘাতকে মিটে যেতে দেবে না সে। নতুন করে বিষ ছড়ানোর চেষ্টা করল, শাকের বাদশাহ্‌কে কৃতজ্ঞতা জানাবার আগেই কথা বলে উঠল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

'আচ্ছা শাকের, তোমার বউয়ের খবর কী?' বাঁকা সুরে বলল মারযাক। 'স্বামীর বিরহ কীভাবে সামাল দেবে ও?'

'দুঃখিত, শাহজাদা,' শান্ত গলায় বলল শাকের, 'মেয়েদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুব সামান্য। ও কী করবে না করবে, তা বলতে পারছি না।'

নাহ্, বেকায়দা কিছু বলানো গেল না। তাই বলে হাল ছাড়ল না মারযাক। গলায় কপট সহানুভূতি ফুটিয়ে বলল, 'তোমার জন্য বড্ড খারাপ লাগছে, ভাই। বউয়ের নরম বাহুর বন্ধন ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি চলে আসতে হলো! ভাল কথা, ওকে কোথায় রেখে এসেছ?'

'মুসলমানের বউকে কোথায় রাখতে বলেছেন রাসূল?' একটু রূঢ় হলো শাকেরের গলা। 'বাড়িতে!'

মুখ বাঁকাল মারযাক। 'এত সহজে বউকে ছেড়ে চলে

এলে... ভাবতে অবাক লাগছে আমার।'

ছেলের বক্রোক্তি কান এড়াল না বাদশাহ্-র। 'এসব কী বলছ? খাঁটি মুসলমানের জন্য আল্লাহ্-র সেবার চাইতে বড় কিছু কি আর আছে? কীসের বউ, কীসের সংসার? আগে ধর্ম, তারপর বাকি সব।'

'বাহ্যিক রূপ দেখে বিভ্রান্ত হবেন না, আব্বা,' সতর্ক করে দিল মারযাক। 'ভিতরটাই আসল।'

'চুপ!' গর্জে উঠলেন আসাদ। 'জিভের লাগাম টানো, মারযাক। বাজে কথা বন্ধ করে আল্লাহ্-কে ডাকো। তোমার প্রথম অভিযান যেন সফল করেন তিনি। আমরা যেন জয়ী হয়ে ঘরে ফিরতে পারি।'

'আমিন!' উদাত্ত গলায় বলল শাকের। কিন্তু মনের ভিতরটা খুঁত খুঁত করছে ওর। কেন ওসব বলল মারযাক? বাদশাহ্-র মনে রোজামুণ্ডের স্মৃতি জাগিয়ে রাখবার জন্যে, নাকি সত্যিই কিছু আঁচ করেছে মেয়েটার ব্যাপারে?

কয়েক ঘণ্টা পর ওর আতঙ্ক আরেকটু বাড়ল। তখন দুপুর, রেলিঙে ভর দিয়ে ক্রীতদাসদের মাঝে খাবার বিতরণ তদারক করছে শাকের, এমন সময় ওর পাশে এসে দাঁড়াল মারযাক।

কিছুক্ষণ নীরবে নীচের দিকে তাকিয়ে রইল শাহজাদা। ওখানে এক বেঞ্চি থেকে আরেক বেঞ্চিতে বিস্কুট আর শুকনো খেজুর বিতরণ করছে লারোক আর ভিজিটেলো। প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগাবে এ-খাবার, তবে পেট ভরবে না। সেটাই ভাল, কারণ ভরপেটে ঠিকমত দাঁড় টানতে পারে না মাল্লারা। তৃষ্ণা মেটানোর জন্য দেয়া হচ্ছে ভিনেগার মেশানো পানি, সঙ্গে এক ফোঁটা তেল।

হঠাৎ আঙুল তুলল মারযাক, নির্দেশ করল তালপাতার

বিশাল বস্তাটার দিকে। মূল মাস্তুলের তলায় পাউডার ব্যারেলের পাশে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে ওটা।

'বস্তাটা ওখানে বেমানান ঠেকছে,' বলল সে। 'লড়াই শুরু হলে পাউডার ব্যারেল সরাবার পথে বাধা সৃষ্টি করবে। হোল্ডে ঢুকিয়ে রাখছ না কেন?'

বুক ঢিব ঢিব করে উঠল শাকেরের। বস্তাটা প্রথমে পুপ-কেবিনে ঢুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল, পরে বাদশাহ্ কেবিনটা দখল করায় ওটা আবার মাস্তুলের গোড়ায় আনিয়েছে ও। মারযাক ওকে সে-আদেশ দিতে শুনেছে। কিছু কি সন্দেহ করেছে ছোকরা? আন্দাজ করেছে, বস্তার ভিতরে আসলে কী আছে? উদ্বেগ চাপা দিয়ে পাশ ফিরল ও, মুখে অবহেলার হাসি।

'আমার ধারণা ছিল, তুমি আমাদের সঙ্গে শিক্ষানবীশ হিসেবে যাচ্ছ, শাহজাদা।'

'তো?' ভুরু নাচাল মারযাক।

'আমি বলতে চাইছি যে, এখুনি আমাকে পরামর্শ দেয়া মানায় না তোমাকে। কোথায় কী রাখতে হবে, আর কখন কী করতে হবে, তা তোমার চেয়ে আমি ভাল বুঝি। চুপচাপ এখানকার কাজ দেখলেই অনেক কিছু শিখতে পারবে তুমি। তখন নাহয় ইচ্ছেমত আদেশ-নির্দেশ দিয়ো।' প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য সামনের দিকে ইশারা করল ও। মেঘের ছায়ায় ঢাকা উপকূল ভেসে উঠেছে ওখানে। 'ওই যে, বালেয়ারিক দেখা যাচ্ছে। বেশ দ্রুত এগোচ্ছি আমরা।'

শেষ বাক্যটা না বললেও চলত। এ-কথা সবার জানা যে, ভূমধ্যসাগরের এই এলাকায় শাকের-আল-বাহারের জাহাজ সবচেয়ে দ্রুতগামী। আড়াইশ' মাল্লা দাঁড় টানুক, বা বাতাসের সাহায্যে এগোক, ওটার সঙ্গে কেউ পেরে উঠবে না। তার প্রমাণ

দেবার জন্যই যেন প্রাণপণে ছুটছে জাহাজটা। উঁচু উঁচু ঢেউকে বিচ্ছিন্ন করছে অবহেলায়, মাঝে মাঝে ঝাঁপ দিচ্ছে শিকারী বাঘের মত, রোদে চকচক করছে ভেজা শরীর... সে এক দর্শনীয় দৃশ্য।

'বাতাস যদি এভাবে বইতে থাকে,' বলল শাকের, 'তা হলে সন্ধ্যার আগেই আগুইলা পয়েন্টে পৌঁছে যাব আমরা।'

জাহাজ বিষয়ক আলোচনায় আগ্রহী দেখাল না মারযাককে। ওর দৃষ্টি সেঁটে আছে মাস্তুলের গোড়ায় পড়ে থাকা বস্তার উপরে। কিছুক্ষণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর উল্টো ঘুরে ফিরে গেল শামিয়ানার তলায়। তক্তপোশে বসে আসাদ-আদ-দীন তখন আপন চিন্তায় হারিয়ে গেছেন। মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছেন ফানযিলাহ্-র কথায় কর্ণপাত করে এই অভিযানে আসার জন্য। শাকের-আল-বাহারকে অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। মারযাক তাঁর কানে মন্দ কথা বলতে গিয়ে ধমক খেলো। মুখ লাল হয়ে গেল শাহ্জাদার।

'তোমার মুখে শুধু নিজের শয়তানিই প্রকাশ পাচ্ছে, মারযাক,' রাগী গলায় বললেন আসাদ। 'মা-ছেলের কুকথায় কান দিয়ে বোকা বনেছি আমি। খবরদার, আর কিচ্ছু বলতে আসবে না তুমি আমাকে।'

দমে গেল মারযাক। অস্ফুট ক্রোধ নিয়ে শাকেরের দিকে তাকাল সে। পুপ ডেক থেকে নেমে গেছে দুর্ধর্ষ কর্সেয়ার, হাঁটছে মাল্লাদের বেঞ্চির সারির মাঝ দিয়ে।

অস্বস্তিতে ভুগছে শাকের-আল-বাহার। মনে হচ্ছে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ওর সঙ্গে। যদিও সেটা অসম্ভব। পুরো জাহাজে মাত্র তিনজন ব্যক্তি জানে বস্তার রহস্য—আলি,

ভিজিটেলো আর জ্যাসপার লেই। প্রথম দু'জনের আনুগত্য প্রশ্নাতীত, মরে গেলেও মুখ খুলবে না ওরা। জ্যাসপার লেইয়েরও স্বার্থ জড়িত আছে শাকেরকে সাহায্য করায়। কাজেই ওকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়। তা হলে কে? ভুল করছে ও? কিন্তু বস্তার ব্যাপারে মারযাকের আগ্রহ তো ভিন্ন ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ভিজিটেলোকে ডাকল শাকের, তিনজনের ভিতরে ও-ই সবচেয়ে বিশ্বস্ত। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, কেউ কি বাদশাহ্-র কাছে আমার গোমর ফাঁস করে দিতে পারে?'

একটু বিস্ময় ফুটল ইটালিয়ান সারেঙের চেহারায়, পরমুহূর্তে আত্মবিশ্বাসের হাসি ফুটল। 'আমাদের গোপন মালামালের ব্যাপারে বলছেন?' ইশারা করল তালপাতার বস্তার দিকে। 'অসম্ভব! আসাদ যদি আসল ঘটনা জানতেন, আলজিয়ার্সেই একটা কিছু ঘটে যেত। অন্তত আরও কিছু দেহরক্ষী না নিয়ে কিছুতেই জাহাজে চড়তেন না উনি।'

'দেহরক্ষীর দরকার কী?' কাঁধ ঝাঁকাল শাকের। 'ঝামেলা বাধলে আমাদের কর্সেয়াররা কার পক্ষ নেবে, সেটা তো জানা কথা।'

'এতটা হতাশ হবেন না,' আশ্বাসের সুরে বলল ভিজিটেলো। 'এদের বেশিরভাগই আপনার সঙ্গে অসংখ্য লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে, জয়ী হয়ে ফিরেছে। ওদের চোখে আপনিই আসল বাদশাহ্।'

'হয়তো। কিন্তু ওদের সত্যিকার আনুগত্য আসাদ-আদ-দীনের প্রতি, কারণ উনিই আল্লাহ্-র প্রতিনিধি। আমাদের দু'জনের মধ্যে কাউকে বেছে নিতে হলে ধর্মবিশ্বাসের খাতিরে বাদশাহ্-র পক্ষ নিতে বাধ্য হবে ওরা। অতীতে আমার সঙ্গে কী

বন্ধন ছিল, তা মনে রাখবে না।'

'তারপরেও গুঞ্জন শুনেছি আমি—আপনার কাছ থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নেয়াকে পছন্দ করছে না কেউ,' বলল ভিজিটেলো। 'স্বীকার করছি, ধর্মবিশ্বাসের কারণে প্রভাবিত হবে অনেকে; তাই বলে আপনার পাশে কাউকে পাওয়া যাবে না, তা হতে পারে না। তা ছাড়া ভুলে যাবেন না...' গলার স্বর খাদে নামিয়ে আনল সে, 'আপনার-আমার মত বহু দলত্যাগী আছে কর্সেয়ারদের ভিতর। বাদশাহ্-র চাইতে বহুগুণ বেশি টান রয়েছে ওদের আপনার প্রতি। তবে আশা করছি,' সুর বদলাল আবার, 'সে-ধরনের কোনও পরিস্থিতি দেখা দেবে না।'

'আমিও তা-ই চাই,' বলল শাকের। 'কিন্তু কেন যেন মন মানছে না। তাই জানা দরকার, বিপদ দেখা দিলে কী মোকাবেলা করতে হবে আমাকে। যাও তুমি, লোকজনের সঙ্গে কথা বলে দেখো, কার মনোভাব কেমন। বোঝার চেষ্টা করো, ঝামেলা শুরু হলে কোন্ পক্ষে কতজনকে পাওয়া যাবে। সাবধানে থেকো, কেউ যেন কিছু সন্দেহ করতে না পারে।'

চোখ টিপল ভিজিটেলো। 'কিচ্ছু ভাববেন না,' বলল সে। 'খুব শীঘ্রি খবর নিয়ে আসব আমি।'

চলে গেল ইটালিয়ান সারেং। যোগ দিল কর্সেয়ারদের আড্ডায়। পুপ ডেকের দিকে ফিরতি পথ ধরল শাকের। ক্ষণিকের জন্য থামল মাল্লাদের একটা বেঞ্চির সামনে। সাদা চামড়ার একজন ক্রীতদাসকে দেখা যাচ্ছে হতশ্রী অবস্থায়। লায়োনেল। চাবুকের আঘাতে চামড়া কেটে গিয়েছিল, রক্ত শুকিয়ে আছে ওখানে। নিষ্ঠুর একটা হাসি ফুটল শাকেরের ঠোঁটে। প্রতিশোধের আনন্দ উপভোগ করছে।

'বাহ্!' ইংরেজিতে বলে উঠল ও। 'এরই মধ্যে চাবুকের স্বাদ

পেয়ে গেছ দেখছি! অবশ্য... সামনে যা আসছে, তার তুলনায় এটা কিছুই নয়। কপাল ভাল তোমার, আজ বাতাস বইছে। সবসময় এমনটা ঘটে না। খুব শীঘ্রি টের পাবে, তোমার কারণে কী সইতে হয়েছে আমাকে।'

রক্তলাল চোখ তুলে ভাইয়ের দিকে তাকাল লায়োনেল। গাল দিতে চাইল, কিন্তু নিজেকে সংযত করল শাস্তির কথা ভেবে। দুর্বল গলায় শুধু বলল, 'নিজের জন্য পরোয়া করি না আমি!'

'করবে, প্রিয় ভাই আমার,' পিত্তি জ্বালানো সুরে বলল শাকের। 'চরম কষ্ট নিয়ে নিজের জন্য পরোয়া করতে শুরু করবে তুমি, করুণা অনুভব করবে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি! সম্ভাবনা আছে যে, বাঁচবে না তুমি... খুব বেশিদিন কষ্ট ভোগ করবে না। ওটাই আমার একমাত্র দুঃখ। শরীর-স্বাস্থ্য একটু ভাল হলে এই ভাসমান নরকে তোমাকে ভালমত সেদ্ধ করা যেত।'

'বললাম তো, নিজেকে নিয়ে পরোয়া করি না,' খ্যাপাটে শোনাল লায়োনেলের গলা। 'রোজামুণ্ডকে নিয়ে তুমি কী করেছ?'

'খুব কি অবাক হবে, যদি বলি ভদ্রলোকের আচরণ করেছি আমি... ওকে বিয়ে করেছি?'

'বিয়ে!' খাবি খেলো লায়োনেল। 'নরকের কীট কোথাকার, তুমি বিয়ে করেছ ওকে?'

'খামোকা গালি দিচ্ছ কেন? এরচেয়ে খারাপ কিছুও আমি করতে পারতাম ওর সঙ্গে। সেটা ভেবে সান্ত্বনা দাও নিজেকে।'

হাসতে হাসতে ওখান থেকে সরে এল শাকের, লায়োনেলের বুকে তোলপাড় জাগিয়ে দিয়ে।

এক ঘণ্টা পর দিগন্তের কাছে পরিষ্কার হয়ে এল বালেয়ারিক দ্বীপমালার ধোঁয়াটে উপকূল। ওয়েইস্ট ডেকে আবার মিলিত

হলো শাকের আর ভিজিটেলো।

'বলো কী জানতে পেরেছ।'

'ঠিকমত হিসাব দেয়া মুশকিল,' শাকেরকে জানাল ইটালিয়ান সারেং। 'তবে যদ্দূর বুঝেছি, দুই পক্ষই সমানে সমান। লড়াই বাধলে কে জিতবে বলা যায় না। সেধে ঝামেলায় জড়াবার পরামর্শ দেব না আপনাকে।'

'অমন কোনও ইচ্ছে আমারও নেই। নিতান্ত বাধ্য করা না হলে কিছুতেই বাদশাহ্-র বিরুদ্ধে যাব না আমি। শুধু জানতে চেয়েছিলাম কাউকে আমার পক্ষে পাওয়া যাবে কি না। এই আর কী। ঠিক আছে, কাজে যাও তুমি।'

মন শান্ত হলো না শাকেরের। সমস্যা মেটেনি ওর। ফ্রান্স বা ইটালিতে রোজামুণ্ডকে নামিয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছে, যদি ব্যর্থ হয়—মেয়েটা নিঃসন্দেহে ওকে প্রতারক ভাববে। মনে করবে তেমন কোনও ইচ্ছে ওর ছিল না। কিন্তু কীভাবেই বা প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে ও? জাহাজে আসাদ-আদ-দীনের উপস্থিতি সব এলোমেলো করে দিয়েছে। যেভাবে লুকিয়ে রোজামুণ্ডকে জাহাজে তুলেছে, মনে হচ্ছে সেভাবেই আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে আলজিয়ার্সে। অপেক্ষা করতে হবে আরেকটা সুযোগের। কিন্তু সেটাও ঝুঁকিমুক্ত নয়। ক'দিন লাগে ফিরতে, কে জানে। এর মধ্যে রোজামুণ্ডের উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যা করবার, তা করতে হবে এ-যাত্রাতেই। কিন্তু মাথা কাজ করছে না শাকেরের। ভেবেই পাচ্ছে না কীভাবে কী করবে। উপায় এখন একটাই—অপেক্ষা করতে হবে ওকে। ভাগ্য সহায় হলে একটা সুযোগ মিলেও যেতে পারে।

দুশ্চিন্তা নিয়ে জাহাজময় পায়চারি করে বেড়াল শাকের।

দু'হাত পিছনে বাঁধা, পাগড়ি-পরা মাথা বুকে ঠেকে থাকা অবস্থায়। মন ভারী হয়ে রইল। বুঝতে পারছে, নিজের জালে নিজেই আটকা পড়ে গেছে। এখন জীবন নিয়ে টানাটানি! কিন্তু ওসবের পরোয়া করছে না। ওর জীবন তো এমনিতেই তছনছ হয়ে গেছে, ওটার আর মূল্য কী? তারচেয়ে মরে গিয়ে যদি রোজামুণ্ডের প্রতি করা অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে, খুশিমনেই জীবন দেবে ও। সমস্যা হলো, আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকার পরেও সমস্যার কোনও হাল দেখতে পাচ্ছে না।

তাই অবিরাম পায়চারি করে চলল শাকের-আল-বাহার। মনে মনে প্রার্থনা করল অলৌকিক কিছু ঘটবার জন্য।

ষোলো

তালপাতার বস্তা

সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানেক আগে, আলজিয়ার্স ছাড়ার পনেরো ঘণ্টা পরে, আগুইলা পয়েন্টে পৌঁছুল জাহাজ—জায়গাটা ফরমেন্টেরা দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে। শাকের-আল-বাহার তখনও আপনমনে পায়চারি করছিল পাটাতনে, ধ্যান ভাঙল পুপ ডেক থেকে আসাদ-আদ-দীনের ডাক শুনে। ওকে উদ্দেশ করে জাহাজকে ওখানকার খাঁড়িতে ঢোকাবার নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি।

খাঁড়িমুখটা সংকীর্ণ, তা ছাড়া বাতাসও পড়ে এসেছে। দাঁড়

বাওয়া ছাড়া এগোবার উপায় নেই। তাই গলা চড়িয়ে লারোক আর ভিজিটেলোকে ডাকল শাকের, হুকুম দিল দাঁড় নামানোর।

হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল জাহাজ জুড়ে। শিঙার আওয়াজে মাল্লাদেরকে তৈরি হবার সঙ্কেত দেয়া হলো। জ্যাসপার লেই আর অন্যান্য মুসলিম নাবিকেরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল নেতিয়ে যাওয়া পাল গোটানোয়। দাঁড় বাইবার জন্য হুকুম দিল শাকের, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বারের মত শিঙা বেজে উঠল। ছপাৎ ছপাৎ শব্দে পানিতে পড়ল সবক'টা দাঁড়। সমস্বরে হেঁইয়ো হেঁইয়ো বলে ওগুলো চালাতে শুরু করল মাল্লারা। তাল মেলানোর জন্য সামনে একটা ঢোলও বাজানো হচ্ছে। ধীরে ধীরে খাঁড়িমুখে নাক ঢোকাল জাহাজ। পুপ-ডেকে উঠে এল শাকের, লারোক আর ভিজিটেলোকে দু'পাশের বুলওঅর্কের পাশে অবস্থান নিতে বলল। জাহাজ ডানে-বাঁয়ে সরে যেতে থাকলে সতর্ক করে দেবে। নইলে অগভীর পানিতে আটকে যেতে পারে জলযানটা। ডুবো পাথরে ঘষা খেয়ে খোলে ফুটোও দেখা দিতে পারে।

খুব বেশি সময় লাগল না, নিপুণ দক্ষতায় জাহাজকে খুব শীঘ্রি সংকীর্ণ অংশটা থেকে নিরাপদে বের করে আনল শাকের। সামনে ডিম্বাকৃতির বিশাল খাঁড়ি—দীঘির মত নিস্তরঙ্গ, টলটলে পানি। নোঙর ফেলবে না বলে ঠিক করেছে শাকের, জাহাজ নিয়ে গেল তীরের কাছাকাছি। দাঁড় তুলে নেয়া হলো পানি থেকে। একটা শুধু বের করে রাখা হলো সেতুর মত ব্যবহার করবার জন্য। শাকেরের নির্দেশে কয়েকজন নাবিক ওটার উপর দিয়ে হেঁটে লাফ দিয়ে নামল অগভীর পানিতে, সেখান থেকে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠল খাঁড়ির সৈকতে। জাহাজের দড়িদড়া নিয়ে নেমেছে ওরা, তীরে পা দিয়েই খুঁটি গাড়তে শুরু করল, ওসব খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হবে জাহাজ।

এবার চারপাশে নজর বোলাবার ফুরসত মিলল। খাঁড়ির এপাশটায় রয়েছে পাথরে ভরা বিশাল এক পাহাড়ি ঢাল, জনমনিষ্যির ছায়া নেই। এলোমেলো ভঙ্গিতে ঢালে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা বুনো ছাগল। এখানে-ওখানে মাথা তুলে রেখেছে অপুষ্ট ঝোপঝাড়—কয়েকটাতে আবার হরেক রঙের ফুল ফুটেছে। চূড়ার কাছে মাথা তুলে রেখেছে প্রাচীন কিছু জলপাই গাছ। শেষ বিকেলের কোমল রোদে সোনালি হয়ে উঠেছে ওগুলোর মাথা।

জাহাজ বাঁধা শেষ হয়েছে, এবার পাহারা বসানোর পালা। লারোককে দায়িত্ব দিল শাকের—কয়েকজন লোক নিয়ে পাহাড়চূড়ায় উঠে যাবে, ওখান থেকে নজর রাখবে চারপাশে।

ছেলেকে নিয়ে পুপ-ডেকে পায়চারি করতে করতে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল বাদশাহ্-র। আত্মগোপন এবং ওঁত পেতে হামলা চালাবার জন্য তিনি ব্যবহার করতেন এই খাঁড়ি। কর্সেয়ারদের জন্য এমন চমৎকার আশ্রয় পুরো ভূমধ্যসাগরে খুব কমই আছে। তাঁর মনে আছে, দ্রাগুত রইসের সঙ্গে একবার ছ'টা জাহাজ নিয়ে এখানে ঘাপটি মেরেছিলেন, হামলা চালিয়েছিলেন জেনোয়ার অ্যাডমিরাল ডোরিয়া-র নৌ-বহরে। সাতটা রণতরী আর তিনটে সদাগরি জাহাজ ছিল লোকটার সঙ্গে, কিন্তু পেরে ওঠেনি কর্সেয়ারদের সঙ্গে। চমক সামলাবার আগেই পরাস্ত হয়েছিল।

পিতার পাশে হাঁটতে হাঁটতে দায়সারা ভঙ্গিতে সে-কাহিনি শুনল মারযাক, কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না। ওর মন পড়ে আছে শাকের-আল-বাহারের দিকে। ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হচ্ছে সন্দেহ—নিশ্চয়ই কোনও একটা রহস্য আছে ওই তালপাতার বস্তায়। ওটার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার পর থেকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে

শাকেরকে, অনবরত হাঁটাহাঁটি করছে পাটাতনে, যেন পাহারা দিচ্ছে বস্তাটাকে। ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

আসাদের স্মৃতিচারণ শেষ হলে চেহারায় কৃত্রিম প্রশংসা ফোটাল মারযাক। বলল, 'আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ, আপনি এই অভিযানের দায়িত্ব নিয়েছেন, আব্বা। নইলে এই খাঁড়িকে হয়তো এড়িয়ে যেতাম আমরা।'

'না, না, তা হবে কেন?' বললেন আসাদ। 'এদিককার সব জায়গা শাকের ওর হাতের তালুর মত চেনে। ও নিজেও খাঁড়িটাকে কাজে লাগিয়েছে কয়েকবার। সত্যি বলতে কী, দুপুরে ও-ই প্রস্তাব দিয়েছিল এখানে ঢুকে স্প্যানিশ জাহাজটার জন্য অপেক্ষা করতে।'

'আপনি আছেন বলে এত কাজ দেখাচ্ছে। একা এলে অন্য কোনও কাণ্ড ঘটাত। অন্য কিছু আছে ওর মনে, আব্বা। ভাল করে দেখুন, কী যেন ভাবছে লোকটা সারাক্ষণ। অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি এ-অবস্থা। মনে হচ্ছে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে... ভয় পাচ্ছে কিছু একটা নিয়ে! দেখুন আপনি!'

'আল্লাহ্‌ তোমার শুভবুদ্ধির উদয় করুন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন আসাদ। 'মনের ভিতরের কুটনামির কারণে সারাক্ষণ এটা-সেটা কল্পনা করছ তুমি, মারযাক। অবশ্য, তোমার কোনও দোষ নেই, এসবের জন্য তোমার মা দায়ী। সে-ই তোমার মনে হিংসার বীজ বুনে দিয়েছে। চালাকি করে আমাকেও এই অভিযানে অংশ নিতে বাধ্য করেছে।'

'হুম! মনে হচ্ছে আপনি গতরাতের ঘটনা ভুলে গেছেন।'

'কিছুই ভুলিনি আমি। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখতে হচ্ছে, আল্লাহ্‌ আমাকে আলজিয়ার্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে

আমি আল্লাহ্-র আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারি না। আমার কথা শোনো, মারযাক, ক্ষান্ত দাও হিংসা-বিদ্বেষে। আশা করি আগামীকাল তুমি যুদ্ধ করতে দেখবে শাকেরকে। তখন ওর ব্যাপারে ধারণাই পাল্টে যাবে তোমার। মনের সায় পাবে না ওর বদনাম করার। এখুনি সময়... ওর সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলো।'

নীচে চলে গিয়েছিল শাকের, গলা চড়িয়ে তাকে ডাকলেন বাদশাহ্। তাড়াতাড়ি পুপ-ডেকে উঠে এল দুর্ধর্ষ কর্সেয়ার। নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে তাকে অভিবাদন জানাল মারযাক। পিতার উপদেশ মেনে নেবার কোনও ইচ্ছে নেই ওর। যে-লোক ওকে সিংহাসনের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চলেছে, তার সঙ্গে হাত মেলানোর প্রশ্নই ওঠে না।

'কী ব্যাপার, শাকের?' বাঁকা সুরে বলল শাহজাদা। 'আসন্ন লড়াই নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ভুগছ মনে হচ্ছে?'

'আমি একজন যোদ্ধা,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল শাকের। 'যোদ্ধারা কখনোই লড়াই নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগে না।'

'তা হলে মুখ-টুক এত শুকিয়ে গেছে কেন?'

'চোখে সমস্যা হয়েছে তোমার, শাহজাদা। আমার চেহারা-সুরত আগের মতই আছে।'

'উঁহুঁ। দুশ্চিন্তায় ভুগছ তুমি। আমি নিশ্চিত!'

হেসে উঠল শাকের। 'এরপর হয়তো বলবে, ভয় পাচ্ছি আমি। অসুবিধে নেই, যা খুশি বলো। আমি কোনও আপত্তি করব না। গোলা-বারুদ আর রক্তের খেলা যখন শুরু হবে, তখনই বোঝা যাবে, কার কতটা সাহস।'

দু'জনের কথা কাটাকাটি শুনে নড়ে চড়ে উঠল বিস্কেন-আল-বোরাক সহ বাদশাহ্-র সহযাত্রীরা। পুপ-ডেকের একপ্রান্তে বুলওঅর্কে হেলান দিয়ে গল্পগুজব করছিল তারা, এবার এগিয়ে

এল মজা দেখার জন্য। দাঁড়াল বাদশাহ্-র পিছনে। আসাদ-আদ-দীন নিজেও কৌতূহল নিয়ে শুনছেন পুত্র আর পুত্রসম অনুচরের বাদানুবাদ। পিছনে ভিড় জমতে দেখে ছেলের কাঁধে হাত রাখলেন।

বললেন, 'শাকের ভুল বলেনি, মারযাক। একটু অপেক্ষা করো... আগামীকাল ও যখন শত্রুপক্ষের জাহাজে হানা দেবে, তখন দেখতে পাবে, ওর মধ্যে ভয়-ডর বলে কিছু আছে কি না। নিশ্চিত থাকো, লজ্জা পাবে তখন ওর সঙ্গে নিজের তুলনা করতে গিয়ে।'

ঝটকা দিয়ে পিতার হাত সরিয়ে দিল শাহজাদা। রাগী গলায় বলল, 'এ ভারি অন্যায়, আব্বা। ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আপনি আমার অভিজ্ঞতার অভাব নিয়ে খোঁটা দিচ্ছেন! কতই বা বয়স আমার... সেটা তো খেয়াল রাখবেন! এ-বয়সে আর কিছু না হোক, অন্তত অস্ত্র ভাল চালাতে জানি আমি।'

'একটু জায়গা দিন, মহানুভব,' স্বভাবসুলভ কৌতুকের স্বরে বলল শাকের। 'শাহজাদা আমাদেরকে তার কেরামতি দেখাক।'

দাঁতে দাঁত পিষল মারযাক। 'বেশ, একটা ধনুক দাও। কীভাবে তীর ছুঁড়তে হয়, তা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।'

'শাকেরকে তীর ছোঁড়া দেখাবে তুমি?' বাদশাহ্ নিজেও এবার হেসে ফেললেন। 'পাগল হয়েছ?'

'কিছুক্ষণের জন্য মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন, আব্বা,' বিরক্ত গলায় বলল মারযাক। 'তীর ছুঁড়ে নিই, তারপর নাহয় শুনব আপনার প্রতিক্রিয়া।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। উড়ন্ত পাখিকে তীর দিয়ে ঘায়েল করতে পারে শাকের।'

'ওটা ওর বড়াই।'

'আর তোমার বড়াইটা কী?' জিজ্ঞেস করল শাকের। 'এ-কথা বোলো না যে, এখান থেকে তীর ছুঁড়ে ফরমেন্টেরা দ্বীপকে ফুটো করে দিতে পারবে।'

'এত বড় সাহস তোমার... আমাকে নিয়ে মশকরা করছ?' হিসিয়ে উঠল মারযাক।

'এর মধ্যে সাহসের তো কিছু নেই।'

'আল্লাহ্-র কসম, আজ তোমাকে একটা শিক্ষা দেব আমি।'

'আমি সেই শিক্ষার অপেক্ষায় রইলাম।'

'পাবে... কথা দিলাম!' গরগর করে উঠল মারযাক। 'অ্যাই, কে আছ? ভিজিটেলো, দুটো ধনুক নিয়ে এসো আমার আর শাকেরের জন্য।'

ছুটোছুটি করে হুকুম তামিল করল ইটালিয়ান সারেং।

'আমাদের ধর্মে কিন্তু বাজি ধরা নিষেধ!' মনে করিয়ে দিলেন আসাদ-আদ-দীন।

'বাজি ধরছি না,' মারযাক বলল। 'যদিও ধরা উচিত ছিল।'

'ভালই হতো তা হলে,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল শাকের। 'মাথার মত তোমার পকেটটাও খালি হয়ে যেত।'

ফোঁস ফোঁস করে উঠল মারযাক। ভিজিটেলোর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল একটা ধনুক। তাতে তীর পরাল। কয়েক মুহূর্ত পরেই ধুরন্ধর শাহজাদার আসল মতলব টের পেল শাকের।

'ওই যে,' মূল মাস্তুলের গোড়ায় ইশারা করল মারযাক, 'তালপাতার বস্তাটা দেখতে পাচ্ছ? ওটার উপরদিকে একটা শুকনো পাতার ডগা বেরিয়ে আছে... আকারে মানুষের চোখের চাইতে বড় হবে না। আমার তীর ওটাকে ফুঁড়ে দেবে। কী শাকের, এরচেয়ে ছোট কোনও লক্ষ্যভেদ করতে পারবে তুমি?'

ওর দৃষ্টি সেঁটে আছে প্রতিপক্ষের মুখের উপর। চকিতের

জন্য কালো একটা ছায়া পড়ল শাকেরের চেহারায়, চোখের তারায় দেখা দিল নিখাদ আতঙ্ক। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে। হেসে উঠে বলল:

'অদৃশ্য একটা লক্ষ্য বেছেছ তুমি, শাহ্জাদা। এখান থেকে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। পাতার ডগাটা যদি থাকেও ওখানে, তীরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। কোনও অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না ওটার। আদপে কোনও কিছু ছিল কি না, তাতে তোমার তীর লেগেছে কি না... কিছুই বোঝা যাবে না। উঁহুঁ, এসব চালাকি চলবে না।'

'তা-ই?' ভুরু নাচাল মারযাক। 'তা হলে বস্তার গিঁট্টুর মধ্যে লাগাই?' ধনুক উঁচু করল ও।

খপ্ করে তার একটা বাহু ধরে ফেলল শাকের। বলল, 'না, বস্তা না। অন্য কোথাও মারো।'

'কেন?'

'তোমার টিপ কেমন, তার কিছুই জানি না। তুমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তীর গিয়ে লাগবে আমার মাল্লাদের গায়ে। বাছাই করা লোক ওরা, একজনও যদি মরে, জাহাজ চালানোয় সমস্যা হবে আমার। তা ছাড়া, বস্তাটা তো একেবারেই কাছে। দশ গজও হবে না। এত অল্প দূরত্বে কি প্রতিযোগিতা হয়? হ্যাঁ, শিশুদের জন্য এটা একটা পরীক্ষা হতে পারে। হয়তো সেজন্যেই লক্ষ্য হিসেবে ওটাকে বেছে নিয়েছ।'

হো হো করে হেসে উঠল দর্শকরা। ধনুক নামিয়ে নিল মারযাক, মুখ লাল হয়ে উঠেছে। অগ্নিদৃষ্টি হানল অবাধ্য কর্সেয়ারের দিকে। মুখ হাসি হাসি করে রেখেছে শাকের-আল-বাহার, দেখে বোঝার উপায় নেই কী বাঁচা বেঁচেছে।

পাহাড়ি ঢালের একটা জলপাই গাছের দিকে আঙুল তুলল

সে। একশো গজ দূরে ওটা। বলল, 'ওই যে, ওটাই হলো সত্যিকার পুরুষের নিশানা। যদি পারো তো মগডালে একটা তীর লাগাও।'

সমর্থন পাওয়া গেল আসাদ আর বাকিদের কাছ থেকে। বাদশাহ্ বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। সত্যিকার তীরন্দাজের উপযুক্ত নিশানা বটে!'

কাঁধ ঝাঁকাল মারযাক। 'আমি জানতাম, আমার ঠিক করা নিশানা ওর পছন্দ হবে না। যাক গে, জলপাই ডাল-টাও মন্দ না। এত বড় জিনিসে একটা বাচ্চাও তীর বেঁধাতে পারবে।'

'বাচ্চারা না পারলে তোমারও চেষ্টা করা উচিত না,' পিত্তি জ্বালানো সুরে বলল শাকের। একটু সরে এসেছে ও, শরীর দিয়ে শাহজাদার দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছে তালপাতার বস্তাটাকে। 'আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দাও, শাহজাদা!' বলতে বলতে নিজের ধনুক উঁচু করল ও। লক্ষ্যস্থির করল কি করল না, এক ঝটকায় ছিলা টেনে তীর ছুঁড়ল।

বাতাস কেটে ছুটে গেল ওটা। ঠক্ করে বিঁধে গেল জলপাই গাছের মগডালে। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।

ঠোঁট কামড়াল মারযাক। পাশার ছক উল্টে গেছে। আসলে তীর চালানোর ইচ্ছে ছিল না ওর, শাকেরকে ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধার করতে চেয়েছিল। সেটা তো হয়ইনি, উল্টো ফেঁসে গেছে ফালতু এই প্রতিযোগিতায়। মুখরক্ষার জন্য তীর এখন ছুঁড়তেই হবে ওকে। তারপরেও মান-ইজ্জত খোয়ানোর ষোলোআনা সম্ভাবনা রয়েছে।

'আল্লাহ্-র কিরে,' বলে উঠল বিস্কেন, 'শাকেরকে হারাতে হলে এখন আপনাকে চমক দেখাতে হবে, শাহজাদা!'

'এই নিশানা তো আমি চাইনি,' গোমড়ামুখে বলল মারযাক।

'চ্যালেঞ্জ তুমি ছুঁড়েছ,' বললেন আসাদ। 'কাজেই নিশানা ঠিক করবার অধিকার শাকেরের। বলতে দ্বিধা নেই, চমৎকার একটা নিশানাই বেছেছে ও... তীরও ছুঁড়েছে পাকা তীরন্দাজের মত।'

প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াবার কথা ভাবল একবার মারযাক, খামোকা নাটক করে লাভ নেই। বস্তা পরীক্ষা করবার জন্য যে-কৌশল অবলম্বন করতে চেয়েছিল, তা মাঠে মারা পড়েছে। কিন্তু পরক্ষণে টের পেল, পিছিয়ে এলে সবার দুয়োধ্বনি শুনতে হবে। কী আর করা, আস্তে আস্তে ধনুক উঁচু করল ও। লক্ষ্যস্থির করল দূরের জলপাই গাছের দিকে।

'পাহাড়ের ডগায় আমাদের পাহারাদার আছে,' টিটকিরির সুরে বলল শাকের। 'ওদেরকে আবার ফুটো করে দিয়ো না!'

খেপাটে ভঙ্গিতে ছিলা টানল মারযাক। টঙ্কার উঠল ধনুকে। তীরটা গাছের দশ গজ বাঁয়ের মাটিতে মাথা কুটল।

শাহজাদা বলে কথা, বহু কষ্টে হাসি ঠেকাল দর্শকরা। তবে বাদশাহ্ আর শাকের ঠিকই হেসে ফেলল।

'দেখলে তো,' ছেলেকে বললেন আসাদ, 'শাকেরের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে কী ঘটে?'

'আমার কী দোষ?' ফুঁসে উঠল মারযাক। 'তীর ছোঁড়ার সময় শাকের আমাকে খেপিয়ে দিল, দেখেননি? নিশানা ঠিক রাখতে পারিনি।'

ডানদিকের বুলওঅর্কের দিকে চলে গেল শাকের। ভাবল বুঝি শাহজাদার পাগলামির সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু ওর ধারণা ভুল।

'যা হবার হয়েছে,' বলে উঠল মারযাক। 'কিন্তু ছোট নিশানাটায় আমি আবার ওকে চ্যালেঞ্জ করছি!' কাউকে কিছু

বলার সুযোগ না দিয়ে ধনুক তুলল ও বস্তা লক্ষ্য করে, ইতোমধ্যে নতুন একটা তীর পরিয়ে নিয়েছে ছিলাতে। 'সবাই সাবধান!'

ঝট্ করে ওর দিকে ঘুরল শাকের। চোখের সামনে ঘটতে যাচ্ছে সর্বনাশ... হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। তীর-সহ নিজের ধনুক তুলল শাহজাদার দিকে।

'খবরদার!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'যদি বস্তার দিকে তীর ছোঁড়ো, তা হলে আমিও তীর ছুঁড়ব তোমার দিকে। আমার নিশানা কখনও ব্যর্থ হয় না।'

সময় যেন থমকে গেল হঠাৎ করে। বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হলো সবাই। চরম অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল তারা শাকের-আল-বাহারের দিকে। মূর্তিমান পিশাচের মত দেখাচ্ছে ওকে। চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে ক্রোধে, দু'চোখ জ্বলছে ভাটার মত, শাহজাদার দিকে তীর-ধনুক তাক করে রেখেছে নিষ্কম্প হাতে।

কুটিল হাসি ফুটল মারযাকের ঠোঁটে। ধীরে ধীরে ধনুক নামিয়ে নিল সে। সন্তুষ্ট নিজের উপর—লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। শত্রুকে খোলস থেকে বের করে আনতে পেরেছে।

কয়েক মিনিট নীরবতায় কেটে যাবার পর ভাষা খুঁজে পেলেন আসাদ-আদ-দীন। হতভম্ব গলায় বললেন, 'ইয়া আল্লাহ্! এসবের মানে কী? শাকের, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?'

'হ্যাঁ, পাগলই হয়েছে,' বলল মারযাক। 'ভয়ের চোটে পাগল।' তাড়াতাড়ি সরে এল বিস্কেনের শরীরের আড়ালে। 'ওকে জিজ্ঞেস করুন, আব্বা, বস্তার ভিতরে কী লুকিয়ে রেখেছে।'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল বাদশাহ্-র। এগোলেন দু'পা। 'বলো, শাকের!'

ধনুক নামিয়ে নিল শাকের। নিজেকে সামলে নিয়েছে। শান্ত গলায় বলল, 'ওটাতে দামি মালামাল আছে, মহানুভব। আমি চাইনি খামখেয়ালি একটা ছেলে তীর ছুঁড়ে ওগুলোর দফারফা করুক।'

'দামি মালামাল!' ভুরু কোঁচকালেন বাদশাহ্। 'আমার ছেলের প্রাণের চেয়ে দামি কী হতে পারে? দেখা দরকার।' পুপ-ডেকের সামনের দিকে চলে গেলেন তিনি। গলা চড়িয়ে হুকুম দিলেন, 'অ্যাই, বস্তাটা খোলো।'

বিদ্যুৎবেগে সামনে বাড়ল শাকের, ধরে ফেলল আসাদের হাত।

'থামুন, মালিক!' কর্কশ গলায় বলল ও। 'ওই বস্তা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কারও অধিকার নেই...'

'আমাকে অধিকারের কথা শোনাচ্ছ?' রেগে গেলেন বাদশাহ্। ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিলেন হাত। নীচে তাকালেন। 'খোলো বলছি বস্তাটা!'

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কর্সেয়ারদের মাঝে। একসঙ্গে এগোল বেশ কয়েকজন। ত্রস্ত হাতে খুলে ফেলল বস্তার বাঁধন। মুখ ফাঁকা করল, পরমুহূর্তে বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে এল তাদের গলা দিয়ে। শাকের তখন পাথর হয়ে গেছে অমোঘ পরিণতির কথা ভেবে।

'কী হয়েছে?' উত্তেজিত গলায় জানতে চাইলেন আসাদ। 'কী পেয়েছ তোমরা?' কর্সেয়ারদের দেহের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে বস্তাটা, উপর থেকে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না তিনি।

পায়ে পায়ে বাদশাহ্-র দৃষ্টিসীমা থেকে সরে দাঁড়াল কর্সেয়াররা। পুপ-ডেকের দর্শকদের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে বস্তা থেকে বেরুতে শুরু করল রোজামুণ্ড গডলফিনের

সুডৌল অবয়ব। সারা গায়ে কালিঝুলি মাখা, চেহারায় দিনভর বস্তাবন্দি থাকার ধকল... তারপরেও সৌন্দর্য একবিন্দু ম্লান হয়নি ওর। দেখামাত্র খাবি খাওয়ার মত আওয়াজ করলেন আসাদ-আদ-দীন।

আতঙ্ক কাটিয়ে নড়ে উঠল শাকের। ঝটপট নেমে গেল পুপ-ডেক থেকে। মাস্তুলের গোড়ায় গিয়ে রোজামুণ্ডকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। তারপর নিজে অবস্থান নিল ওর পাশে।

সতেরো

প্রবঞ্চনা

মূর্তির মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন আসাদ-আদ-দীন। এরপরেই রাগ ভর করল তাঁর মধ্যে। বুঝতে পারছেন, তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে শাকের-আল-বাহার—এমন এক মানুষ, যাকে তিনি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন। ফানযিলাহ্ আর মারযাকের হাজারো অভিযোগ এতদিন হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি, আপন পুত্র আর স্ত্রীকে গালমন্দ করেছেন প্রিয় সেনাপতির নামে মন্দ কথা বলায়... অথচ এখন প্রমাণ হয়ে গেছে, একবিন্দু ভুল বলেনি ওরা। তাঁর চোখে পট্টি বেঁধে রেখেছিল ধোঁকাবাজ লোকটা, মারযাকের বুদ্ধিমত্তায় আজ খুলে গেছে সেই পট্টি।

গম্ভীর মুখে পুপ-ডেক থেকে নেমে এলেন বাদশাহ্। তাঁকে

অনুসরণ করল মারযাক, বিস্কেন আর অন্যান্য সঙ্গীসাথীরা।

'তা হলে এ-ই তোমার দামি মাল?' থমথমে গলায় বললেন আসাদ। 'মিথ্যেবাদী কুকুর কোথাকার! ব্যাখ্যা করো নিজেকে!'

'ও আমার স্ত্রী, মহানুভব,' দৃঢ় গলায় বলল শাকের। 'যেখানেই যাই, স্ত্রীকে সঙ্গে নেবার অধিকার আছে আমার।' পাশ ফিরে রোজামুণ্ডকে মুখ ঢাকতে বলল নিচু গলায়। কাঁপা কাঁপা হাতে চেহারায় ওড়না পেঁচাল মেয়েটা।

'অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না,' বললেন বাদশাহ্। 'প্রশ্ন তুলছি উদ্দেশ্য নিয়ে। কেন এই লুকোচুরি? মহান শাকের-আল-বাহারের স্ত্রী হিসেবে পুপ কেবিনে থাকার কথা ছিল ওর। গোপনে বস্তাবন্দি অবস্থায় নয়!'

'মিথ্যেই বা বলেছ কেন?' যোগ করল মারযাক। 'আমি যখন ওর খবর জানতে চাইলাম... কেন বললে ওকে তুমি আলজিয়ার্সে রেখে এসেছ?'

'আমার ভয় হচ্ছিল,' নিচু গলায় বলল শাকের, 'ওকে হয়তো সঙ্গে আনার অনুমতি পাব না আমি।'

দাঁতে দাঁত পিষলেন আসাদ। 'অনুমতি? বউকে যুদ্ধ-অভিযানে নেবার? ফাজলামির আর জায়গা পাও না? কে কবে শুনেছে, নতুন বউকে লড়াই আর মৃত্যুর মাঝখানে নিয়ে যেতে চায় স্বামী?'

'মৃত্যুভয় নেই আমার, মালিক। আল্লাহ্ অতীতে রক্ষা করেছেন আমাকে, এবারও করবেন বলে বিশ্বাস ছিল।'

এ-কথা শুনে আগে উদ্বুদ্ধ হতেন বাদশাহ্। কিন্তু আজ আরও খেপে গেলেন। 'আল্লাহ্-র নাম নিয়ে ধোঁকাবাজি কোরো না! এই মেয়েকে তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে মন্দ কোনও উদ্দেশ্যে!'

'উদ্দেশ্যটা আর যা-ই হোক,' বলল মারযাক, 'সোনায় ভরা

স্প্যানিশ গ্যালিয়ন দখলের ছিল না।'

'আমারও তা-ই বিশ্বাস, মারযাক,' একমত হলেন আসাদ। থমথমে হয়ে গেল চেহারা। 'নাটক করে লাভ নেই, শাকের। ধরা পড়ে গেছ তুমি। এবার সব সত্যি বললেই ভাল করবে তুমি।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল শাকের। বলল, 'বেশ, সত্যি কথাই বলব আমি। তবে প্রথমেই বলে দিতে চাই, আপনার অর্পিত দায়িত্বে অবহেলার কোনও ইচ্ছে ছিল না আমার। কিন্তু মেয়েটার ব্যাপারে ভিন্ন একটা উদ্দেশ্য ছিল। ওটা ফাঁস হলে আমার শত্রুরা একটা সুযোগ পাবে বলে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে চেয়েছিলাম। এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বা ধর্মবিরোধিতার কোনও সম্পর্ক নেই।

'আমার সত্যিকার উদ্দেশ্য, যদি জানতেই চান তো বলি, ছিল মেয়েটাকে ফ্রান্স বা ইটালিতে নামিয়ে দেয়া। যাতে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে ও... নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে। ওকে নামিয়ে দেবার পরে স্প্যানিশ জাহাজের উপর হামলা চালাব বলে ঠিক করেছিলাম আমি। আল্লাহ্-র ইচ্ছাতে বিজয়ীর বেশে ফিরতে পারব বলে আশা করেছিলাম।'

'শয়তানের দোসর!' গাল দিয়ে উঠল মারযাক। 'ক্রমাগত মিথ্যে বলে চলেছ তুমি! বিয়ে করা বউকে কেন নামিয়ে দেবে অজানা-অচেনা জায়গায়?'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন আসাদ। 'জবাব দিতে পারো?'

'অবশ্যই! যদি আমার কথায় বিশ্বাস রাখেন আর কী।' বলল শাকের।

'শুধু আল্লাহ্ আর রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখি আমরা,' বলে উঠল মারযাক। 'মুসলমানের বেশধারী কোনও বহুরূপীর উপর

নয়!'

'বলতে দাও ওকে।' বাদশাহ্ থামালেন তাঁর ছেলেকে।

'আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যা বলব তার প্রতিটা অক্ষর সত্য। বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ব্যাপার।' কাঁধ ঝাঁকাল শাকের। 'বহু বছর আগে... যখন ইংল্যাণ্ডে ছিলাম... এই মেয়েটিকে ভালবাসতাম আমি। ওকে বিয়ে করব বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু কয়েকজন দুষ্টলোকের ষড়যন্ত্রে ওর চোখে দোষী প্রমাণিত হই আমি। আমাকে অবিশ্বাস করে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও, বিয়েতে অসম্মতি জানায়। ভাগ্যের ফেরে দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই এরপর। বিতৃষ্ণা জেগেছিল আমার মনে, মহানুভব, ভেবেছিলাম ঘৃণা করি ওকে; তাই অপহরণ করে এনেছি ইংল্যাণ্ড থেকে... শাস্তি দেবার জন্য। কিন্তু গতরাতে ওর সঙ্গে কথা বলার পর বুঝতে পারলাম, আমার ভালবাসা এখনও মরে যায়নি... যে-ভুল ও করেছে, সেটাও ছিল অনিচ্ছাকৃত। তাই আত্মগ্লানিতে ভরে গেছে আমার অন্তর। উপলব্ধি করেছি, বিরাট অন্যায় করেছি আমি ওর সঙ্গে... আর সেটার প্রতিকারও আমাকেই করতে হবে।'

থামল ও। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হেসে উঠলেন আসাদ। বিদ্রূপের সুরে বললেন, 'এভাবে ভালবাসা প্রকাশ করতে চাইছিলে তুমি? ওকে চিরতরে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে? এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?'

'অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্যি, মহানুভব।'

'খামোশ!' চেঁচিয়ে উঠল মারযাক। 'তোমার কল্প-কাহিনি আর শুনতে চাই না আমরা। আব্বা, এ তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এদের বিয়েটা ছিল ভুয়া... স্রেফ একটা নাটক।'

'তা তো বটেই,' বললেন আসাদ। 'এই মেয়েকে বিয়ের নামে

ইসলাম ধর্মের মজা উড়িয়েছ তুমি, শাকের। বিয়েই নয় ওটা। একটা কৌশল... আমাকে পিছু হটানোর জন্য! আল্লাহ্-র প্রতি আমার অনুরাগের সুযোগ নিয়েছ তুমি। বিশ্বাসঘাতকতা করেছ!' ভিজিটেলোর দিকে তাকালেন তিনি, শাকেরের একটু পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'এই বেঈমানটাকে শেকলে বাঁধো!'

'আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনাকে সুমতি দিয়েছেন!' সোল্লাসে বলে উঠল মারযাক।

কিন্তু আর কেউ সেই উল্লাসের অংশীদার হলো না। সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়... স্থবির হয়ে আছে ঘটনার আকস্মিকতায়। ভিজিটেলোও দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকার ভঙ্গিতে, বাদশাহ্-র হুকুম যেন শুনতেই পায়নি।

আড়চোখে চারপাশটা দেখে মুচকি হাসল শাকের-আল-বাহার ওরফে অলিভার। বলল, 'তা-ই? আমার তো মনে হচ্ছে এই সুমতি তোমাদেরকে পরপারে পাঠিয়ে দেবে!'

হতভম্ব দৃষ্টিতে কর্সেয়ারদের দিকে তাকালেন বাদশাহ্। 'কী হলো? তোমরা কেউ নড়ছ না কেন? আমার হুকুম তামিল করো!'

'থামুন!' গর্জে উঠল অলিভার। অপরাধীর মত আচরণ করছে না আর। এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি হলো বাদশাহ্-র। 'আমাকে অবলা জানোয়ার ভাববেন না, আসাদ। এত সহজে হার মানি না আমি। কোথায় আছেন, তা ভাল করে ভাবুন। আমাকে শুধু গলা চড়াতে হবে, তারপর আল্লাহ্ই জানেন ক'জনকে আপনার পাশে পাওয়া যাবে। পরীক্ষা করে দেখতে চান?'

হিংস্র হয়ে উঠেছে ওর চেহারা। ভয়-ডরের চিহ্ন নেই—উদ্ধত, বেপরোয়া! এর কারণেই শাকের-আল-বাহারকে এত ভয় পায় সবাই।

বাদশাহ্ও ঘাবড়ে গেলেন। মুখ থেকে রক্ত সরে গেল তাঁর। কাঁপতে কাঁপতে গাল দিলেন, 'বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক, বিদ্রোহী...'

'না, ওসবের কোনোটাই নই আমি,' তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল অলিভার। 'যদি বেঈমান হতাম, এতক্ষণ চুপচাপ সহ্য করতাম না এসব। ডাক দিলে আমার পক্ষেই বেশি লোক পাওয়া যাবে, অনেক আগেই বিদ্রোহ করে বসতে পারতাম। আমার নীরবতাই আমার আনুগত্যের সবচেয়ে প্রমাণ, আসাদ! ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করুন পুরো ব্যাপারটা। দয়া করে শাহ্জাদার প্রলাপে কান দেবেন না। ও সারাক্ষণ একপেশে কথা বলছে।'

'ওর কথা শুনবেন না, আব্বা!' চেঁচিয়ে উঠল মারযাক। 'ও আপনাকে...'

'চুপ করো!' ধমকে উঠলেন বাদশাহ্। কুঁকড়ে গেল মারযাক।

শান্ত চোখে অলিভার আর রোজামুণ্ডের উপর নজর বোলালেন আসাদ-আদ-দীন। সফেদ দাড়িতে হাত বোলাতে শুরু করেছেন। ডুবে গেছেন ভাবনায়। বিচার করছেন পরিস্থিতি। ভয় হচ্ছে, হয়তো মিথ্যে বলেনি শাকের ওর সমর্থকদের ব্যাপারে। এখনও বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি সে, কিন্তু ওর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে গেলে সেটা অনিবার্য হয়ে উঠবে। আর এই বিদ্রোহ শুধু জাহাজের নয়, গোটা আলজিয়ার্সের ভাগ্যও নির্ধারণ করবে। পরাজিত হলে আর কোনোদিন মাথা তোলার সুযোগ পাবেন না তিনি, মুসলিমদের রাজ্য শাসন করবে স্বঘোষিত এক বহুরূপী দলত্যাগী। হয়তো থেমে যাবে ইসলামের জয়যাত্রা, মাথা ঝোঁকাতে হবে বিধর্মীদের সামনে। অপরদিকে... যদি জয়ী হতে পারেন, অবস্থান অনেক সুসংহত হবে তাঁর। প্রমাণিত হবে,

আল্লাহ্-র অনুগ্রহ তাঁর দিকে বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু সেজন্যে মূল্য দিতে হবে চড়া। যে-ই জিতুক লড়াইয়ে, বইবে রক্তের নহর। সেটা ভাবলেই বিতৃষ্ণা অনুভব করছেন তিনি। দোটানায় ভুগছেন।

'মালিক?' বিস্কেনের ডাকে ধ্যান ভাঙল বাদশাহ্-র। আদেশের অপেক্ষায় আছে সে। একটা হাত দিয়ে রেখেছে কোমরে ঝোলানো তলোয়ারের হাতলে।

মাথা নাড়লেন আসাদ-আদ-দীন। অলিভারের দিকে তাকালেন। বললেন, 'বেশ, তোমার কথাগুলো ভেবে দেখব আমি। নিশ্চয়তা দিচ্ছি, অবিচার করা হবে না তোমার প্রতি। কেউ আমাকে প্রভাবিতও করতে পারবে না। আল্লাহ্ সাক্ষী! তবে কিছুটা সময় দরকার আমার। আশা করি এর মাঝে উল্টোপাল্টা কিছু ঘটিয়ে বসবে না?'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মহানুভব,' কথা দিল অলিভার।

'শুনে খুশি হলাম।' উল্টো ঘুরে চলে গেলেন আসাদ।

আঠারো

বাজিমাত

বাদশাহ্ চলে যাবার পরেও সবার দৃষ্টি আটকে রইল অলিভার আর রোজামুণ্ডের উপর। মাল্লারা পর্যন্ত উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল

দাঁড় টানার বেঞ্চি থেকে। যুদ্ধ-বিগ্রহ তো নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু স্বয়ং বাদশাহ্ আর শাকের-আল-বাহারের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ জীবনে একবারই আসে।

সাঁঝের ম্লান আলোয় রোজামুণ্ডের দিকে তাকাল অলিভার। ওড়নায় মুখ ঢাকা, কিন্তু দু'চোখে ফুটে আছে রাজ্যের উদ্বেগ। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে বাদশাহ্-র সঙ্গে ওর কথাবার্তা। মুখে হাসি ফুটিয়ে অভয় দিতে চাইল অলিভার, কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হলো না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অলিভার। আর কিছু না হোক, রোজামুণ্ডের বন্দিদশার অবসান ঘটেছে, সেটাই সান্ত্বনা। মাত্র কয়েক ঘণ্টা ওকে বস্তায় রাখতে চেয়েছিল—বাড়ি থেকে জাহাজে আসা পর্যন্ত। পুপ-কেবিনে ঢুকেই মুক্ত করবার কথা ছিল ওকে। কিন্তু আসাদ-আদ-দীনের আগমনে সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। পাটাতনের উপর বস্তাবন্দি হয়ে দিনভর পড়ে থাকতে হয়েছে বেচারিকে—চরম অস্বস্তিকর অবস্থায়। কীভাবে যে সহ্য করেছে, সেটাই আশ্চর্য! বহু আগেই তো চেঁচিয়ে ওঠার কথা ওর, কিংবা নড়ে ওঠার কথা। মারযাকের ফন্দিফিকিরের আগেই উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যাওয়া উচিত ছিল ওর।

'এবার কী?' রোজামুণ্ডের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন শুনে সংবিৎ ফিরে পেল অলিভার।

'কী আর,' কাঁধ ঝাঁকাল ও, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও যে, বস্তা থেকে বেরুতে পেরেছ। চলো, যেখানে তোমার থাকার কথা, সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি। আমার কেবিনে। এসো আমার সঙ্গে।'

পুপ-ডেকে ওঠার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল অলিভার। কিন্তু নড়ল না রোজামুণ্ড। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল উপরদিকে... যেখানে

শামিয়ানার নীচে মারযাককে নিয়ে বসে আছেন আসাদ-আদ-দীন। চারপাশে বিশ্বস্ত অনুচর।

'ভয়ের কিছু নেই,' রোজামুণ্ডের মন পড়তে পেরে বলল অলিভার। 'কেউ কিছু বলবে না তোমাকে। আপাতত বাজিমাত করে দিয়েছি আমি। পরের চাল দেবার আগে শতবার ভাবতে হবে আসাদকে।'

'ভয় নেই?' রোজামুণ্ড যেন নিশ্চিত হতে চাইছে।

'না, নেই... অন্তত এ-মুহূর্তে। পরে কী ঘটবে, সেটা আমাদের উপরেই নির্ভর করছে। একটা কথা জেনে রাখো, ভয় পেলে কোনও উপকার হবে না আমাদের।'

একটু যেন অপমানিত হলো রোজামুণ্ড। রূঢ় গলায় বলল, 'আমি ভীতু নই।'

'তা হলে এসো।'

সাহসের প্রমাণ দেবার জন্যই যেন দৃঢ় পায়ে এগোল রোজামুণ্ড। সিঁড়ি ধরে দু'জনে একসঙ্গে উঠে এল পুপ-ডেকে। একই সঙ্গে রোষ ও সমীহ নিয়ে ওখানকার সবাই তাকাল ওদের দিকে।

আসাদ-আদ-দীনের দৃষ্টি আটকে রইল রোজামুণ্ডের দিকে। ওর প্রতিটা পদক্ষেপ লক্ষ করলেন তিনি, একবারও চোখ সরালেন না। তাঁর দৃষ্টিবাণের সামনে বাহ্যিকভাবে নিজের মর্যাদা বজায় রাখল রোজামুণ্ড, হাঁটল মাথা উঁচু করে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সংকুচিত হয়ে রইল অজানা এক লজ্জা আর অপমানে। অলিভারও ভাগীদার হলো এই অনুভূতির। রাগ হলো ওর, কিন্তু সেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটাল না। শুধু চলে এল রোজামুণ্ডের সামনে, নিজের দেহ দিয়ে ওকে আড়াল করল বাদশাহ্-র দৃষ্টি থেকে।

শামিয়ানার সামনে পৌঁছে থামল ওরা। সালাম দিয়ে অলিভার

বলল, 'অনুমতি দিন, মালিক, যাতে আমার স্ত্রী-কে ওর জন্য নির্ধারিত কামরায় প্রবেশ করাতে পারি।'

মুখ খুললেন না আসাদ, হাতের ইশারায় অনুমতি দিলেন। তাঁকে আবার সালাম জানাল অলিভার, তারপর এগিয়ে গিয়ে সরিয়ে ধরল কেবিনের পর্দা। ভিতরে সোনার প্রদীপ জ্বলছে, এক চিলতে আলো বেরিয়ে এল পর্দার ফাঁক দিয়ে, রোজামুণ্ডের সুগঠিত দেহের অবয়ব প্রকট হয়ে উঠল তাতে।

শেষবারের মত ওকে দেখলেন বাদশাহ্, এরপর কেবিনে ঢুকে পড়ল রোজামুণ্ড। ওকে অনুসরণ করল অলিভার। পর্দা টেনে দিল ভিতরে ঢুকে।

কেবিনের অভ্যন্তর সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। আরামদায়ক একটা বিছানা আছে, মেঝেতে দামি গালিচা। কাঠের তৈরি নকশাদার একটা নিচু টেবিলে জ্বলছে প্রদীপ। আগরবাতিও জ্বালানো হয়েছে কেবিনের কোণে, মিষ্টি সুবাস ভাসছে বাতাসে। আরেক কোণে, ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে শাকের-আল-বাহারের দুই একান্ত ভৃত্য—আবাইদ আর যালযার। পরনের সাদা পোশাক আর পাগড়ি না থাকলে ছায়ায় মিশে যেত ওদের কালো দেহ।

ভৃত্যদের উদ্দেশে নির্দেশ দিল অলিভার। সঙ্গে সঙ্গে কাবার্ড খুলে খাবার বের করল ওরা। টেবিলের উপর রাখল রুটি, মাংস আর ফলমূলের বাটি; সঙ্গে সুপেয় পানির বোতল আর কাপ। পরিবেশন শেষ হলে কোমর থেকে খাপমুক্ত করল তলোয়ার, কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে—বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে।

ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়ল রোজামুণ্ড। মাথা নিচু করল, দু'হাত রাখল কোলের উপর। বসে রইল ওভাবেই। নীরবে ওকে

কিছুক্ষণ দেখল অলিভার।

'খেতে এসো,' একটু পর বলল ও। 'শক্তি আর সাহস প্রয়োজন হবে তোমার। ক্ষুধার্ত শরীরে দুটোর কোনোটাই থাকে না।'

মাথা নাড়ল রোজামুণ্ড। সকাল থেকে অভুক্ত, তারপরেও রুচি হচ্ছে না কিছু মুখে দেবার। গলা বেয়ে উঠে আসছে উদ্বেগ, দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে।

'খেতে পারব না আমি,' বলল ও। 'খেয়ে লাভ কী? শক্তি বা সাহস কোনও কাজে আসবে না আমার।'

'আস্থা রাখো আমার উপর,' বলল অলিভার। 'তোমাকে সুস্থ দেহে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার প্রতিজ্ঞা করেছি আমি, সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।'

ওর কণ্ঠের দৃঢ়তা রোজামুণ্ডকে মাথা তুলতে বাধ্য করল। 'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল ও। 'আর কোনও আশা নেই আমার মুক্তি পাবার।'

'যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ আশা হারিয়ো না।'

মলিন একটা হাসি দেখা দিল রোজামুণ্ডের ঠোঁটে। 'তুমি বেশিক্ষণ বাঁচতে পারবে ভেবেছ?'

'বাঁচা-মরা আল্লাহ্-র হাতে,' বলল অলিভার। 'তিনি না চাইলে কেউই আমার প্রাণ নিতে পারবে না। যদি করুণা দেখান তিনি আমার প্রতি... তোমাকে মুক্ত করা পর্যন্ত যদি বাঁচতে পারি, তা হলেই আমি সন্তুষ্ট।'

আবারও মাথা নিচু হয়ে গেল রোজামুণ্ডের, কেঁপে উঠল একটু। 'আমাদের দুজনেরই ভাগ্য এক সুতোয় বাঁধা পড়ে গেছে, অলিভার,' দুখি গলায় বলল ও। 'কারণ তুমি যদি মারা যাও,

আমিও বাঁচব না। তোমার ছোরাটা আছে আমার সঙ্গে!'

আবেগ উথলে উঠল অলিভারের বুকে। এগোতে গেল রোজামুণ্ডের দিকে, কিন্তু থেমে গেল মেয়েটার পরের কথা শুনে। না, ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল না ওটা... ভুল অর্থ করেছে ও। প্রেমিকের শোকে আত্মহত্যা করবার কথা বলেনি রোজামুণ্ড।

'আশা করি ঈশ্বর ক্ষমা করবেন আমাকে—সম্মান বাঁচানোর জন্য অমন একটা পদক্ষেপ নেয়ায়,' বলে চলেছে ও। 'একটা মেয়ের জন্য নিজের সম্মানের চেয়ে বড় আর কী আছে?'

'আমি জানি,' বিমর্ষ গলায় বলল অলিভার। 'তোমার জায়গায় আমি থাকলেও একই কাজ করতাম।'

একটু থামল ও। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রোজামুণ্ডের দিকে। একটা কিছু আশা করছে ওর কাছ থেকে। ভালবাসা না হোক, ওকে ক্ষমা করে দেবার ঘোষণা। কিন্তু নীরব রইল মেয়েটা। মাথাই তুলল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রসঙ্গ পাল্টাল অলিভার।

'এখানে তোমার দরকারি সবকিছুই পাবে,' বলল ও। 'তারপরেও যদি আর কিছুর প্রয়োজন হয়, করতালি দিয়ো। আমার ভৃত্যরা সারাক্ষণ বাইরে থাকছে, জবাব দেবে। ফরাসি ভাষায় কথা বললে বুঝতে পারবে ওরা। তোমার সেবা-যত্নের জন্য একজন দাসী আনা গেলে ভাল হতো, কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল না... জানোই তো।' কথা শেষ করে দরজার দিকে পা বাড়াল।

'তুমি চলে যাচ্ছ?' আতঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল রোজামুণ্ড।

'হ্যাঁ। তবে কিচ্ছু ভেবো না, আমি সবসময় তোমার আশপাশেই থাকব। আপাতত ভয় পাবার কিছু নেই, অন্তত বস্তার সময়টার চেয়ে ভালভাবে এবং নিরাপদে আছ তুমি। বিশ্রাম নাও, খাওয়াদাওয়া করো। আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করুন।

কাল সকালে আবার দেখা করব আমি।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে পিতা-পুত্রকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় শামিয়ানার নীচে দেখতে পেল অলিভার। সঙ্গীরা চলে গেছে। রাত নেমে এসেছে তখন। জ্বেলে দেয়া হয়েছে স্টার্ন রেইলে ঝোলানো বড় বড় লণ্ঠনগুলো। মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়েছে জাহাজের পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে। এখানে-ওখানে নেচে বেড়াচ্ছে ছায়া। মাঝে মাঝে চকচক করে উঠছে মাল্লাদের বেঞ্চিতে বসা ক্রীতদাসদের ঘর্মাক্ত পিঠ। তন্দ্রায় ঢুলছে তারা। মূল মাস্তুলের ডগায়ও জ্বালানো হয়েছে একটা লণ্ঠন। বাদশাহ্-র সুবিধের জন্য আরেকটা ঝোলানো হয়েছে পুপ-ডেকের রেলিঙে। মাথার উপরে কালো আকাশের বুকে মিটিমিটি করছে তারার দল। বাতাস পড়ে গেছে, গোটা পৃথিবী ডুবে গেছে নৈঃশব্দ্যে। খাঁড়ির পানির ছলাৎ-ছল ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই কোথাও।

আসাদ-আদ-দীনের পাশে গিয়ে মাথা ঝোঁকাল অলিভার, কথা বলতে চাইল একান্তে।

'একাই আছি আমি,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন বাদশাহ্।

'অ! মারযাককে তা হলে গোনায় ধরেন না?' খোঁচা মারার সুরে বলল অলিভার। 'আমিও তা-ই ভেবেছিলাম।'

দাঁত খিঁচাল মারযাক, গর গর করে উঠল রাগে। সেনাপতির বিদ্রূপাত্মক কথায় বিস্মিত হয়ে মাথা ঘোরালেন আসাদ। লোকটার মধ্যে কি ভয়-ডর বলে কিছু নেই?

'একজন পিতার জন্য পুত্র তার আত্মার অংশ,' বললেন তিনি। 'মারযাকের কাছে কিছু গোপন করতে চাই না আমি। কিছু বলতে চাইলে ওর সামনেই বলো। নইলে বিদায় হও।'

'ও আপনার আত্মার অংশ হতে পারে, হে আসাদ,' বলল অলিভার, 'কিন্তু আমার নয়... আল্লাহ্‌কে হাজার শোকর! যা

বলতে চাইছি, তার সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক আছে, কাজেই বাইরের কাউকে তা শোনানো চলে না।'

'ধন্যবাদ, শাকের,' বিদ্রূপ করল মারযাক, 'আমাকে তোমার সঙ্গে না জড়াবার জন্য! আর যা-ই হই, একটা বিধর্মী বেঈমান কুকুরের অংশ হব না আমি কোনোদিনই।'

'তোমার ওটা জিভ তো না, যেন বিষ মাখানো তীর!' তিরস্কারের সুরে বলল অলিভার।

'তীর হলে ওটা তোমার বিশ্বাসঘাতকতাকে ছিন্ন করে দেবে।'

'উঁহুঁ,' মুখ টিপে হাসল অলিভার। 'তোমার নিশানা তো দেখেছি, এই তীরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। আল্লাহ্ ক্ষমা করুন আমাকে! তোমার এসব কথায় কি রাগ করব আমি? বারংবার কি প্রমাণ হয়ে যায়নি, আমাকে যারা বেঈমান ভাবে, তারাই আসলে মিথ্যেবাদী? বোকা ছেলে, জিভের লাগাম টানতে শেখো, নইলে আল্লাহ্ তোমাকে বোবা বানিয়ে দেবেন।'

'থামো!' ধমকে উঠলেন বাদশাহ্। 'বাড়াবাড়ি করছ তুমি, শাকের!'

'হয়তো। সেজন্যে ক্ষমা চাইছি।' কাঁধ ঝাঁকাল অলিভার। 'আপনি যখন আত্মার অংশকে পাশ-ছাড়া করতে চাইছেন না, তখন দেখছি ওর সামনেই কথা বলতে হবে। অনুমতি পেলে একটু বসি?'

বাদশাহ্ কিছু বললেন না। মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ভেবে হাঁটু গেড়ে তাঁর পাশে বসল অলিভার।

'মহানুভব,' বলল ও। 'খামোকা একটা বিভেদ রচিত হচ্ছে আমাদের মাঝখানে, অথচ ইসলামের বিজয়ের জন্য একত্র থাকা দরকার আমাদের।'

'এর জন্যে তুমিই দায়ী, শাকের-আল-বাহার,' রুষ্ট গলায় বললেন বাদশাহ্। 'এর প্রতিকারও তোমাকেই করতে হবে।'

'এ-ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি। আমাদের মনোমালিন্যের উৎস ওখানে!' ইশারায় পুপ-কেবিনের দরজা দেখাল অলিভার। 'ওই উৎসকে যদি বিদায় করা যায়, তা হলে আমাদের মধ্যকার বিভেদও বিদায় হয়ে যাবে।'

খুব যে আশাবাদী হয়ে কথাগুলো বলছে ও, তা নয়। অলিভার খুব ভাল করে জানে, ওর আর বাদশাহ্-র মাঝের সম্পর্ক আর কোনোদিন স্বাভাবিক হবে না। নিজের পায়ে কুড়াল মেরে বসেছে ও, আসাদ-আদ-দীনের বুকে ঢুকিয়ে দিয়েছে ওর ক্ষমতা নিয়ে ভয়। বেকায়দা পরিস্থিতির মুখে হার মানতে বাধ্য হয়েছেন তিনি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ভবিষ্যতে দ্বিতীয় কোনও সুযোগ দেবেন ওকে। আলজিয়ার্সে ফেরামাত্র এর একটা হেস্তনেস্ত করা হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একটাই পথ আছে পরিত্রাণের—জাহাজে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসতে হবে। এখানেই আসাদকে বন্দি বা হত্যা করতে হবে। দখল করতে হবে ক্ষমতা। বাদশাহ্ও একই আশঙ্কা করছেন। এর উপর নির্ভর করেই নতুন পরিকল্পনা এঁটেছে অলিভার। দ্বন্দ্ব মেটাবার প্রস্তাব দিলে হয়তো মেনে নেবেন আসাদ—মন থেকে না হলেও, আসন্ন বিপদ এড়াবার জন্য তো বটেই। অন্তত নিরাপদে বাড়ি ফেরার জন্য খড়কুটোও আঁকড়ে ধরবেন তিনি।

চুপ করে একটু ভাবলেন বাদশাহ্। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কীভাবে বিদায় করবে ওই উৎসকে? ভুল স্বীকার করে তালাক দেবে ওকে? তুলে দেবে আমার হাতে?'

'অমন কোনও কথা বলিনি আমি,' বলল অলিভার। 'কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখুন, হে আসাদ, আল্লাহ্-র প্রতি কী আপনার

দায়িত্ব। ভাবুন আমাদের ঐক্য ইসলামের বিজয়ের জন্য কতখানি জরুরি। সামান্য এক মেয়ের জন্য সেই ঐক্য ভেঙে যাওয়া কি দুঃখজনক নয়? কী জবাব দেবেন আপনি আল্লাহ্-র কাছে? তারচেয়ে আমার প্রস্তাব শুনুন। মেয়েটাকে নিয়ে কী করতে চাইছি আমি, তা তো জেনেছেন। চলুন, কাল সকালে রওনা দিই আমরা ইয়োরোপের দিকে। সন্ধে নাগাদ ফ্রান্সের উপকূলে পৌঁছে যাব। মেয়েটাকে ওখানে নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসব স্প্যানিশ জাহাজে হামলা চালাবার জন্য। ইনশাল্লাহ্, জয় হবে আমাদের। জাহাজ-ভর্তি সোনা নিয়ে ফিরতে পারব আলজিয়ার্সে। মেয়েটা আর থাকবে না, আপনিও ভুলে যাবেন আজকের এই ছোট্ট ঘটনা। সব আবার আগের মত হয়ে যাবে, মহানুভব। বলুন, রাজি আছেন আপনি? আল্লাহ্র জন্য... ইসলামের জন্য?'

অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে টোপ ফেলেছে অলিভার। বাদশাহ্ তো বটেই, এমনকী ধূর্ত মারযাকও বুঝল না ওর প্রস্তাবের মর্মার্থ। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে আসলে নিজের প্রাণের বিনিময়ে রোজামুণ্ডের জীবন কিনে নেবার প্রস্তাব দিয়েছে ও।

প্রস্তাবটা খতিয়ে দেখতে শুরু করলেন আসাদ। গম্ভীর হয়ে গেলেন। স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বলছে, রাজি হয়ে যাওয়া উচিত। জলে নেমে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করলে নিজেরই ক্ষতি। তারচেয়ে শাকেরের সঙ্গে মীমাংসা করে যদি আলজিয়ার্সে ফেরা যায়, তা হলে পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে চলে আসবে। কারও সাহায্য পাবে না তখন লোকটা, ধরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া যাবে। বেঈমান সেনাপতিকে শায়েস্তা করবার জন্য এটাই সবচেয়ে সহজ এবং বুদ্ধিমত্তার পথ। কিন্তু তারপরেও মন খুঁত খুঁত করছে তাঁর।

চুপচাপ বাদশাহ্-র মুখভঙ্গি জরিপ করল অলিভার। ক্ষণে চিন্তার ছাপ পড়ছে ওতে, দেখা যাচ্ছে সিদ্ধান্তহীনতার ছায়া। ব্যাপারটা বেশিক্ষণ সহ্য হলো না মারযাকের। বিপদ সম্পর্কে ও-ও সচেতন, এত সহজে সেটা এড়াবার প্রস্তাব ওর পিতা ফিরিয়ে দেন কি না, এই ভয়ে বলে উঠল:

'এতদিনে শাকের একটা ভাল কথা বলেছে, আব্বা! সবার উপরে ইসলামের পতাকা! যা খুশি করতে দিন ওকে—যেতে দিন নাসরানি মেয়েটাকে। তাতে যদি আপনাদের ঝগড়া মিটে যায়, আপত্তি করবার দরকার কী?'

বুঝতে অসুবিধে হলো না বাদশাহ্-র, তাঁর ছেলেও একই ধারায় চিন্তাভাবনা করছে। প্রস্তাবটা মেনে নেবার ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠল মনের ভিতরে, কিন্তু ইতস্তত করলেন অন্য একটা কথা ভেবে। মানসচোখে দেখতে পাচ্ছেন অপূর্ব এক চেহারা, ঈর্ষণীয় এক দেহসৌষ্ঠব। মেয়েটাকে হাতছাড়া করতে মন চাইছে না কিছুতেই। দোটানায় ভুগছেন সে-কারণে। পুরুষসুলভ কামনার সামনে হার মানতে বসেছে বুদ্ধিমত্তা। বুঝতে পারছেন না কোন্টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ—আলজিয়ার্সে পৌঁছে শাকেরকে শাস্তি দেয়া, নাকি স্ত্রী হিসেবে সুন্দরী ওই মেয়েটিকে পাওয়া।

একটু ঝুঁকলেন আসাদ-আদ-দীন। চোখ রাখলেন অলিভারের চোখে।

'একটা প্রশ্ন আছে আমার,' বললেন তিনি। 'মেয়েটাকে যদি না-ই চাও তুমি, আমাকে গতকাল কেন হটিয়ে দিলে? তখন ভেবেছিলাম ওকে তুমি বউ করতে চাইছ... খাঁটি মুসলমানের মত সংসারধর্ম শুরু করতে চাইছ। কিন্তু এখন তো জানি—বিয়েটা ছিল স্রেফ একটা কৌশল... একটা নাটক! ওটা কোনও বিয়েই না। কাজেই মেয়েটাও আর তোমার নয়। যে কেউ এখন ওকে

নিজের দখলে নিয়ে নিতে পারে।'

হাসল অলিভার। 'ওকে দখল করার আগে আমার তলোয়ারের স্বাদ পরখ করতে হবে, মহানুভব।' কথাটা প্রমাণ করবার জন্যই যেন ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল, খাপ থেকে বের করে আনল নিজের তলোয়ার।

আসাদও উঠে দাঁড়ালেন। রাগী গলায় বললেন, 'হুমকি দিচ্ছ?'

'হুমকি দিচ্ছি না, ভবিষ্যদ্বাণী করছি।' হালকা গলায় বলল অলিভার। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। সরে এল শামিয়ানার তলা থেকে। আর মুখ খরচ করার মানে হয় না। উদ্দেশ্য মোটামুটি সফল হয়েছে। বাদশাহ্‌কে রাজি করাতে পারেনি বটে, তবে ওর প্রস্তাব নাকচও করে দেননি তিনি। অন্য কিছু যেন করতে না যান... মানে রোজামুণ্ডের দিকে হাত না বাড়ান... সে-ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে ফেলেছে। একটাই পথ এখন আসাদের সামনে—রোজামুণ্ডকে যেতে দেয়া... অলিভারের প্রস্তাব মেনে নেয়া। দেখা যাক, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে তিনি সেটা অনুধাবন করতে পারেন কি না।

রাগে জ্বলতে জ্বলতে ওকে চলে যেতে দেখলেন আসাদ। একবার ভাবলেন ফিরে আসার হুকুম দেবেন, পরক্ষণে মত পাল্টালেন। যে-রকম তেজ দেখা যাচ্ছে শাকের-আল-বাহারের মধ্যে, হয়তো সবার সামনেই অগ্রাহ্য করবে তাঁর আদেশ। অমান্য হবার সম্ভাবনা থাকলে আদেশ না দেয়াই ভাল। তাতে নিজের মান-সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে।

পিতার ইতস্তত ভাব লক্ষ করে উঠে দাঁড়াল মারযাক। তাঁর বাহু ধরে জিজ্ঞেস করল, 'কী এত ভাবছেন, আব্বা? এটাই তো সবচেয়ে ভাল পন্থা! সাদা একটা ডাইনির জন্য সবাইকে বিপদে

ফেলার কোনও মানে হয় না। ও বিদায় হয়ে গেলেই বরং সবার মঙ্গল। আলজিয়ার্সে ফিরতে পারব নিরাপদে। শাকেরকে শাস্তি দিয়ে একটা দৃষ্টান্তও স্থাপন করা যাবে। ভবিষ্যতে কেউ কোনোদিন আপনার বিরুদ্ধে মাথা তোলার সাহস পাবে না। পায়ে পড়ি আপনার, রাজি হয়ে যান!'

ছেলের মুখের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন আসাদ। বললেন, 'আমি কাপুরুষ নই যে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সহজ রাস্তা খুঁজব। এমন একটা অনুরোধ জানিয়ে তুমি নিজের দুর্বলতাই শুধু প্রকাশ করছ, মারযাক।'

'আমি শুধু আপনাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন, আব্বা। এখন তো ঘুমানোও নিরাপদ নয়। আমরা ঘুমিয়ে গেলে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে শাকের।'

'ভয় পেয়ো না, আমি নিজেই পাহারা ঠিক করেছি। আমার নিজস্ব অনুচরেরা সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত। বিস্কেনও এ-মুহূর্তে লোকজনের মতামত জানতে গেছে। খুব শীঘ্রি বোঝা যাবে, আমাদের অবস্থান কোথায়।'

'নিশ্চিত হবার তো উপায় নেই। আপনার জায়গায় আমি হলে শাকেরের দাবি মেনে নিতাম, যাতে পরে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করা যায়।'

'ফ্র্যাঙ্কিশ মুক্তোটাকে হাতছাড়া করতে বলছ?' মাথা নাড়লেন আসাদ। 'না, না, এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নই আমি। ও-ই এখন তুরুপের তাস... ওকে ছেড়ে দেয়ামাত্র শাকেরের সঙ্গে দর কষাকষির একমাত্র অস্ত্রটা হারাব আমরা। চেষ্টা করতে ক্ষতি কী? দু'কূলই যদি রক্ষা করা যায়...'

'ও একটা বিধর্মী, আব্বা,' যুক্তি দেখাল মারযাক। 'এমন মেয়ে খাঁটি মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। ওর নাঙ্গা চেহারা বহু

পুরুষ দেখেছে। এমনকী এক দফা বিয়েও হয়ে গেছে ওর। এমন একজনকে কী করে আপনি এখনও ঘরে তুলতে চান? সবচেয়ে বড় কথা, ওই মেয়ে আপনার জীবন আর বাদশাহী... দুটোর জন্যই বিপজ্জনক!'

ঠোঁট কামড়ালেন আসাদ-আদ-দীন। শাহজাদার প্রতিটা কথা সত্য। আসলেই বোকামি করছেন তিনি। ক্ষণিকের উন্মাদনার সামনে হারিয়ে বসেছেন বিচার-বুদ্ধি। কেন করছেন এসব? শুধুই কি সুন্দরী একটি মেয়েকে পাবার জন্য? ভাল করে ভাবতেই বুঝলেন, না... ব্যাপার তা নয়। মেয়েটি উপলক্ষ্যমাত্র। আসলে তিনি শাকেরের চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছেন। জীবনে এই প্রথমবারের মত কেউ তাঁর মুখের উপর বিরুদ্ধাচরণ করবার মত স্পর্ধা দেখিয়েছে। তাকে সবদিক থেকে পরাস্ত করতে না পারলে শান্তি পাবেন না তিনি। মেয়েটিকে কেড়ে নেবেন... সেইসঙ্গে কেড়ে নেবেন শাকের-আল-বাহারের জীবন!

পুত্রকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে গেলেন বাদশাহ্, কিন্তু বাধা পেলেন দীর্ঘদেহী বিস্কেন-আল-বোরাক হাজির হওয়ায়। কাছে এসে কুর্নিশ করল সে।

'খবর বলো!' অধৈর্য কণ্ঠে বললেন আসাদ।

'খুব কঠিন একটা দায়িত্ব দিয়েছেন আপনি, মালিক,' বিস্কেন বলল। 'খোলাখুলি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা সম্ভব নয়, আভাসে-ইঙ্গিতে কথা বলতে হয়েছে। কার সমর্থন কোন্‌দিকে, তা বোঝা মুশকিল। সবাই মুখে তালা এঁটে রেখেছে। এখুনি কারও পক্ষ নিয়ে পরে বিপদে পড়তে চায় না।'

'ভণিতা না করে আসল কথা বলো।'

'আসল কথা হলো, নিশ্চিত হবার উপায় নেই, মালিক। না আমাদের, না শাকের-আল-বাহারের। আমার ধারণা, মিথ্যে

হুমকি দিয়েছে ও। সত্যি সত্যি যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হবে ওকে। এটুকু অনুমান করতে পারি।'

'এ-ই?' বিরক্ত হলেন বাদশাহ্। 'এখুনি শাকেরকে বন্দি করে ঝামেলা মেটাতে পারব না?'

'আল্লাহ্ আপনার পক্ষে থাকবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' ইতস্তত করে বলল বিস্কেন। 'তারপরেও আমি আপনাকে অমন পরামর্শ দেব না। বললাম তো, নিশ্চিত হবার উপায় নেই। খামোকা ঝুঁকি নেবার কোনও মানে হয় না। শাকেরকে বন্দি করতে গেলে লড়াই বাধবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'হুম,' গম্ভীর হয়ে গেলেন আসাদ। 'তারমানে সেয়ানে-সেয়ানে অবস্থা আমাদের। ভাগ্য-পরীক্ষা করতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

'আপনি যা বলেন, মালিক।'

'তা হলে তো আর চিন্তাভাবনার কিছু নেই,' বলে উঠল মারযাক। 'শাকেরের প্রস্তাব মেনে নিন। তারপর...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন আসাদ। 'সবকিছুরই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। এখুনি তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ঠিক আছে, ব্যাপারটা ভেবে দেখব আমি।'

বাদশাহ্-র জানা নেই, নীচের পাটাতনে ভিজিটেলোর সঙ্গে একই ধরনের আলোচনা করছে অলিভার। দু'জনে পায়চারি করছে একসঙ্গে।

'আমি কোনও পরামর্শ দিতে পারব না,' বলল ইটালিয়ান সারেং। 'তবে এটুকু বুঝতে পারছি—আপনি বা বাদশাহ্... কারুরই উচিত হবে না এ-মুহূর্তে সংঘাতে যাওয়া।'

'বলতে চাইছ, দু'পক্ষই সমানে সমান?' জিজ্ঞেস করল অলিভার।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ভিজিটেলো। 'সংখ্যার দিক থেকে বাদশাহ্-র দল ভারী হবে বলে আশঙ্কা করছি। সুস্থ মস্তিষ্কে কোনও খাঁটি মুসলমান তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াবে না। যতকিছুই হোক, আসাদের প্রতি আনুগত্য মানে ধর্মের প্রতি আনুগত্য। ওঁর বিরোধিতা করে অবিশ্বাসীর দলে নাম লেখাতে চাইবে না ওরা। কিন্তু কথা হলো, আপনার ডাকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অভ্যস্ত সবাই... অভ্যস্ত প্রাণ দেবার জন্য। বাস্তবতার বিচারে ওদের জন্য আপনিই আসল নেতা। এ-কারণে বাদশাহ্ সাহস পাচ্ছেন না এখুনি কোনও পদক্ষেপ নিতে।'

'হুম, ঠিকই বলেছ,' একমত হলো অলিভার। 'শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে সত্যিকার যোদ্ধাকে দলে টানা কঠিন। নেতার প্রতি অনুরাগও ওদের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক আছে, যেতে পারো তুমি।'

পুপ-ডেকে ফিরে গেল অলিভার। একটাই আশা—আসাদ হয়তো মেনে নেবেন ওর প্রস্তাব। যদিও তার বিনিময়ে নিজের জীবন চলে যাবে, কিন্তু তা নিয়ে এতটুকু দুঃখ নেই। বাদশাহ্-র কাছে আর গেল না ও, গেলে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। ওর চাল ও দিয়ে ফেলেছে, এবার প্রতিপক্ষের পালা। ধৈর্য ধরতে হবে অলিভারকে। সবুরে মেওয়া ফলে। কিন্তু তারপরেও যদি একগুঁয়ের মত নিজের জেদ ধরে রাখেন আসাদ, কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করেন... একটামাত্র বিকল্প থাকবে সামনে। হ্যাঁ, বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে ওকে। একবারের জন্যও অলিভার ভাবছে না, সে-বিদ্রোহ সফল হতে পারে। বরং ভয়ানক পরিণতি ঘটবার সম্ভাবনাই বেশি। নিজে তো মরবেই, রোজামুণ্ডের ভাগ্যও আটকা পড়বে বাদশাহ্-র হাতে।

খুবই কঠিন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে অলিভার।

সবকিছু নির্ভর করছে আসাদ-আদ-দীনের বিচারবুদ্ধির উপর। আগ্রাসী পদক্ষেপ নিতে গেলে কী ঘটতে পারে, সেটা ভেবে হয়তো নিরস্ত থাকবেন তিনি। নইলে সব শেষ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরদিন কী ঘটতে পারে, তা নিয়ে ভাবল অলিভার। সন্দেহ নেই, অভিযান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেবেন বাদশাহ্। আর যা-ই করুন, সোনা-ভরা স্প্যানিশ গ্যালিয়নটাকে ছাড়বেন না তিনি কিছুতেই। কথা হলো, তার আগে রোজামুণ্ডকে মুক্তি দেবেন কি না।

হঠাৎ একটা চিন্তা এল অলিভারের মাথায়। বুঝল, আশা পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। রোজামুণ্ডকে যদি ফ্রান্সে না-ও নামান আসাদ, আরেকটা সুযোগ পাবে ও। স্প্যানিশ জাহাজটাকে দখল করার সময় যুদ্ধ হবে। তক্কে তক্কে থাকতে হবে তখন। বলা যায় না, লড়াইয়ের ফাঁকে বিপদ থেকে পরিত্রাণের একটা সুযোগ পেয়েও যেতে পারে!

পুপ-কেবিনের দরজার সামনে, পাটাতনে বসে রাত কাটাল অলিভার। ঘুমাল ওখানেই। দুই কাফ্রি ভৃত্য রাতভর পাহারা দিল ওকে আর রোজামুণ্ডকে। পুবের আকাশে লালিমা দেখা দিলে জাগল ও, দুই ভৃত্যকে বিশ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেই নিল রোজামুণ্ডকে পাহারার দায়িত্ব। তাকাল চারপাশে।

পুপ-ডেকের শামিয়ানার নীচে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন মহাপ্রতাপশালী আসাদ-আদ-দীন ও তাঁর পুত্র। অনড় পাহাড়ের মত তাঁদেরকে পাহারা দিচ্ছে বিস্কেন-আল-বোরাক... শাকেরের এককালের সহকারী। ওকে তাকাতে দেখেই দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল লোকটা।

উনিশ

বিদ্রোহী

ভালমত আলো ফোটার পর জ্যান্ত হয়ে উঠল গোটা জাহাজ। নাবিকরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে। কিছুটা সময় অপেক্ষা করার পর রোজামুণ্ডের সঙ্গে দেখা করল অলিভার।

খাওয়াদাওয়া আর বিশ্রামের সুফল লক্ষ করা গেল মেয়েটার মাঝে। দু'গালের রঙ ফিরে এসেছে। সতেজও দেখাচ্ছে ওকে। আন্তরিক ভঙ্গিতে অভিবাদন জানাল অলিভারকে। অবশেষে বুঝতে পেরেছে, লোকটা তার শত্রু নয়। ওকে আশার বাণী শোনাল অলিভার, সবকিছু ভালভাবে এগোচ্ছে বলে জানাল। সাহস রাখতে বলল। মনোযোগ দিয়ে সব শুনল রোজামুণ্ড, কিন্তু ধন্যবাদ জানাল না। বিরূপ আচরণ না করলেও ভুলতে পারছে না—এসব অলিভারের কারণেই ঘটছে।

দুপুরে আবার এল অলিভার, তবে তখন আর নতুন করে কোনও আশা দিতে পারল না। খবর বলতে একটাই, পাহাড়চূড়ার পাহারাদার একটা জাহাজের পাল দেখতে পেয়েছে, তবে ওটা ওদের প্রত্যাশিত স্প্যানিশ গ্যালিয়নের নয়। সেইসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে জানাল, রোজামুণ্ডকে ফ্রান্সে নামিয়ে দেবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন বাদশাহ্। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই,

দ্রুত যোগ করল ও, খুব শীঘ্রি একটা না একটা উপায় বেরিয়ে যাবে। সুযোগের সন্ধানে রয়েছে অলিভার, সামান্যতম সম্ভাবনাও হাতছাড়া করবে না।

'আর যদি কোনও সুযোগ পাওয়া না যায়?' জিজ্ঞেস করল রোজামুণ্ড।

'তা হলে একটা তৈরি করে নেব,' হালকা গলায় বলল অলিভার। 'বড়াই করছি না, তবে কৌশল খাটানোয় আমি একটা প্রতিভা। জীবনভর একের পর সুযোগ তৈরি করে নিতে হয়েছে আমাকে। অথচ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সে-প্রতিভা কাজে লাগবে না, এমনটা হতেই পারে না।'

জীবনের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় একটা প্রশ্ন না করে পারল না রোজামুণ্ড।

'কী কৌশল খাটিয়েছ তুমি আজকের এই অবস্থায় আসার জন্য?' জিজ্ঞেস করল ও। 'মানে... কর্সেয়ার ক্যাপ্টেন হলে কী করে?'

'লম্বা কাহিনি,' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল অলিভার। 'শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে যাবে তুমি।'

'না, হব না,' মাথা নাড়ল রোজামুণ্ড। 'প্লিজ, সব খুলে বলো আমাকে। এমন সুযোগ হয়তো পরে আর পাব না।'

'লাভ কী শুনে?' বলল অলিভার। 'আমার ব্যাপারে তোমার ধারণা কি পাল্টাবে তাতে?'

'পাল্টাতেও তো পারে!' মৃদু গলায় বলল রোজামুণ্ড। নামিয়ে নিল চোখ।

মাথা নিচু করে কেবিনের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত হাঁটল অলিভার। রোজামুণ্ডকে নিজের কাহিনি বলবে কি না ভাবছে। অস্বীকার করবার উপায় নেই, এই তাগিদ বহু আগেই

অনুভব করেছে ও। কোনও কিছু না জেনে এতদিন ওকে ঘৃণা করে এসেছে মেয়েটা, সব জানার পরে হয়তো নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করতে পারবে।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল। একটা চেয়ার টেনে রোজামুণ্ডের সামনে বসল অলিভার। ধীরে ধীরে খুলে বলল সব ঘটনা। কীভাবে অপহৃত হয়েছিল, কীভাবে স্প্যানিশ জাহাজে মাল্লা হিসেবে ছ'মাস কাটিয়েছিল, তারপর কীভাবে উদ্ধার পেয়েছিল কর্সেয়ারদের মাধ্যমে... স-অ-ব! মনের দুঃখকষ্টের কথাও বলল—ব্যাখ্যা করল ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতা আর রোজামুণ্ডের প্রত্যাখ্যান কীভাবে আগুন জ্বেলেছিল ওর বুকে। ঝুঁকি নিয়ে কীভাবে ইংল্যাণ্ডে অভিযান চালিয়েছে ওদেরকে ধরে আনার জন্য, তারপর আলজিয়ার্সে কী ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে... তা-ও জানাল।

সবকিছু সহজ ভাষায়, সংক্ষেপে বর্ণনা করল অলিভার। তবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একটাও বাদ দিল না। ক্ষণে ক্ষণে গলা ভারী হয়ে এল ওর, এক পর্যায়ে আর বসে থাকতে পারল না, আবেগাপ্লুত অবস্থায় পায়চারি করতে করতে বলে গেল নিজের কাহিনি। লক্ষ করল না, ওর কথা শুনে চোখ ভিজে উঠেছে রোজামুণ্ডের, প্রাণপণ চেষ্টা করছে মেয়েটা অশ্রু লুকাতে।

'এ-ই ছিল আমার কাহিনি,' উপসংহারে বলল অলিভার। এখন তুমি জানলে, কোন্ পরিস্থিতিতে... কীভাবে আমি আজকের এই অবস্থায় এসেছি। অস্বীকার করব না, আমার চেয়ে দৃঢ় মনোবলের অন্য কেউ যদি পড়ত এমন অবস্থায়, হয়তো বুক চিতিয়ে বরণ করে নিত মৃত্যুকে... অন্তত ধর্মত্যাগ করে জলদস্যুর জীবন বেছে নিত না। কিন্তু কী করব, অত শক্তি নেই আমার মধ্যে। মৃত্যুর চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়েছি আমি

প্রতিহিংসাকে। যার জন্য আমার এই দুর্দশা... সেই লায়োনেলকে শাস্তি না দিয়ে কবরে যাবার কথা ভাবতেও পারিনি আমি!'

'সেইসঙ্গে আমাকে... তুমি নিজেই বলেছ সে-কথা,' যোগ করল রোজামুণ্ড।

'ভুল,' অলিভার শুধরে দিল, 'আমার পরিণতির জন্য তুমি তো সরাসরি দায়ী ছিলে না। হ্যাঁ, রাগ হয়েছিল আমার—আমাকে অবিশ্বাস করেছিলে বলে... সবকিছু ব্যাখ্যা করে আমার পাঠানো চিঠি আগুনে ফেলে দিয়েছিলে বলে। কিন্তু এখন আমি জানি, তোমাকে ভুল বোঝানো হয়েছিল—কৌশল খাটিয়ে তোমাকে বাধ্য করা হয়েছিল আমাকে দোষী ভাবতে। তাই ক্ষমাও করে দিয়েছি তোমাকে। ক্ষমা যদি না-ও করতাম, জেনেশুনে তোমাকে এই নরকে আমি কখনোই আনতাম না।'

'এনেছ তো! বাদশাহ্-র কুদৃষ্টির কথা বাদ দাও, তারপরেও নিশ্চয়ই জানতে কী ঘটবে আমার কপালে? আমাকে ক্রীতদাসী হতে হবে, এটা জানতে না তুমি?'

'জানতাম। আর সে-কারণেই তোমাকে অপহরণ করবার ইচ্ছে ছিল না আমার মনে।'

'ইচ্ছে ছিল না? তা হলে কেন...'

'বলছি। আমি আসলে রেগে গিয়েছিলাম সে-রাতে... আরওয়েনাকের ডাইনিং হলে লায়োনেলের সঙ্গে তোমাকে দেখতে পেয়ে। খুব খারাপ একটা কাজ করেছি তখন—ক্ষণিকের উত্তেজনার কাছে হার মেনেছি। তুমিও আজেবাজে কথা বলে আমার রাগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু সেই জেদের মাশুল আজ আমাকে কড়ায় গণ্ডায় চুকাতে হচ্ছে। নিজের চোখেই তো দেখছ।' তীব্র বিষাদ ভর করল অলিভারের চেহারায়।

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি আমি,' সহানুভূতির সুরে বলল রোজামুণ্ড।

দৃষ্টি একটু উজ্জ্বল হলো অলিভারের। 'বুঝতে পারছ? তা হলে ক্ষমা পাবার পথে এক পা হলেও এগিয়েছি আমি। কিন্তু না, যে-অন্যায় করেছি, তার পুরোপুরি প্রায়শ্চিত্ত করবার আগে আমি তোমার কাছ থেকে ক্ষমা আশা করব না।'

'যদি সম্ভব হয় আর কী,' বলল রোজামুণ্ড।

'সম্ভব করেই ছাড়ব!' দৃঢ় গলায় বলল অলিভার, পরমুহূর্তে থমকে গেল। বাইরে থেকে একটা চিৎকার ভেসে এসেছে।

লারোকের কণ্ঠ চিনতে পারল ও, পাহাড়চূড়া থেকে নেমে এসেছে লোকটা, উত্তেজিত ভঙ্গিতে চেঁচাচ্ছে বাদশাহ্-র উদ্দেশে। তাড়াতাড়ি কেবিন থেকে বেরিয়ে এল অলিভার। ওয়েইস্ট-ডেকে মারযাক আর বিশ্বস্ত বিস্কেনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আসাদ-আদ-দীন, তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখল ফরাসি সারেং-কে। তাড়াতাড়ি রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও, যাতে লোকটার কথা শোনা যায়।

দৌড়ে বাদশাহ্-র সামনে এসে ত্রস্ত ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল লারোক।

'কী ব্যাপার? এত উত্তেজিত কেন তুমি?' জানতে চাইলেন আসাদ।

'মালিক... সকালে দেখা সেই জাহাজটা...' হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে শুরু করল লারোক, দম ফিরে পাবার জন্য থেমে গেল মাঝপথে।

'কী হয়েছে ওই জাহাজের?' অস্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন বাদশাহ্।

ঢোঁক গিলল লারোক। 'ওটা এদিকেই এসেছে, মালিক...

দ্বীপের উল্টোপাশের পানিতে। একটু আগে নোঙর ফেলেছে ওটা।'

'অস্থির হবার কিছু দেখছি না,' বললেন আসাদ। 'নোঙর ফেলেছে যখন, তারমানে আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে কিছু জানা নেই ওদের। কী ধরনের জাহাজ ওটা?'

'বিশাল এক গ্যালিয়ন। বিশটা কামান আছে। ইংল্যাণ্ডের পতাকা উড়তে দেখেছি।'

'ইংল্যাণ্ডের পতাকা!' চমকে উঠলেন আসাদ-আদ-দীন। 'নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী জাহাজ, নইলে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এতদূর আসতে পারত না।'

'আর কোনও চিহ্ন দেখেছ?' উপর থেকে গলা চড়িয়ে জানতে চাইল অলিভার।

মাথা ঘোরাল লারোক। 'হ্যাঁ। তৃতীয় মাস্তুলের ডগায় ছোট আরেকটা পতাকা উড়ছে। সাদা রঙের একটা পাখির ছবি আছে ওতে—বক পাখির মত লাগল।'

'বক?' ভুরু কোঁচকাল অলিভার। ইংল্যাণ্ডের কোনও জাহাজের পতাকায় বকের ছবি থাকে বলে জানা নেই ওর। কিন্তু জাতীয় পতাকা তো উড়ছে! রহস্যটা কী? চিন্তিত ভঙ্গিতে উল্টো ঘুরতেই রোজামুণ্ডকে দেখতে পেল। দরজায় ঝোলানো পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে মেয়েটা, চোখে রাজ্যের কৌতূহল।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল অলিভার।

'লোকটা বকের কথা বলল!' ফিসফিসাল রোজামুণ্ড, যেন এতেই ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ওর আগ্রহের।

'তো? ইংল্যাণ্ডের জাহাজে বকের পতাকা থাকে না। নিশ্চয়ই ভুল করছে ব্যাটা।'

'হ্যাঁ, ভুল করছে। কিন্তু খুব বড় ভুল নয়। সামান্য ভুল।'

'সামান্য?' অবাক হলো অলিভার। 'মানে?'

'বক না হয়ে ওটা সারস হতে পারে না? দুটো তো প্রায় একই রকম দেখতে।'

'অসম্ভব নয়। কিন্তু সারস হলেই বা কী?'

'সাদাও না ওটা, রূপালি।'

'হেঁয়ালি বন্ধ করবে? কী বলতে চাও?'

'রূপালি সারস, অলিভার! সিলভার হেরন! সার জন কিলিগ্রুর জাহাজ ওটা!' উত্তেজিত গলায় বলল রোজামুণ্ড।

'কী!' চমকে উঠল অলিভার।

'হ্যাঁ। তুমি যখন হামলা চালালে আরওয়েনাকে, তখন ওটা প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ওটা নিয়ে ভারতবর্ষে যাবার কথা ছিল সার জনের। কিন্তু... তুমি বুঝতে পারছ না... যাননি উনি! অভিভাবক হিসেবে ভালবাসা আর দায়িত্বের খাতিরে সবকিছু তুচ্ছ করে ছুটে এসেছেন ভূমধ্যসাগরে—নিশ্চয়ই তোমার কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করবার জন্য!'

'হায় খোদা!' নিখাদ বিস্ময়ে বলে উঠল অলিভার। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল আকাশের দিকে। এ কী দৈব কোনও সঙ্কেত? নইলে ঠিক এ সময়েই সার জনের জাহাজ এখানে হাজির হবে কেন?

'কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল রোজামুণ্ড।

'সুযোগ খুঁজছিলাম আমি... আর ঠিক এ সময়েই সিলভার হেরন হাজির হলো! ব্যাপারটা কাকতালীয়, নাকি অন্য কিছু, তা বোঝার চেষ্টা করছি।' বলল অলিভার।

'ইয়ে...' ইতস্তত করে শুধাল রোজামুণ্ড, 'ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব?'

'নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু তার জন্য কৌশল খাটাতে হবে।

কাজটা সহজ হবে না।'

'চেষ্টা করবে তুমি?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল রোজামুণ্ড। ইতিবাচক জবাব আশা করছে না।

'অবশ্যই করব,' হাসিমুখে বলল অলিভার। 'যেহেতু এ-ছাড়া আর কোনও উপায় নেই আমাদের। হয়তো কিছু প্রাণহানি হবে, তারপরেও...'

'না, না!' ভয়ার্ত গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'কারও মৃত্যু চাই না আমি।'

বুঝতে বাকি রইল না অলিভারের—নির্দিষ্ট করে না দিলেও আসলে ওর কথাই বলছে মেয়েটা। ওর জন্যই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। তবে কী...

ভাবনাটা শেষ হলো না। ওয়েইস্ট-ডেক থেকে ভেসে আসা চেঁচামেচিতে ঘুরে দাঁড়াতে বাধ্য হলো ও। নাবিকরা ঘিরে ধরেছে বাদশাহ্‌কে, উত্তেজিত গলায় দাবি জানাচ্ছে—তিনি যেন এখুনি হামলা চালান ইংলিশ গ্যালিয়নের উপরে। ওদের এত কাছে ওটার উপস্থিতি বিপজ্জনক। কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল, মারযাক সূত্রপাত ঘটিয়েছে এই পরিস্থিতির। নরম গলায় পিতাকে পরামর্শ দিচ্ছিল, কিন্তু ওর কথা শুনে ভয় পেয়ে গেছে আশপাশে দাঁড়ানো কয়েকজন নাবিক, সেটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে সবার মাঝে।

'খামোশ!' গর্জে উঠলেন আসাদ-আদ-দীন। 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও পরামর্শ প্রয়োজন নেই আমার। যখন মনে করব সময় এসেছে, তখনই আদেশ দেব জাহাজ ছাড়বার। তার আগে নয়! যে-যার কাজে ফিরে যাও, এক্ষুণি! এ-বিষয়ে দ্বিতীয় কোনও কথা শুনতে চাই না।'

বাদশাহ্-র যুক্তি বুঝতে পারছে অলিভার। সশস্ত্র একটা

গ্যালিয়নের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে লড়তে যাওয়ার চেয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা অনেক বেশি নিরাপদ। ব্যাপারটা অধীনস্থদেরকে বুঝিয়ে দিলেই ভাল করতেন। কিন্তু রাগের বশে ওসব না বলে ধমকাধমকি করছেন। শাকেরের সঙ্গে তিক্ত অভিজ্ঞতা হবার পর থেকে সহ্যই করতে পারছেন না কেউ তাঁর সামনে দাবিদাওয়া পেশ করুক। ভুল করছেন তিনি।

আলজিয়ার্সে বড় বেশি সময় কাটিয়ে ফেলেছেন আসাদ-আদ-দীন। কিন্তু এই সময়টাতে অলিভারের অধীনে পুরো ভূমধ্যসাগর চষে বেড়িয়েছে কর্সেয়াররা। ওরা আর তাঁর হুকুমে অভ্যস্ত নয়। বরং শাকের-আল-বাহারের নির্দেশে একের পর এক অসম্ভব অভিযানে সাফল্য পেতে পেতে নিজেদেরকে অজেয় ভাবতে শুরু করেছে। লড়াইয়ে অভ্যস্ত ওরা, গা-ঢাকা দেয়ায় নয়। বাদশাহ্-র আদেশ তাই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিল।

চেঁচামেচি থামল কর্সেয়ারদের, কিন্তু রয়ে গেল গুঞ্জন। কেউই খুশি হতে পারছে না আসাদের সিদ্ধান্তে। এই সুযোগটা হাতছাড়া করল না ওদের মাঝে লুকিয়ে থাকা ভিজিটেলো। আচমকা চেঁচিয়ে উঠল সে।

'শাকের-আল-বাহার... শাকের-আল-বাহারের কাছে চলো! উনি আমাদেরকে এই খাঁড়ির ভিতরে কোণঠাসা হয়ে মরতে দেবেন না।'

বারুদভর্তি পিপেতে যেন আগুন ধরে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিস্ফোরণের মত নতুন করে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হলো কর্সেয়ারদের মাঝে, একসঙ্গে সবাই ঘুরে গেল পুপ-ডেকের দিকে। ওখানে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে অলিভার... শান্তভাবে চিন্তা করছে কীভাবে হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া এই সুযোগের সদ্ব্যবহার

করা যায়।

তীব্র আতঙ্কে এক পা পিছিয়ে গেলেন আসাদ-আদ-দীন। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে, রাগে জ্বলছে দুই চোখ। খপ্ করে আঁকড়ে ধরলেন কোমরে ঝোলানো তলোয়ারের হাতল। খাপ থেকে বের করলেন না অস্ত্রটা, কিন্তু পাশ ফিরে সমস্ত রাগ ঝেড়ে দিলেন পুত্রের উপর। হাঁদারামটার জন্য জাহাজে তাঁর কর্তৃত্বের দফারফা হয়ে গেছে।

'বোকার হদ্দ কোথাকার!' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন তিনি। 'দেখো তোমার বোকামির ফল! মায়ের বুদ্ধিতে চলতে চলতে কী হাল হয়েছে তোমার! তুমি কিনা জাহাজ চালাবে? যুদ্ধ করবে সাগরের বুকে? হায় আল্লাহ্, এমন কুপুত্র দেবার আগে আপনি আমাকে মরণ দিলেন না কেন?'

পিতার বাক্যবাণের সামনে সংকুচিত হয়ে গেল মারযাক। কোনও কথা ফুটল না তার মুখে।

অন্যদিকে কেবিন থেকে তখন বেরিয়ে এসেছে রোজামুণ্ড। পায়ে পায়ে এগিয়ে দাঁড়াল গিয়ে অলিভারের পাশে।

'ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করছেন,' ফিসফিসিয়ে বলল ও। 'এ-ই তোমার সুযোগ, অলিভার। লোকগুলো তোমার কথা শুনবে এবার।'

ঘাড় ফিরিয়ে নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে হাসল অলিভার। 'হ্যাঁ, রোজামুণ্ড। ওরা আমার কথা শুনবে।'

দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে ও। আসাদের সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি বলে ওর মুখাপেক্ষী হয়েছে কর্সেয়াররা, কিন্তু সমস্যা হলো—সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন তিনি। আগ বাড়িয়ে সিলভার হেরনের সঙ্গে লড়তে যাবার চেয়ে এখানে ঘাপটি মেরে থাকা আসলেই নিরাপদ। সহজে ফাঁস হবে না ওদের উপস্থিতি। ইংলিশ

জাহাজটাও খুব শীঘ্রি চলে যাবে। অথচ এ-কাজ করতে গেলে বাদশাহ্-র সঙ্গে পার্থক্য থাকে না ওর। সমর্থন ধরে রাখতে চাইলে আসাদের বিপরীত আদেশ দিতে হবে ওকে... জেনেশুনে ঝাঁপ দিতে হবে আগুনে।

ব্যাপারটা আরেকটু খতিয়ে দেখল অলিভার। হামলা না চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। কর্সেয়ারদের জাহাজকে ধাওয়া করতে চাইবে সিলভার হেরন নিঃসন্দেহে, কিন্তু নোঙর ফেলেছে ওটা... নোঙর তুলে ধাওয়া শুরু করতে করতে অনেক সময় লেগে যাবে। এর মধ্যে দাঁড় টেনে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবে ওরা। কপাল ভাল, বাতাস পড়ে গেছে। কাজেই পালের সাহায্য নিয়ে দূরত্ব কমাতে পারবে না সিলভার হেরন। সমস্যা শুধু কামানগুলো। অভিজ্ঞতা থেকে জানে অলিভার, বিশ-বিশটা কামান যদি একসঙ্গে দাগাতে শুরু করে সিলভার হেরন, ওগুলোর গোলাকে ফাঁকি দেয়া সহজ হবে না।

নানাদিক ভেবে বাদশাহ্-র কৌশলকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারল না অলিভার। অভিজ্ঞ মানুষ তিনি, ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উপায়ান্তর না দেখে তাঁকেই সমর্থন দেবার সিদ্ধান্ত নিল। এতে আর কিছু না হোক, নৈতিক বিজয় অর্জিত হবে ওর।

পুপ-ডেক থেকে নেমে এল অলিভার। লম্বা লম্বা কদম ফেলে এগিয়ে গেল আসাদ-আদ-দীনের দিকে। অগ্নিদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন বাদশাহ্, ধরেই নিয়েছেন—সুযোগটা ছাড়ছে না শাকের, এখুনি নেতৃত্ব দেবে বিদ্রোহীদের। ধীরে ধীরে খাপ থেকে তলোয়ার বের করতে শুরু করলেন। ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করল অলিভার। বাদশাহ্-র পাশে গিয়ে থামল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল কর্সেয়ারদের দিকে।

'কী ব্যাপার, আদেশ কানে যায়নি তোমাদের?' গমগম করে উঠল ওর কণ্ঠ। 'বাদশাহ্ একটা হুকুম দিয়েছেন, সেটা না মেনে কোন্ সাহসে তাঁর মুখের উপর কথা বলছ তোমরা?'

গুঞ্জন থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। নেমে এল নীরবতা। বিস্ময়ের একটা ধ্বনি বেরিয়ে এল আসাদ-আদ-দীনের গলা দিয়ে। শাকের এ-কথা বলবে, তা কল্পনাও করেননি।

পুপ-ডেকে রোজামুণ্ডেরও একই অবস্থা, অলিভারের কথা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু মানে কী এর? তা হলে কি ওকে বোকা বানিয়েছে অলিভার? প্রতারণা করেছে? নাকি ভুল অর্থ করছে অলিভারের কথার? রেলিঙের উপর ঝুঁকে পড়ল ও। যেন তাতেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

লারোকের দিকে ফিরল অলিভার। কর্কশ গলায় বলল, 'পাহারায় ফিরে যাও, নজর রাখো ইংলিশ জাহাজটার উপর। কী করছে না করছে, জানিয়ো আমাদের। বাদশাহ্ যতক্ষণ না চাইছেন, এখান থেকে একচুল নড়ছি না আমরা। যাও!'

বিড়বিড় করে খেদোক্তি করল লারোক। তারপর পাশ ফিরে চলে গেল। কেউ প্রতিবাদ করল না।

পাটাতনে সমবেত কর্সেয়ারদের উপর দিয়ে ঘুরে এল অলিভারের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। 'এই নাদান বাচ্চাটা...' মারযাককে দেখাল ও, '...কী বলল না বলল, আর তাতেই ভয় পেয়ে গেলে তোমরা? হায় আল্লাহ্! হয়েছে কী তোমাদের? বুঝতে পারছি না, তোমরা আমার নির্ভীক অনুচর, নাকি স্রেফ একদল কাপুরুষ!'

ভিড় থেকে এক পা এগিয়ে এল এক বয়স্ক জলদস্যু। বলল, 'আমরা এখানে কোণঠাসা অবস্থায় আছি, হে শাকের-আল-বাহার। ঠিক যেভাবে দ্রাগুত-কে জার্বায় কোণঠাসা করা হয়েছিল।'

'ভুল,' বলল অলিভার। 'দ্রাগুত কোণঠাসা হননি, পালাবার একটা পথ খুঁজে বের করেছিলেন তিনি। তা ছাড়া তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল জেনোয়ার পুরো নৌবাহিনী, আর আমাদের বেলায় একটামাত্র গ্যালিয়ন। হামলা যদি করতেই চায় ওটা, আমরা কি জবাব দিতে জানি না? নাকি এর আগে আর কোনও গ্যালিয়নকে পরাস্ত করিনি আমরা? কিন্তু না, ওসব ভাবছ না তোমরা। নেচে উঠছ এক কাপুরুষ নাবালকের কথায়। কী চাইছ, আগ বাড়িয়ে হামলা চালাতে... নাকি পালাতে? যেটাই করো, তার পরিণতি ভেবেছ? লড়াই করো, বা পালাও... আমাদের দেখামাত্র গর্জে উঠবে ইংলিশদের বিশ-বিশটা কামান। সেই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে দূর-দূরান্তে। স্বর্ণবাহী স্প্যানিশ জাহাজটা কাছাকাছিই আছে, তোমাদের কি ধারণা গোলমালের আভাস পেলে ওটা আর এদিকে আসবে? পুরো অভিযানটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে আমাদের। অথচ বাদশাহ্‌র কথামত এখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকলে এড়ানো যায় ওসব। আমাদের খবর জানে না ইংরেজরা, হয়তো কয়েক ঘণ্টা পরেই চলে যাবে ওরা।'

চাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল কর্সেয়ারদের মাঝে, শাকেরের কথায় প্রভাবিত হয়েছে।

'যা হোক,' সন্তুষ্টি ফুটল অলিভারের কণ্ঠে, 'এতসব যুক্তি আমি তোমাদেরকে না দেখালেও পারতাম। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমাদের বাদশাহ্‌ একটা আদেশ দিয়েছেন। জীবন দিয়ে হলেও সেটা পালন করতে হবে আমাদেরকে। কাজেই আর কোনও কথা নয়। সবাই নিজের কাজে ফিরে যাও।'

ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জটলা। কর্সেয়াররা মাথা নিচু করে চলে গেল বিভিন্ন দিকে।

আসাদ-আদ-দীনের দিকে ফিরল অলিভার। বলল, 'দ্রাগুত

আর জার্বার কথা যে-ফাজিলটা বলল, তাকে ফাঁসি দিতে পারলে একটা উদাহরণ সৃষ্টি হতো। তবে... যারা আমার পিছনে থাকে, তাদের সঙ্গে নিষ্ঠুরতা করতে পছন্দ করি না আমি। সেটা উচিতও নয়, কী বলেন?'

চুপ করে রইলেন বাদশাহ্। মিশ্র অনুভূতির শিকার হয়েছেন তিনি। কৃতজ্ঞতা অনুভব করছেন শাকের পরিস্থিতির সুযোগ না নেয়ায়... তাঁকে সমর্থন করায়; কিন্তু একই সঙ্গে অনুভব করছেন ঈর্ষা—কর্সেয়ারদের মাঝে নেতা হিসেবে তাঁর চেয়ে ওর গ্রহণযোগ্যতা বেশি দেখে। একই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন দু'জনে। কিন্তু তাঁর বেলায় বিদ্রোহ করে বসল লোকগুলো, আর শাকেরের কথা মেনে নিল বিনা প্রতিবাদে! ও যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। এমন লোকের স্থান হতে পারে না তাঁর বাদশাহীতে।

তাই ধন্যবাদ জানাতে গিয়েও জানালেন না আসাদ। শুধু চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন শাকের-আল-বাহারের দিকে। শীতল চোখে জরিপ করতে শুরু করলেন নিজের সেনাপতিকে। তাঁর মনের কথা পড়তে অসুবিধে হলো না অলিভারের। বুঝে গেল, ওর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, প্রথম সুযোগেই ওকে পথ থেকে সরিয়ে দেবেন বাদশাহ্। অনুতাপও করল ক্ষণিকের জন্য—একটু আগে সৃষ্টি হওয়া সুযোগটা নেয়নি বলে। অবশ্য পরমুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে।

স্বভাবজাত ভঙ্গিতে হাসল ও। বিস্কেনকে বলল, 'চলে যাও।' ইশারা করল শাহ্জাদার দিকে। 'এই *দুঃসাহসী* যোদ্ধাকেও নিয়ে যাও সঙ্গে।'

বাদশাহ্-র দিকে তাকাল বিস্কেন। 'মালিক?'

নীরবে সায় দিলেন আসাদ-আদ-দীন। শাহ্জাদাকে নিয়ে

চলে গেল বিস্কেন।

'মহানুভব,' সবাই চলে যাবার পর বলল অলিভার, 'গতকাল একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমি, সেটা আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, যদি আপনার ধারণা সত্যি হতো... যদি সত্যিই আমি বেঈমান ও বিদ্রোহী হতাম, তা হলে কি একটু আগে আমার কর্সেয়ারদের আবেগের সুযোগ গ্রহণ করতে পারতাম না? তা হলে তো আপনার দয়ার উপর নির্ভর করতে হতো না আমাকে, যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারতাম। কিন্তু না, ঘৃণ্য সে-পথে পা বাড়াইনি আমি। আমার আনুগত্যের প্রমাণ দিয়েছি। আশা করি এবার আপনি আমার সম্পর্কে মত পাল্টাবেন, সেইসঙ্গে বিদেশি মেয়েটার ব্যাপারে আবার বিবেচনা করবেন আমার প্রস্তাবটাকে।'

ঘাড় ফিরিয়ে পুপ-ডেকের দিকে তাকালেন আসাদ। ঘোমটা-হীন রোজামুণ্ডকে দেখে পুরনো রাগ ফিরে এল তাঁর মধ্যে। রুক্ষ গলায় বললেন, 'কোনও ধরনের প্রস্তাব দেয়া সাজে না তোমাকে, শাকের! এই দুঃসাহসই তোমার বেয়াদবির সবচেয়ে বড় প্রমাণ। মেয়েটার ব্যাপারে আমার ইচ্ছের কথা জানা আছে তোমার। ইতিপূর্বে একবার বাধা দিয়েছ তাতে, আল্লাহ্ আর রাসূলের আইনের তামাশা উড়িয়েছ... কিন্তু জেনে রেখো, এরপর যদি সে-চেষ্টা করো, ফল ভাল হবে না।' ক্রোধে গলা কাঁপছে তাঁর।

'আস্তে কথা বলুন,' শীতল গলায় বলল অলিভার। 'আপনার এই হুমকি শুনে আমার লোকজন যদি খেপে যায়, তার দায়ভার আমি নেব না। নিজের ভাল চান তো গলা চড়াবেন না।' দু'হাত বুকের সামনে ভাঁজ করল ও। 'বেশ, আপনার মতামত আমি জানলাম। যুদ্ধ চাইছেন আপনি আমার সঙ্গে? যুদ্ধই তা হলে

ঘোষণা করছি। মনে রাখবেন, আপনার পরিণতি আপনি নিজেই ডেকে আনলেন। ভবিষ্যতে আমাকে এর জন্য দোষারোপ করবেন না।'

'কুত্তার বাচ্চা! বেঈমান!' গর্জে উঠলেন আসাদ।

গালিগুলো কানে না তুলে ঘুরে দাঁড়াল অলিভার। 'নির্বোধ বৃদ্ধের মত আচরণ করতে থাকুন। দেখুন তার ফলে কী ঘটে আপনার ভাগ্যে।'

বাদশাহ্‌কে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সরে এল ও। সিঁড়ি ধরে উঠে এল পুপ-ডেকে। আসাদ তখন তীব্র ক্রোধে থরথর করে কাঁপছেন। ফিরেও তাকাল না অলিভার। জানে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে, কিন্তু ঝুঁকিটা নিয়েছে মাথায় গজিয়ে ওঠা সূক্ষ্ম এক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। খুব সাবধানে এবার পা ফেলতে হবে ওকে, নইলে সমূহ বিপদ।

রোজামুণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল অলিভার। বলল, 'এত খোলামেলাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত না তোমার।'

ঝট্ করে ওর দিকে ফিরল মেয়েটা। 'খোলামেলা? নাকি বলতে চাইছ তোমার কর্মকাণ্ড দেখতে পাবার মত জায়গায় দাঁড়াবার কথা? কী ধরনের খেলা খেলছ তুমি, অলিভার? মুখে বলো এক কথা, অথচ কাজে দেখা যায় আরেকটা!'

ওর ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করল না অলিভার। শুধু বলল, 'তড়িঘড়ি করে আমাকে বিচার কোরো না; তাতে ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশি। অতীতে তার প্রমাণ পেয়েছ।'

আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরল রোজামুণ্ডের। দমে যাওয়া গলায় বলল, 'তা হলে কেন...'

'এখন কিছু জিজ্ঞেস কোরো না,' বাধা দিয়ে বলল অলিভার। 'শুধু এটুকু জেনে রাখো, বেঁচে থাকলে আমি তোমাকে মুক্ত

করবই। তার আগ পর্যন্ত কেবিনে থাকলে ভাল হয়। তোমাকে বাইরে দেখা গেলে আমার কোনও উপকার হবে না।'

ব্যাখ্যা দাবি করতে চাইল রোজামুণ্ড, কিন্তু পারল না। অলিভারের শীতল, দৃঢ় কণ্ঠে মিশে আছে এক ধরনের আদেশ—সেটাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। মাথা নামিয়ে পাশ ফিরল ও। অদৃশ্য হয়ে গেল দরজার পর্দা সরিয়ে।

বিশ

বার্তাবাহক

দিনের বাকিটা সময় কেবিনে পড়ে রইল রোজামুণ্ড। চরম উদ্বেগে কাটল সময়, সেটা আরও বাড়ল অলিভার একবারও দেখা করতে না আসায়। সন্ধ্যা নামলে আর সহ্য করতে পারল না ও, বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। কিন্তু বাইরে পা রাখতেই বুঝল, ভুল সময় বেছেছে।

পশ্চিমাকাশে তখনও খেলা করছে লালিমা। মাগরিবের নামাজ শুরু করেছে কর্সেয়াররা। সারা জাহাজে ভেসে বেড়াচ্ছে তাদের কুরআন তেলাওয়াতের গুঞ্জন। তাড়াতাড়ি আবার পর্দার পিছনে চলে গেল রোজামুণ্ড, নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রইল ওখানেই। একটু পর উঁকি দিল মাথা বের করে।

কেবিনের বাইরে যথারীতি পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে শাকের-

আল-বাহারের দুই কাফ্রি ভৃত্য। বাঁয়ে, পুপ-ডেকের প্রান্তে শামিয়ানার নীচে আগের মত তক্তপোশে বসে আছেন আসাদ-আদ-দীন আর মারযাক, ওদের সঙ্গে রয়েছে বিস্কেন আর বাদশাহ্-র দু'জন একান্ত অনুচর। অলিভারের খোঁজে চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল রোজামুণ্ড, রেলিং পেরিয়ে নীচের পাটাতনে দেখতে পেল ওকে। হেঁটে পুপ-ডেকের দিকে আসছে অলিভার, পিছনে সারেঙের সহকারীরা ক্রীতদাসদের মাঝে খাবার বিতরণ করছে।

মাল্লার বেঞ্চিতে বসা লায়োনেলের সামনে পৌঁছে থামল ও। বিদ্রূপের সুরে আরবীতে বলে উঠল, 'কী খবর, কুকুর? ক্রীতদাসের খাবার কেমন লাগছে?'

চোখ পিটপিট করে অলিভারের দিকে তাকাল লায়োনেল। 'কী বললে?' আরবী ভাষা বুঝতে পারছে না।

ওর দিকে ঝুঁকল অলিভার। চেহারায় বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটিয়ে রেখেছে আগের মত, কিন্তু মুখের কথায় তার চিহ্ন রইল না। ইংরেজিতে বলল, 'অভিনয় করছি আমি। সবাইকে বোঝাতে চাইছি, অত্যাচার চালাচ্ছি তোমার উপরে। তুমিও অত্যাচারিতের মত অভিনয় করো। ভান করো যেন ভয় পাচ্ছ আমাকে, একই সঙ্গে ঘৃণা করছ। অভিনয় করতে করতে শোনো আমার কথা। তোমার কি মনে আছে, ছোটবেলায় আমরা একবার পেনারো থেকে ট্রেফুসিস পয়েন্ট পর্যন্ত সাঁতার কেটে গিয়েছিলাম?'

'কী বলতে চাও?' চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে বলে উঠল লায়োনেল। অভিনয় নয়, তবে এমন প্রতিক্রিয়াই চাইছে অলিভার।

'আমি জানতে চাইছি, এখনও তুমি তখনকার মত সাঁতার কাটতে পারো কি না। পারলে সাঁতারশেষে চমৎকার একটা ভোজ অপেক্ষা করছে তোমার জন্য—সার জন কিলিগ্রু-র জাহাজে! অ,

জানো না বুঝি, দ্বীপের ওপাশে সিলভার হেরন নোঙর ফেলেছে? আমি যদি ব্যবস্থা করে দিই, তুমি সাঁতার কেটে ওখানে যেতে পারবে?'

ভ্রূকুটি করল লায়োনেল। 'তুমি কি আমার সঙ্গে মশকরা করছ?'

'মশকরা করব কেন?'

'আমাকে মুক্তি দেবার কথা বলছ, এটা মশকরা নয়?'

হেসে উঠল অলিভার, এবার সত্যিকার বিদ্রূপ হিসেবে। বেঞ্চির উপরে একটা পা তুলে দিল, হাঁটু ভাঁজ করে আরেকটু ঝুঁকল ভাইয়ের দিকে।

'তোমার মুক্তি?' বলল ও। 'হায় খোদা! এখন পর্যন্ত নিজেকে ছাড়া আর কারও কথা ভাবতে পারছ না? এই স্বার্থপর স্বভাবের কারণেই আজ তোমার এই পরিণতি! যাক গে, ওসব নিয়ে কথা না বাড়ানোই ভাল। তোমার মুক্তি নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না আমি। আমার সমস্ত চিন্তা আরেকজনকে নিয়ে। আমি চাই তুমি সাঁতার কেটে সার জনের জাহাজে যাবে, তাঁকে জানাবে—এখানে কর্সেয়ারদের একটা জাহাজ আছে, যেটাতে বন্দি অবস্থায় রয়েছে রোজামুণ্ড। ওকে মুক্ত করবার জন্যই এ-কাজ করছি আমি। যাবে তুমি? এটাই কিন্তু মাল্লার বেঞ্চি থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র পথ। যাবে?'

'কিন্তু কীভাবে?' সন্দিহান গলায় জিজ্ঞেস করল লায়োনেল।

'যাবে কি না, সেটা আগে বলো।'

'আমাকে যদি পানিতে নামাতে পারো, অবশ্যই যাব।'

'খুব ভাল,' মাথা ঝাঁকাল অলিভার। 'আমার পরিকল্পনা তা হলে শোনো। সবাই ভাবছে আমি তোমাকে জ্বালাতে এসেছি, উপহাস করছি তোমার দুর্দশা নিয়ে। সেটারই সুযোগ নিতে হবে

আমাদেরকে। আমার ইশারা পেলেই অভিনয় করবে তুমি, যেন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে তোমার... আক্রমণ করবে আমাকে। ঘুসি মেরো আমার মুখে। আমিও তখন পাল্টা আঘাত করব তোমাকে... এবং সেটা খুব জোরে। কেউ যাতে সন্দেহ করতে না পারে। মার খেয়ে বেহুঁশের মত পড়ে যেতে হবে তোমাকে, ঠিক আছে? ওভাবেই থেকো, বাকিটা আমি সামলাব।'

'ঠিক আছে।'

'তা হলে শুরু হোক আমাদের খেলা।' সোজা হয়ে দাঁড়াল অলিভার। আরবীতে গাল দিল কয়েকটা, তারপর হাসতে হাসতে উল্টো ঘুরতে শুরু করল।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লায়োনেল। অলিভারকে নাগালের বাইরে যেতে দিল না, তার আগেই প্রচণ্ড এক ঘুসি ঝাড়ল ভাইয়ের গালে। চোখে অন্ধকার দেখল অলিভার, লায়োনেল পুরো শক্তি নিয়ে মেরেছে ওকে—অভিনয় নিখুঁত করবার জন্য নয়, প্রতিহিংসা থেকে। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।

ব্যথা সয়ে নিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকাল অলিভার। আগুন জ্বলে উঠেছে দু'চোখে। পাল্টা ঘুসি চালাল ও—একবার, দু'বার, তিনবার। পতাকার মত এদিক-ওদিক ঘুরে গেল লায়োনেলের মুখ। তৃতীয় ঘুসি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে পড়ে গেল অচৈতন্যের মত। রাগ যেন তারপরেও মিটল না অলিভারের। লাথি কষল ও পড়ে থাকা দেহটাতে। চেঁচিয়ে ডাকল ভিজিটেলোকে।

শাকেরের ক্রুদ্ধ সমন পেয়ে হন্তদন্তের মত ছুটে এল ইটালিয়ান সারেং।

'শেকল খোলো এই কুত্তার, তারপর নিয়ে গিয়ে পানিতে ফেলে দাও!' হিংস্র গলায় বলল অলিভার। 'একটা দৃষ্টান্ত হয়ে

থাকবে এটা সবার জন্য—আমার বিরুদ্ধে মাথা তুললে কী পরিণতি হতে পারে। দাঁড়িয়ে থেকো না!'

ভিজিটেলোর হাঁকডাকে হাতুড়ি আর ছেনি নিয়ে দৌড়ে এল একজন কর্সেয়ার। দ্রুত শেকল ভাঙল লায়োনেলের। তারপর দু'জনে ধরাধরি করে *অচেতন* দেহটাকে নিয়ে গেল বুলওঅর্কের পাশে। এখানে *জ্ঞান* ফিরল লায়োনেলের। কী ঘটতে যাচ্ছে টের পেয়ে চেঁচামেচি জুড়ল। ক্ষমা চাইতে লাগল বারে বারে।

আড়চোখে পুপ-ডেকের দিকে চাইল অলিভার। বিস্কেনের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, বাদশাহ্-ও সম্মতিসূচক দৃষ্টিতে দেখছেন পুরো ঘটনা। আঁতকে উঠল রোজামুণ্ড, কেঁপে উঠল। পোশাকের বুকের কাছটা খামচে ধরে এক পা পিছিয়ে গেল সভয়ে।

চ্যাঙদোলা করে ধরা হলো লায়োনেলকে, একটা দোল দিয়ে তাকে জাহাজের বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হলো, যেন একটা আবর্জনা। পড়তে পড়তে চিৎকার দিয়ে উঠল লায়োনেল। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে ভেসে এল পানিতে ওর আছড়ে পড়ার আওয়াজ। ডুবে যাবার আগে আরও কয়েকবার চেঁচাল সে। তারপর জাহাজজুড়ে নেমে এল থমথমে নীরবতা।

বজ্রাহতের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রোজামুণ্ড। অলিভারের কথা ভেবে আতঙ্ক আর ঘৃণায় রি রি করছে সর্বাঙ্গ। সব এলোমেলো লাগছে, কিছুতেই গোছাতে পারছে না চিন্তাধারা। একটা ব্যাপারই শুধু বুঝতে পারছে এইমাত্র দেখা অলিভারের কাণ্ড থেকে—বিশ্বাস করা চলে না ওকে... কিছুতেই না। ওর সঙ্গে প্রতারণা করছে লোকটা, মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে মুক্তির। আসলে সময় নিয়ে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে চলেছে সে। অলিভারের নিষ্ঠুরতার সামনে লায়োনেলের অপরাধ

কিছুই না। বরং কষ্ট পেল রোজামুণ্ড ওর করুণ মৃত্যুর কথা ভেবে।

আনমনে মাথা নাড়ছিল মেয়েটা, হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল একটা চিৎকার শুনতে পেয়ে। ফোক্যাসল থেকে ভেসে এসেছে এক কর্সেয়ারের কণ্ঠ।

'ও সাঁতার কাটছে!'

এর অপেক্ষাতেই ছিল অলিভার। তড়িঘড়ি করে ছুটে গেল বুলওঅর্কের পাশে। 'কোথায়... কোথায়?'

'ওই তো!' হাত তুলে দেখাল একজন। চোখের পলকে ভিড় জমে গেল বুলওঅর্কের পাশে। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে লায়োনেলের মাথা, সাঁতার কেটে জাহাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ও।

'ছাগল কোথাকার! সাগরের দিকে যাচ্ছে!' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল অলিভার। 'অতদূর যাবার আগেই ডুবে যাবে। অবশ্য... ওর কষ্ট সংক্ষিপ্ত করে দিতে পারি আমরা।'

মূল মাস্তুলের গায়ে লাগানো র‍্যাক থেকে তীর-ধনুক নিয়ে এল ও। ছিলায় তীর বসাতে গিয়ে থামল, চোখ ফেরাল পুপ-ডেকের দিকে। সঙ্গীসাথী-সহ বাদশাহ্ও চলে এসেছেন রেলিঙের ধারে।

'মারযাক!' ডেকে উঠল অলিভার। 'তীরন্দাজির শাহ্জাদা, চেষ্টা করে দেখবে নাকি আরেকবার তোমার দক্ষতা প্রমাণের?'

সাড়া দিল না মারযাক। পানির মাঝে লায়োনেলের মাথা তখন ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

'কই, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিল অলিভার। 'ধনুক নাও হাতে।'

'বাজে কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না তো!' অস্থির গলায়

বলে উঠলেন আসাদ-আদ-দীন। 'আর দেরি করলে ও তোমার নাগালের বাইরে চলে যাবে। এখুনি তো ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না।'

'লক্ষ্য তা হলে আরও কঠিন হলো,' বলল অলিভার। ইচ্ছেকৃতভাবে সময় অপচয় করছে। 'দারুণ একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে। একশো দিনার, মারযাক! আমি বাজি ধরছি, তুমি তিনটা তীর ছুঁড়েও লাগাতে পারবে না। আমি একটাতেই পারব।'

'অবিশ্বাসীর মুখ থেকে এমন কথাই তো বেরুবে!' ঘেউ ঘেউ করে উঠল মারযাক। 'আমাদের ধর্মে বাজি ধরা মানা।'

'তাড়াতাড়ি করো, শাকের!' চেঁচালেন বাদশাহ্। 'ব্যাটা পালিয়ে যাচ্ছে তো! ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ করো।'

'হাহ্!' অবজ্ঞা প্রকাশ পেল অলিভারের কণ্ঠে। 'আমার চোখে এখনও পরিষ্কার দেখছি ওকে। নিশানা কখনও ব্যর্থ হয় না আমার... অন্ধকারেও না।'

'মিথ্যে বড়াই!' চেঁচাল মারযাক।

'তা-ই?' ধনুক তুলল অলিভার। ছিলা টেনে লক্ষ্যস্থির করল—লায়োনেলের মাথা থেকে কয়েক গজ বাঁয়ে। তারপর ছুঁড়ে দিল তীর। পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল। 'লেগেছে! লেগেছে!! ব্যাটা খতম!!!'

'মনে তো হচ্ছে এখনও নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছি,' চোখ পিট পিট করে পাশ থেকে বলল এক কর্সেয়ার।

'আলো কম তো, দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে তোমার,' বলল অলিভার। 'ঘিলুর মধ্যে তীর বেঁধা অবস্থায় কেউ সাঁতরাতে পারে না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' পিছন থেকে সায় দিল জ্যাসপার লেই। 'ও ডুবে গেছে।'

'বড় বেশি অন্ধকার,' দ্বিধান্বিত গলায় বলল ভিজিটেলো,

'কিছু বোঝা যাচ্ছে না।'

রেলিঙের পাশ থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন আসাদ, আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। বললেন, 'তীরেই হোক বা পানিতে ডুবে... লোকটা মরে গেছে। আর কিছু দেখার নেই।'

ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটল ওখানেই।

তীর-ধনুক জায়গামত রেখে দিয়ে পুপ-ডেকে উঠে এল অলিভার। আবছা আলোয় দেখতে পেল রোজামুণ্ডের ফ্যাকাসে চেহারা। ওকে দেখতে পেয়েই কেবিনের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটা। পিছু পিছু অলিভারও ঢুকল। কাফ্রি ভৃত্য আবাইদ এসে জ্বেলে দিল ভিতরের সব আলো, তারপর কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

অগ্নিদৃষ্টিতে রোজামুণ্ড তাকিয়ে আছে অলিভারের দিকে। ভুরু কুঁচকে ও জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? এভাবে তাকাচ্ছ কেন?'

'শয়তান! বদমাশ!' রাগে ফেটে পড়ল রোজামুণ্ড। 'ঈশ্বর তোমাকে তিলে তিলে শাস্তি দেবেন! যতক্ষণ বাঁচব, প্রতিটা মুহূর্ত আমি প্রার্থনা করব—তুমি যেন পাপের উপযুক্ত সাজা পাও। পিশাচ! খুনি কোথাকার! আর আমি কিনা তোমারই মিথ্যে আশ্বাসে কান দিয়েছি! কিন্তু এখন প্রমাণ হয়ে গেছে...'

'তুমি কি কোনও কারণে আমার ব্যবহারে কষ্ট পেয়েছ?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল অলিভার, মেয়েটার রূঢ় ব্যবহারে হতচকিত হয়ে গেছে।

'কষ্ট!' বলল রোজামুণ্ড। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি আমাকে আর কষ্ট দিতে পারবে না। তোমাকেও ধন্যবাদ, আমার ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছ বলে। তোমার মত খুনির সাহায্য চাই না আমি মুক্তি পাবার জন্য।' মুখ ফিরিয়ে নিল ও। 'নিশ্চয়ই কোনও

কুমতলব হাসিল করতে চাইছ তুমি আমার মাধ্যমে। কিন্তু জেনে রেখো, তা কোনোদিন সফল হতে দেব না আমি। দরকার হলে প্রাণ দেব, তবু তোমার হাতের পুতুল হব না।' গুঙিয়ে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকল ও।

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল অলিভার, তারপর হেসে উঠল।

বলল, 'বোকা মেয়ে! তুমি লায়োনেলের কথা ভেবে কাঁদছ? ও তো পালিয়ে গেছে! জ্যান্ত অবস্থায়! কিচ্ছু হয়নি ওর।'

ভেজা চোখে ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল রোজামুণ্ড। দৃষ্টিতে বিস্ময়।

'হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলছি আমি।' অলিভার ব্যাখ্যা করল, 'আমাদের মধ্যে যা ঘটতে দেখেছ—মানে, হাতাহাতি আর ঝগড়ার কথা বলছি—ওসব ছিল অভিনয়। তীর ছোঁড়াটাও। মারযাককে খেপাচ্ছিলাম সময় নষ্ট করবার জন্য, যাতে দূরে চলে যেতে পারে লায়োনেল... অন্ধকারে কেউ যেন বুঝতে না পারে, ও ভেসে আছে না ডুবে গেছে। ওর শরীরের অনেক দূর দিয়ে তীর ছুঁড়েছি আমি। এখন ও খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে সার জনের জাহাজের দিকে সাঁতার কেটে এগোচ্ছে। ভাল সাঁতারু ও, সিলভার হেরনে পৌঁছে যাবে খুব শীঘ্রি। আমার বার্তা পৌঁছে দেবে সার জনের কাছে।'

হতবাক হয়ে গেল রোজামুণ্ড। ঠিক বিশ্বাস হতে চাইছে না অলিভারের কথা। নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞেস করল, 'তুমি মিথ্যে বলছ না তো?'

কাঁধ ঝাঁকাল অলিভার। 'মিথ্যে বলে কী লাভ আমার? নিজেই ভেবে দেখো।'

তীক্ষ্ণচোখে ওর মুখভঙ্গি নিরীখ করল রোজামুণ্ড, কিন্তু তাতে

কোনও কপটতা দেখতে পেল না। শেষ পর্যন্ত ধপ্ করে বসে পড়ল বিছানায়। ধরা গলায় বলল, 'আ... আমি দুঃখিত, অলিভার। আ... আমি ভেবেছিলাম...'

'সবসময় আমাকে যা ভাবো,' ওকে থামিয়ে দিল অলিভার। চেহারায় কষ্ট বাসা বেঁধেছে। 'এ আর নতুন কী?'

পরাজিতের মত কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল ও।

একুশ

মৃত্যুপথের যাত্রী

তিক্ত চেহারা করে বেরিয়ে গেছে অলিভার, আর তা লক্ষ করে তিক্ততায় ভরে গেল রোজামুণ্ডের অন্তরও। আজকের ঘটনাই মাপকাঠি, পরিষ্কার বুঝতে পারছে ও কতবড় অবিচার করেছে ও হতভাগ্য যুবকটির প্রতি। ক্ষণিকের উত্তেজনায়, আগপাশ না ভেবে ক্রমাগত দোষারোপ করে গেছে ও অলিভারকে। অবিশ্বাসের কথা বলে অলিভার, হয়তো সত্যিই কোনোদিন ও বিশ্বাস করতে পারেনি তাকে। অন্যায় হয়েছে... পাপ করেছে রোজামুণ্ড, কোনও সন্দেহ নেই।

প্রায়শ্চিত্তের তাগিদ এবার মেয়েটা নিজে অনুভব করল। অলিভার যদি ওভাবে বেরিয়ে না যেত, এখুনি হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইত ও। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। ছটফট করতে থাকল ও

ভিতরে ভিতরে। ঠিক করল, অলিভার পরেরবার এলেই দু'হাত জুড়ে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, দেখা পাওয়া গেল না দুর্ধর্ষ কর্সেয়ারের। অস্থিরতা বেড়ে গেল রোজামুণ্ডের। ভয় পেতে শুরু করেছে। সন্দেহ নেই, খুব শীঘ্রি হামলা চালাবেন সার জন। তারপর? নিজের কথা আর ভাবছে না ও, ভাবছে অলিভারের কথা। লড়াই শুরু হলে কী ঘটবে লোকটার ভাগ্যে? ইংরেজদের হাতে না হোক, নিজের দলের লোকই কি ওকে খুন করে ফেলবে না? বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অলিভার... রক্ত দিয়ে তার মূল্য দিতে হবে ওকে। অথচ কাজটা করেছে সে ওর-ই জন্য! সেজন্যেই ভয় পাচ্ছে রোজামুণ্ড—হয়তো ক্ষমা চাইবার সুযোগ পাবে না। সেক্ষেত্রে বাকি জীবন কাটাতে হবে তীব্র অনুশোচনায়।

মাঝরাত ঘনিয়ে এলে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না ও। উঠে দাঁড়াল, সাবধানে পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল পুপ-ডেকে। কয়েক পা যেতেই হোঁচট খেলো, দরজার ঠিক সামনে শুয়ে আছে একজন মানুষ, তার গায়ে পা লেগেছে। একটু নড়ল মানুষটা, কিন্তু জাগল না। মাস্তুল আর রেলিঙের লণ্ঠন থেকে ভেসে আসা আবছা আলোয় অলিভারকে চিনতে পারল রোজামুণ্ড, ঘুমোচ্ছে শান্ত ভঙ্গিমায়।

একটু ঝুঁকল ও, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল অলিভারের পাশে। দু'চোখ থেকে ঝরতে শুরু করেছে অশ্রু। ওর জানা ছিল না, অলিভার গতকালও এভাবে ঘুমিয়েছে। কিন্তু এখন... ওকে এই অবস্থায় আবিষ্কার করে বুকের ভিতর আলোড়ন অনুভব করছে। এই সেই মানুষ, যাকে ও অবিশ্বাস করেছে... দিয়েছে কষ্টের পর কষ্ট... অথচ সে-ই শক্ত পাটাতনে শুয়ে আছে ওর

কারণে—নিজের শরীরকে বানিয়েছে বাধার প্রাচীর, যাতে কেউ ওর নাগালে পৌঁছুতে না পারে!

একটা গোঙানি বেরিয়ে এল রোজামুণ্ডের গলা দিয়ে, আর তা শোনামাত্র ঝট্ করে চোখ মেলল অলিভার। বিস্ময় ফুটল ওর চেহারায়।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল ও।

জবাব দিতে পারল না রোজামুণ্ড। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল। অলিভার উঠে বসেছে, ওকে নিজের অশ্রু দেখতে দিল না। চোখ মুছে উল্টো ঘুরল। গলা যতটা পারে স্বাভাবিক রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী মনে হয় তোমার, লায়োনেল কি সার জনের জাহাজে পৌঁছে গেছে?'

চকিতে শামিয়ানার দিকে নজর বোলাল অলিভার—বাদশাহ্ আর শাহ্জাদা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তা ছাড়া প্রশ্নটা করা হয়েছে ইংরেজিতে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। ইশারা করল দরজার দিকে। দু'জনে ঢুকে পড়ল পুপ-কেবিনে।

'দুশ্চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না?' বলল অলিভার... আধা-প্রশ্ন, আধা-অনুমানের সুরে।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রোজামুণ্ড।

'চিন্তার কিছু নেই,' অলিভার আশ্বস্ত করল ওকে। 'শেষরাতের আগে কিছু করতে যাবেন না সার জন। ওই সময়ে হামলা করলে আমাদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাবেন কি না! লায়োনেল যে পৌঁছুতে পেরেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পথ বেশি লম্বা ছিল না; তা ছাড়া... খাঁড়ি থেকে বেরুনোর পরে দ্বীপের মাটিতে উঠে পড়তে পেরেছে ও। আমি হলে হেঁটে দ্বীপের উল্টোপাশে যেতাম, জাহাজের কাছাকাছি গিয়ে তারপর আবার নামতাম পানিতে। কিচ্ছু ভেবো না, ওর কোনও সমস্যা হবার

কথা নয়।'

বিছানায় বসল রোজামুণ্ড। প্রদীপের আলোয় চকচক করে উঠল ওর চোখের পানিতে ভেজা গাল।

'সার জন যখন আসবেন, তখন কি লড়াই হবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'তা তো হবেই। আমরা হেরেও যাব। আজ এ-নিয়ে কথা হচ্ছিল... তুমি বোধহয় বুঝতে পারোনি। জার্বাতে অ্যাডমিরাল দ্রাগুতকে যেভাবে ফাঁদে ফেলেছিল অ্যাণ্ড্রিয়া ডোরিয়া, ঠিক একই অবস্থা এখন আমাদের। পার্থক্য একটাই—দ্রাগুতের সামনে পালাবার জন্য একটা বিকল্প পথ ছিল, কিন্তু এখানে তা নেই। সাহস রাখো, তোমার মুক্তি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।' একটু থামল অলিভার। এরপর নরম গলায় বলল, 'আমি প্রার্থনা করছি, আজকের পর থেকে তোমার জীবন যেন সুখে-শান্তিতে ভরে যায়। গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনা যেন বাজে একটা দুঃস্বপ্নের মত দেখায়, আর কিছু না।'

কোনও উচ্ছ্বাস দেখা গেল না রোজামুণ্ডের মধ্যে। মাথা নিচু করে ফেলল ও। বলল, 'রক্ত না ঝরিয়ে যদি ব্যাপারটা সমাধা করা যেত, তা হলে খুব ভাল হতো।'

'ভয় পেয়ো না,' ওর কথার ভুল অর্থ করে বলে উঠল অলিভার। 'তোমার যাতে কিছু না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখব আমি। যতক্ষণ লড়াই চলবে, এখানেই থাকবে তুমি। আমার বিশ্বস্ত কিছু লোক আগলে রাখবে দরজা। কেউ ফুলের টোকাও দিতে পারবে না তোমার গায়ে।'

'ভুল করছ তুমি!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল রোজামুণ্ড, ঝট্ করে তুলল মাথা। 'তোমার কি ধারণা আমি শুধু নিজের কথা ভাবছি?' থামল ও, শ্বাস ফেলল জোরে জোরে। 'তোমার কী হবে?'

'আমাকে নিয়ে চিন্তা করায় ধন্যবাদ,' বলল অলিভার। বিমর্ষ হয়ে গেল। 'সন্দেহ নেই, কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিদান পাবো আমি। প্রার্থনা করছি, সেটা যেন দ্রুত পাই। তিলে তিলে যেন...'

'না-আ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রোজামুণ্ড। দাঁড়িয়ে গেল উত্তেজনায়। 'ওটা না!'

'আর কোনও বিকল্প আছে?' ম্লান হাসি দেখা দিল অলিভারের ঠোঁটে। 'এ ছাড়া আর কী-ই বা আশা করতে পারি আমি?'

'বেঁচে থেকে ইংল্যাণ্ডে ফিরতে হবে তোমাকে,' বলল রোজামুণ্ড। 'সত্য প্রকাশ পাবে। সুবিচার পাবে তুমি।'

এক মুহূর্তের জন্য ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল অলিভার। তারপর হেসে উঠল।

'ইংল্যাণ্ডে আমি শুধু এক ধরনের সুবিচার আশা করতে পারি,' বলল ও। 'ফাঁসির দড়িতে ঝোলানোর সুবিচার! নিশ্চিত থাকো, মেয়ে, ক্ষমার অযোগ্য কুখ্যাতি রয়েছে আমার। ভাল হয় সব এখানেই শেষ হয়ে গেলে। তা ছাড়া...' যোগ করল ও। ঠাট্টার সুর মিলিয়ে গেল কণ্ঠ থেকে, ভর করল বিষাদ, 'মৃত্যুই তো আমার প্রাপ্য। নিজের চোখেই আজ দেখেছ তুমি আমার সঙ্গীদের বিশ্বস্ততা আর ভালবাসা। বাদশাহ্-র বিরুদ্ধে পর্যন্ত গেছে আমার কারণে। চোখ বন্ধ করে এতকাল ঝাঁপ দিয়েছে বিপদের মুখে... শুধুমাত্র আমার কথায়। অথচ আজ ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি আমি—ফাঁদে ফেলেছি, করেছি মরার আয়োজন। এই কলঙ্ক নিয়ে বাঁচতে চাই না আমি। মরে যাওয়াই ভাল।'

ওর কথা শুনতে শুনতে চেহারায় আতঙ্ক ফুটল রোজামুণ্ডের

ও আসলে ভাবতেই পারেনি, কর্সেয়ারদের সবাইকে মরতে হতে পারে।

জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বলতে চাইছ, আমার মুক্তির জন্য এই জাহাজের সবার প্রাণ যাবে?'

'সেটাই ঘটবার সম্ভাবনা,' সায় দিল অলিভার। 'তবে আমি একটা বুদ্ধি আঁটছি, সফল হলে হয়তো বা রক্তপাত এড়ানো যাবে।'

'ওই বুদ্ধিতে তুমি নিজে কি রক্ষা পাবে?'

'বার বার একই কথা জিজ্ঞেস করো কেন? বললাম তো, আমার প্রাণের কোনও মূল্য নেই। এমনিতেই আমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। এখানে যদি না-ও মরি, আলজিয়ার্সে ফেরামাত্র আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবেন বাদশাহ্। কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

ধপ্ করে বিছানায় আবার বসে পড়ল রোজামুণ্ড। শরীর কাঁপছে। ফিসফিস করে বলল, 'তা হলে আমি... আমিই তোমার মরণ ডেকে আনছি। লায়োনেলকে পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনকে বাজি ধরে ফেলেছ তুমি—আর সেটা শুধু আমার মুক্তির জন্য।' কঠিন হলো ওর কণ্ঠ। 'কে বলেছে তোমাকে এ-কাজ করতে? আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কেন তুমি এমন একটা পদক্ষেপ নিলে? কোনও অধিকার নেই তোমার... আমাকে এমন জঘন্য একটা কাজের অংশীদার বানানোর! জেনেশুনে আমি তোমাকে মরতে দিতে পারি না, অলিভার! তাও আবার নিজের মুক্তির জন্যে!'

'আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ, তোমার কথায় কিছু যায়-আসে না,' বলল অলিভার। 'তারপরেও বলছি, নিজেকে অপরাধী ভেবো না। তোমার দুর্দশার জন্য আমি একা দায়ী। তার ফলও আমারই

ভোগ করা উচিত। মরলে মরব, তাও প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত শান্তি পাব না আমি।' কাঁধ ঝাঁকাল ও। ইতস্তত করে বলল, 'হয়তো খুব বেশি চাওয়া হয়ে যায়, তবু... তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?'

ভেজা চোখে ওর দিকে তাকাল রোজামুণ্ড। 'তুমি ক্ষমা চাইছ কেন? ক্ষমা তো চাইব আমি!'

'তুমি!' অবাক হলো অলিভার।

'অবশ্যই! তোমাকে অবিশ্বাস করেছিলাম আমি, তোমার মুখ থেকে কিছু শুনতে না চেয়ে কান দিয়েছিলাম বাইরের লোকের কানকথায়। তারপরে আবার পুড়িয়ে ফেলেছিলাম তোমার চিঠি আর নির্দোষিতার প্রমাণপত্র। আমার বোকামির জন্যই তো এতকিছু ঘটেছে!'

তিক্ত একটা হাসি ফুটল অলিভারের ঠোঁটে। 'আমি মনে করি না খুব একটা ভুল করেছিলে তুমি। আমাকে শয়তান ভেবেছিলে... আসলেও আমি তা-ই। আজ আমার এ-অভিযোগ স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই। খুব খারাপ ধরনের মানুষ আমি, রোজামুণ্ড, নইলে জলদস্যুর জীবন বেছে নিতে পারতাম না। নিলেও দস্যু হিসেবে এত উন্নতি করতে পারতাম না। এতেই প্রমাণ হয়, আমার ভিতরে সবসময়েই একটা শয়তান বাস করত। আমাকে চিনতে ভুল করোনি তুমি।'

'না! বিশ্বাস করি না আমি!'

'এসব বলছ ক্ষণিকের আবেগে... মনের অপরাধবোধ হালকা করবার জন্য। কিন্তু আমার অন্ধকার দিকটা বহুদিন আগেই আঁচ করেছিলে তুমি। তোমার কোনও দোষ ছিল না।'

'ছিল! ছিল!!'

রোজামুণ্ডের আকুতিতে প্রভাবিত হলো না অলিভার। বিষণ্ন

ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ও। 'তোমার সঙ্গে আমি যা করেছি, তা কোনও বিবেকবান মানুষ করতে পারে না... তাকে যতই প্ররোচিত করা হোক না কেন। সব পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি—মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মানুষ যেভাবে বুঝতে পারে।'

'তুমি মরার জন্য এত উতলা হয়ে উঠলে কেন?' হতাশায় বলে উঠল রোজামুণ্ড।

'উতলা হইনি,' বলল অলিভার, 'বরং মৃত্যুই উতলা হয়ে উঠেছে আমার জন্য। সান্ত্বনা একটাই—ভয় বা অনুশোচনা ছাড়া তাকে বরণ করে নিতে পারব। নিয়তি হিসেবে মৃত্যুকে মেনে নিচ্ছি আমি, যার হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। মন হালকা হয়ে গেছে... খুশিও হয়েছি বলতে পারো... তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলায়।'

উঠে দাঁড়াল রোজামুণ্ড, এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি হলো অলিভারের। বলল, 'পরস্পরকে ক্ষমা করে দেয়া উচিত আমাদের, অলিভার। আর ক্ষমা যেহেতু সবকিছু মুছে দেয়, চলো... আমরা গত পাঁচ বছরের সমস্ত বাজে স্মৃতি ভুলে যাই।'

মাথা নামিয়ে নিল অলিভার। 'এ কি সম্ভব? পাঁচ বছর পেছনে কি ফিরতে পারব আমরা? ফিরতে পারব গডলফিন কোর্টের সেই দিনগুলোতে?'

জবাব দিতে পারল না রোজামুণ্ড।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অলিভার। 'ভুলের মাশুল সবাইকে গুনতে হয়। ফেরার কোনও পথ নেই আমাদের, রোজামুণ্ড। সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।'

হার মানতে রাজি নয় রোজামুণ্ড। বলল, 'তা হলে বন্ধই থাকুক ওগুলো। আমরা ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নতুন করে শুরু করব সবকিছু। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সাজিয়ে তুলব

ভবিষ্যৎকে।'

ওর কাঁধে হাত রাখল অলিভার। 'বড় ভাল মেয়ে তুমি। হায় খোদা, যদি আমরা এমন পরিস্থিতিতে না পড়তাম...' বলতে বলতে থমকে গেল ও। তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল হাত। 'হয়েছে কী আমার? দুর্বল হয়ে পড়ছি! তোমার করুণা আমাকে নরম করে দিচ্ছে... আরেকটু হলেই ভালবাসার কথা বলতে যাচ্ছিলাম। কী বোকা আমি! ভালবাসা শুধু জীবিতদের জন্য—ভালবাসা তো জীবনেরই আরেক নাম। অথচ আমি তো মৃত্যুপথের যাত্রী! কোনও অধিকার নেই আমার ভালবাসার কথা বলবার।'

'না! না-আ!' ওকে জাপটে ধরল রোজামুণ্ড। কাঁপছে থর থর করে। 'এ-সব বোলো না।'

'বড্ড দেরি হয়ে গেছে, রোজামুণ্ড,' অলিভারের গলা ভেঙে গেল। 'গর্তে পড়ে গেছি আমি, উঠে আসার কোনও উপায় নেই। হাসিমুখে পরিণতিকে মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

'তা হলে আমিও তোমার সাথী হব,' বলল রোজামুণ্ড। 'আর কিছু না হোক, একসঙ্গে থাকব আমরা!'

'এবার কিন্তু পাগলামি করছ!' নরম গলায় তিরস্কার করল অলিভার। হাত বুলিয়ে দিল রোজামুণ্ডের সোনালি চুলে। 'তুমি মরে গেলে কী লাভ হবে আমার? অতৃপ্তি নিয়ে তুমি মরতে দিতে চাও আমাকে? না, রোজামুণ্ড, তুমি বেঁচে থাকলেই বরং উপকার হবে আমার। ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেয়ো, প্রকাশ কোরো আমার কাহিনি। হয়তো বা তখন সহানুভূতি পাব মানুষের কাছ থেকে। ওরা বুঝতে পারবে, কেন আমি ধর্মত্যাগ করে জলদস্যুর জীবন বেছে নিয়েছিলাম।'

ওর কথা শেষ হতেই বাইরে হৈচৈ শোনা গেল।

'অ্যাই, কী হয়েছে?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল অলিভার।

'শত্রু!' চিৎকার দিয়ে জবাব দিল কেউ। 'অস্ত্র ধরো সবাই! তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!!'

রোজামুণ্ডের আলিঙ্গন থেকে সাবধানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল অলিভার।

'সময় হয়েছে,' বলল ও। তারপর বেরিয়ে গেল পর্দা সরিয়ে।

বাইশ

আত্মসমর্পণ

কেবিন থেকে বেরিয়েই জাহাজ-জুড়ে হুড়োহুড়ি দেখতে পেল অলিভার। আর দেখতে পেল লারোক-কে। সূর্যাস্তের পর থেকে পাহাড়চূড়ার পাহারায় ছিল ফরাসি লোকটা। হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচাচ্ছে সে।

'ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন! মালিক! শত্রু আসছে! জলদি উঠুন, বিপদ!'

পুরো জাহাজ কাঁপছে উত্তেজিত পদশব্দে—ঘুম থেকে জেগে ছুটে আসছে সবাই। ফোক্যাসলে হাঁকডাক শুরু করল কে যেন। গুটিয়ে নেয়া হলো শামিয়ানা, তলা থেকে মারযাক-সহ বেরিয়ে এলেন আসাদ-আদ-দীন।

জাহাজের ডানপাশ থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল বিস্কেন আর ওসমানি; ওয়েইস্ট ডেক থেকে এল ভিজিটেলো, জ্যাসপার আর একদল সশস্ত্র কর্সেয়ার। সবাই জড়ো হলো পুপ-ডেকে।

'কী হয়েছে?' বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন বাদশাহ্।

এক নিঃশ্বাসে দুঃসংবাদ শোনাল লারোক। 'গ্যালিয়নটা নোঙর তুলেছে, মালিক। চলতে শুরু করেছে খাঁড়ির মুখ লক্ষ্য করে।'

দাড়িতে চিন্তিত ভঙ্গিতে হাত বোলালেন আসাদ। 'মানে কী এর? ওরা কি আমাদের খবর জেনে গেছে?'

'নইলে রাতদুপুরে নোঙর তুলে এদিকে আসবে কেন?' বলে উঠল বিস্কেন।

'ঠিকই বলেছ,' মাথা ঝাঁকালেন আসাদ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন অলিভারের দিকে। 'তোমার কোনও পরামর্শ আছে, শাকের-আল-বাহার?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল অলিভার। 'কী আর পরামর্শ দেব? আমাদের তো হাত-পা বাঁধা। অপেক্ষা করে দেখা যেতে পারে। যদি আমাদের খবর ওরা জেনেই থাকে, তা হলে ফাঁদে পড়ে গেছি। আল্লাহ্-আল্লাহ্ করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। নইলে আজ আমাদের সবার কপালে মরণ আছে!'

বরফের মত শীতল ওর কণ্ঠ। উদ্বেগ জাগিয়ে তুলল সবার মধ্যে। মারযাক কেঁপে উঠল আতঙ্কে।

'জাহান্নামে যাও, শাকের!' চেঁচিয়ে উঠল শাহজাদা কথা খুঁজে না পেয়ে। 'বাজে কথার আর জায়গা পাও না?'

'কপালে যা লেখা আছে, তা-ই ঘটবে,' নির্বিকার গলায় বলল অলিভার। 'আমার কথায় কিছু যাবে-আসবে না।'

'তা তো বটেই,' একমত হলেন বাদশাহ্। 'আল্লাহ্ সবার

ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি না চাইলে কিছুই হবে না।'

আধ্যাত্মিক আলোচনায় অংশ না নিয়ে বাস্তবসম্মত একটা বুদ্ধি দিল বিস্কেন।

'ওরা আমাদের খোঁজ পেয়ে গেছে, এটাই ধরে নিই না কেন? এখুনি যদি চেষ্টা করি, হয়তো ওরা পৌঁছুনোর আগে বেরিয়ে যেতে পারব খাঁড়ি থেকে।'

'নিশ্চিত না হয়ে এগোনো ঠিক হবে না,' মারযাক প্রতিবাদ জানাল। 'তুমি তো সেধে বাঘের মুখে ঝাঁপ দিতে বলছ।'

'অ্যাই, তুমি চুপ করো,' বিরক্ত গলায় বললেন আসাদ। 'বিস্কেন মন্দ কিছু বলেনি। আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ, আজ রাতে বাতাস খুব একটা নেই। দাঁড় টেনে আমরা যতক্ষণে দশ লিগ যেতে পারব, ততক্ষণে পাল খাটিয়ে গ্যালিয়নটা এক লিগও এগোতে পারবে না।'

মৃদু গুঞ্জনের সঙ্গে একমত হলো সবাই।

বিস্কেন বলল, 'খাঁড়ি থেকে শুধু বেরুতে পারলে হয়, ওরা কিছুতেই ধরতে পারবে না আমাদেরকে।'

'ওদের কামানের কথা ভুলে যাচ্ছ তুমি,' বলে উঠল অলিভার। পালাবার এই কৌশলের ব্যাপারে আগে থেকেই সচেতন আছে ও, তাই চেষ্টা করছে ওদের মধ্যে দ্বিধা জাগাবার। 'দূর থেকেই আমাদেরকে ঘায়েল করতে পারবে ওরা।'

'এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে আমাদেরকে,' বললেন আসাদ। 'রাতের অন্ধকারের উপর আস্থা রাখতে হবে। এখানে বসে থাকা মানে ধ্বংস সুনিশ্চিত।' ঘুরে আদেশ দিতে শুরু করলেন তিনি। 'আলি, জাহাজের বাঁধন খুলতে শুরু করো। ভিজিটেলো, তোমার মাল্লাদের ঘুম ভাঙাও... এক্ষুণি দাঁড় টানতে হবে ওদেরকে।'

বাজতে শুরু করল সারেঙের বাঁশি। একটু পরেই বাতাস

ভারী হয়ে উঠল চাবুকের সপাং আর ক্রীতদাসদের আর্তনাদে।

বিস্কেনের দিকে ফিরলেন বাদশাহ্। 'গলুইয়ে চলে যাও। আমাদের লোকজনকে একত্র করো। অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকবে ওরা, শত্রু যদি জাহাজে চড়ার চেষ্টা করে, তা হলে বাধা দেবে।'

কুর্নিশ করে ছুটে চলে গেল বিস্কেন। খানিক পর ব্যস্ত নাবিকদের হৈচৈ ছাপিয়ে গম গম করে উঠল আসাদের কণ্ঠ। নতুন আদেশ দিচ্ছেন তিনি।

'তীরন্দাজেরা, অবস্থান নাও! গোলন্দাজেরা, চলে যাও কামানের পাশে। বারুদ আর সলতে তৈরি রাখো! সবক'টা আলো নিভিয়ে দাও!'

সবগুলো লণ্ঠন নিভে গেল চোখের পলকে। পুপ-কেবিনের প্রদীপও নিভিয়ে দিয়ে এল এক নাবিক। মূল মাস্তুলের লণ্ঠনটা নেভানো হলো না, তবে পাটাতনে নামিয়ে এনে ঢেকে দেয়া হলো পাতলা কাপড় দিয়ে। ওটার আবছা আলোয় কাজ করতে থাকল সবাই।

কিছুক্ষণ পর নিকষ অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধের মত যাত্রা শুরু করল জাহাজ। অন্ধকার চোখে সয়ে এল খুব শীঘ্রি। ধীরে ধীরে দৃষ্টিসীমায় ফুটে উঠল খাঁড়ির চারপাশের অবয়বগুলো।

ততক্ষণে প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে গেছে কর্সেয়ারদের। নিঃশব্দে যার যার দায়িত্ব পালন করে চলেছে তারা। মনের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও মুখে প্রকাশ করছে না কেউ। হাজার হোক, বাদশাহ্ আর শাকের-আল-বাহার ওদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেছে—জনমতকে গুরুত্ব দিয়ে যদি গতকালই বেরিয়ে যেত এই খাঁড়ি থেকে, তা হলে আজকের এই পরিস্থিতিতে পড়তে হতো না।

জাহাজের গলুই থেকে শুরু করে তিন সারিতে সাজানো হয়েছে প্রতিরোধ ব্যূহ। সবার সামনে রয়েছে তীরন্দাজের দল। তারপর দাঁড়িয়েছে তলোয়ারধারী-রা। অন্ধকারেও চকচক করছে তাদের অস্ত্র। ওয়েইস্ট ডেক থেকে মূল মাস্তুলের দড়িদড়া পর্যন্ত অবস্থান নিয়েছে তারা। পুপ-ডেকের দুই কামানে অবস্থান নিয়েছে তিনজন গোলন্দাজ। মাঝে মাঝে দেশলাই জ্বালছে তারা, কাঁপা কাঁপা শিখায় আলোকিত হচ্ছে তাদের রুক্ষ চেহারা।

পুপ-ডেকের সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন আসাদ, কিছুক্ষণ পর পর দিয়ে যাচ্ছেন সংক্ষিপ্ত আদেশ-নির্দেশ। তাঁর পিছনে, পুপ-কেবিনের বাইরের দিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো অলিভার; ওড়নায় মুখ ঢেকে রোজামুণ্ডও বেরিয়ে এসেছে ভিতর থেকে, দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। কৌতূহল নিয়ে দেখছে নাবিকদের কর্মকাণ্ড।

হাল ধরেছে একজন, হুইলে দাঁড়িয়ে গেছে আরেক কর্সেয়ার। ফোকর দিয়ে বের করা হয়েছে সবক'টা দাঁড়। আসাদ নির্দেশ দেয়ামাত্র সেগুলো একসঙ্গে নামানো হলো পানিতে। চাবুকের আওয়াজ হলো, তারপর মৃদু হেঁইয়ো হেঁইয়ো তালে দাঁড় টানতে শুরু করল মাল্লা-রা। খাঁড়ির মুখ লক্ষ্য করে দ্রুত এগিয়ে চলল জাহাজ।

পাটাতনের মাঝখানের তক্তা ধরে দ্রুত পায়চারি করছে সারেং ও তাদের সহকারীরা, কোনও ক্রীতদাসকে কাজে ফাঁকি দিতে দেখলেই চালাচ্ছে চাবুক। খুব শীঘ্রি গতি বেড়ে গেল জাহাজের। দু'পাশ থেকে সরে যেতে লাগল স্থলভূমি, বড় হতে লাগল যেন খাঁড়িমুখটা। ওপাশে সাগরের কালো পানি।

দমবন্ধ করা উত্তেজনা অনুভব করল রোজামুণ্ড, হঠাৎ আঁকড়ে

ধরল অলিভারের বাহু। ফিসফিসিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি ফাঁকি দিতে পারব সিলভার হেরনকে?'

'প্রার্থনা করছি যাতে না পারি,' অলিভার বলল। 'কিন্তু সমস্যা হলো, আসাদ নিজে দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর মত অভিজ্ঞ ও দক্ষ ক্যাপ্টেন খুব কম আছে। পারলে উনিই পারবেন।'

একটু পরেই খাঁড়িমুখ পেরিয়ে খোলা সাগরে পৌঁছে গেল জাহাজ। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ল বিশাল এক গ্যালিয়নের অবয়ব—ওদের বাঁ দিকে, একটু সামনে, এক কেইবল দূরত্বে রয়েছে ওটা। উপরিভাগ ঝলমল করছে আলোয়।

'আরও জোরে!' চেঁচিয়ে উঠলেন আসাদ। 'আরও জোরে দাঁড় টান্, বিধর্মীর বাচ্চারা! ভিজিটেলো, চাবুক যেন না থামে... শরীরের সমস্ত শক্তি নিংড়ে বের করে নাও কুত্তাগুলোর থেকে। তা হলেই শত্রু আমাদের নাগাল পাবে না।'

বাতাস কেঁপে উঠল চাবুকের সপাং সপাং আর ব্যথাতুর ক্রীতদাসদের আর্তনাদে। তার সঙ্গে দ্রিম দ্রিম করে বেজে উঠল ঢাক, ওটার তালে তালে এবার পড়ছে দাঁড়—নামছে, উঠছে... নামছে, উঠছে। মুখ ঘুরিয়ে দুরন্ত বেগে ছুটল জাহাজ।

'জোরে! আরও জোরে!' উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচাতে থাকলেন আসাদ-আদ-দীন। যেভাবেই হোক, এই গতি ধরে রাখতে হবে তাঁদেরকে।

'আমরা এগিয়ে যাচ্ছি!' একটু পর উল্লসিত গলায় চিৎকার করে উঠল মারযাক। 'আল্লাহ্ মহান!'

আসলেই তা-ই। পিছনে ধীরে ধীরে ম্লান হতে শুরু করেছে গ্যালিয়নের আলো। বাতাসের মোটেই তেজ নেই, সবক'টা পাল খাটানোর পরেও মোটেই সুবিধে করতে পারছে না ওটা।

হামাগুড়ি দেবার মত এগোচ্ছে... আর এদিকে চিতার ক্ষিপ্রতায় ছুটছে কর্সেয়ারদের জলযান। আগে কোনোদিন এভাবে ছোটেনি জাহাজটা... শাকের-আল-বাহারের আমলে তো নয়ই; কারণ শত্রুকে দেখে কোনোদিনই পালায়নি অলিভার। সামর্থ্য যা-ই থাকুক, সোজা হামলা চালিয়েছে।

গ্যালিয়নের ডেক থেকে হৈ-হল্লা ভেসে এল, আর তা শুনে অপ্রকৃতিস্থের মত হেসে উঠলেন আসাদ-আদ-দীন। হাত মুঠো করে আকাশের দিকে ওঠালেন, আল্লাহ্ আর রাসূলের নাম নিয়ে অভিশাপ দিতে শুরু করলেন শত্রুকে। তাঁর অভিশাপের জবাবেই বোধহয়... আচমকা একটা বজ্রপাতের মত গর্জন শোনা গেল গ্যালিয়নের পাশ থেকে। আবছাভাবে চোখে পড়ল ধোঁয়া আর আলোর আভা। পরমুহূর্তে ভারী একটা কিছু আছড়ে পড়ল কর্সেয়ার-জাহাজের পঞ্চাশ গজ ডানে, পানি ছিটকাল।

ভয়ে অলিভারের গায়ে সেঁটে এল রোজামুণ্ড, বুঝতে পারছে—কামানের গোলা ছোঁড়া হচ্ছে ওদেরকে লক্ষ্য করে।

হা হা করে হেসে উঠলেন আসাদ। 'বেকুবের দল!' বলে উঠলেন তিনি। 'ভয় পাবার কিছু নেই, আমার সৈন্যেরা! ওরা স্রেফ আন্দাজের উপর কামান দাগছে। অন্ধকারে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা।'

'আমার তা মনে হয় না,' ফিসফিসিয়ে রোজামুণ্ডকে বলল অলিভার। 'তুমি আছ এ-জাহাজে। সে-কারণেই সম্ভবত আমাদেরকে ডোবাতে চাইছেন না সার জন।'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের দিকে চাইল রোজামুণ্ড। সিলভার হেরনের বাতি ম্লান থেকে ম্লানতর হয়ে যাচ্ছে।

'আমরা তো এগিয়েই যাচ্ছি!' ভয়ার্ত গলায় বলল ও। 'এভাবে চলতে থাকলে ওরা কিছুতেই ধরতে পারবে না

আমাদের।'

একই ভয় অলিভারের ভিতরেও কাজ করছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, অলৌকিকভাবে যদি ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু না করে, ওর পরিকল্পনার বারোটা বাজতে চলেছে। মরিয়া হয়ে উঠল ও, আর সে-কারণেই মাথায় এল বেপরোয়া এক চাল।

'একটাই উপায় দেখতে পাচ্ছি,' বলল ও। 'কিন্তু ব্যাপারটা জুয়া খেলার মত হয়ে যায়। জিতলে জীবন... আর হারলে নিশ্চিত মৃত্যু।'

'পরোয়া করি না,' বলল রোজামুণ্ড। 'মরলেও এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না আমাদের।'

'যে-কোনও পরিণতির জন্য তৈরি আছ তুমি?'

'বলিনি, আজ রাতে তোমার সঙ্গে জীবন দেব আমি? আহ্, কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না!'

'তবে তাই হোক,' গম্ভীর গলায় বলল অলিভার। রোজামুণ্ডের কবজি হাতের মুঠোয় ধরল ও। 'এসো আমার সঙ্গে।'

সিঁড়ি ধরে পুপ-ডেক থেকে নেমে এল দুজনে। সারেং আর তাদের সহকারীদের ঠেলে এগিয়ে চলল পাটাতন ধরে। বিস্মিত দৃষ্টিতে অনেকে তাকাল ওদের দিকে, কিন্তু বাধা দিল না। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত।

সোজা ওয়েইস্ট ডেকে চলে গেল অলিভার। কাপড়ে ঢাকা লণ্ঠনটা তুলে ধরিয়ে দিল রোজামুণ্ডের হাতে। উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন বাদশাহ্, নেভাতে বললেন লণ্ঠন, কিন্তু তাতে কান দিল না অলিভার। মূল মাস্তুলের গোড়ায় পৌঁছে থামল। ওখানে জড়ো করে রাখা হয়েছে জাহাজের সবক'টা বারুদের পিপে। একটা পিপের মুখ খুলে ফেলল ও, কাত করে ভিতরের সব বারুদ ছড়িয়ে দিল পাটাতনের উপরে। তারপর রোজামুণ্ডের

হাত থেকে লণ্ঠন নিয়ে ওটা ধরল ঠিক খোলা বারুদের উপরে।

বিস্ময়ের ধ্বনি বেরিয়ে এল দর্শকদের মুখ দিয়ে। কিন্তু সে-আওয়াজ ছাপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল অলিভার:

'দাঁড় টানা বন্ধ করো!'

ঢাকের আওয়াজ থেমে গেল। কিন্তু এরপরেও এক দফা দাঁড় ঘোরাল মাল্লারা।

'থামাও দাঁড় টানা!' আবার চেঁচাল অলিভার। 'আসাদ, ওদেরকে থামতে বলুন। নইলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সবাইকে দোজখে পাঠিয়ে দেব।' হুমকিটা জোরালো করার জন্য লণ্ঠনটা একটু নামাল বারুদের উপরে।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল দাঁড় বাওয়া। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত স্থবির হয়ে গেল প্রতিটি মানুষ—ক্রীতদাস, কর্সেয়ার, শাহজাদা... এমনকী স্বয়ং বাদশাহ্ও। ফ্যাল ফ্যাল করে সবাই তাকিয়ে থাকল লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত দীর্ঘদেহী মূর্তিটার দিকে। যমদূতের মত দেখাচ্ছে ওকে, হুমকি দিচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যুর।

অনেকক্ষণ পর মুখের ভাষা খুঁজে পেলেন আসাদ। খ্যাপাটে গলায় বললেন, 'ইয়া আল্লাহ্! শাকের, তোমাকে কি জিনে ধরেছে?'

ঝট্ করে পিতার পাশে এসে দাঁড়াল মারযাক। চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'অ্যাই! সবাই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস কেন? হারামজাদাকে কেটে দু'টুকরো করে দে!'

হুকুম দিয়েই ক্ষান্ত হলো না সে। ধনুক নিয়ে এসেছে, ওটা তাক করল অলিভারের দিকে। খপ্ করে তার হাত ধরে ফেললেন আসাদ, ছেলে কতবড় বোকামি করতে চলেছে, তা বুঝতে পেরেছেন।

'কেউ যদি আমার দিকে এক পা-ও এগোয়, বারুদে আগুন দেব আমি,' শীতল গলায় বলল অলিভার। 'আমার দিকে যদি তীর ছোঁড়ো, শাহজাদা, একই ঘটনা ঘটবে—হাত ফসকে লণ্ঠনটা পড়ে যাবে বারুদের উপর। এখুনি যদি আল্লাহ্-র পেয়ারা হতে চাও, চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

'শাকের-আল-বাহার!' দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন আসাদ, গলার সুর বদলে গেছে। 'কসম খোদার, পাগলামি ছাড়ো, বাছা!'

'পাগলামি করছি না আমি,' শান্ত গলায় বলল অলিভার। 'খুব ভেবে-চিন্তেই কাজ করছি। আলজিয়ার্সে ফিরে ফাঁসিতে ঝোলার ইচ্ছে নেই আমার... ইচ্ছে নেই মাল্লার বেঞ্চিতে ফিরে যাবারও।'

'যদি কথা দিই, অমন কিছু ঘটবে না তোমার ভাগ্যে?'

'বিশ্বাস করব না আমি। আপনার উপর থেকে সমস্ত আস্থা হারিয়েছি আমি, আসাদ। কারণ নিজেকে মাথামোটা ও একগুঁয়ে বলে প্রমাণ করেছেন আপনি। এ-ধরনের একজনের উপর বিশ্বাস রেখে অতীতে মস্ত বড় ভুল করেছিলাম... আর সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটাব না। গতকাল ঠাণ্ডা মাথায় বোঝাতে চেয়েছি আপনাকে, কিছুই কানে তোলেননি। আপনার লোভই আপনার সর্বনাশ ডেকে এনেছে, আসাদ। অথচ যদি আমার কথা শুনতেন, এসবের কিছুই ঘটত না। নিরাপদে ফিরে যেতে পারতেন দেশে, আমাকে মনের মত করে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতেন। আমার জীবন তুলে দিয়েছিলাম আমি আপনার হাতে, আপনি পরোয়াই করেননি। মুখে যত না আঁটে, তারচেয়ে বেশি গিলতে চেয়েছিলেন। এবার বুঝুন মজা!'

অলিভারের প্রতিটা কথা শেলের মত বিদ্ধ হচ্ছে বাদশাহ্-র

অন্তরে। নিজের অজান্তেই খামচে ধরলেন পুপ-ডেকের রেলিং, আঙুলগুলো সাদা হয়ে গেল রক্ত সরে যাওয়ায়। জাহাজের অবশিষ্ট প্রতিটা মানুষ নীরব দর্শক হয়ে দেখছে সবকিছু।

'তোমার দাবি জানাও,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন আসাদ। 'আল্লাহ্-র কসম, যা চাইবে তা-ই পাবে তুমি।'

'আমি সেটা গতকালই বলেছিলাম, কিন্তু আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন,' অলিভার বলল। 'আমার জীবন ও স্বাধীনতার বিনিময়ে আরেকজনের জীবন ও স্বাধীনতা।'

পাশ ফিরলে দেখতে পেত ও, রোজামুণ্ডের চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা—প্রেমের দৃষ্টি বললেও সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না।

'আমি তোমাকে ধনী বানাব, শাকের... দেব অভূতপূর্ব সম্মান!' খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চাইছেন যেন আসাদ-আদ-দীন। 'আমার ছেলের মত থাকবে তুমি। আমার পরে পুরো বাদশাহীর মালিক বানাব তোমাকে। হবু-বাদশাহ্ হিসেবে যে-ধরনের সমীহ আর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা উচিত, সব পাবে তুমি...'

'দুঃখিত, আমাকে কেনা যাবে না, আসাদ,' বাধা দিয়ে বলল অলিভার। 'বিক্রি হবার মানুষ ছিলাম না আমি কোনোকালেই। ছিলাম স্রেফ এক অনুগত ভৃত্য... কিন্তু আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে সেই বাঁধন ছিঁড়ে দিয়েছেন আপনি। এখন আর আপনার হুকুম মানতে বাধ্য নই আমি। এখন শুধু আপনি আমার পরিণতির ভাগীদার হবেন, আর কিছু না। এককালে দু'জনে একসঙ্গে বহু জাহাজ ডুবিয়েছি আমরা, আজ একসঙ্গে আপনি আমার সঙ্গে ডুববেন।'

'গজব পড়ুক তোমার উপরে, বেঈমান!' চিৎকার করে

উঠলেন আসাদ। 'দোজখে পচবে তুমি!'

বাদশাহ্-র কণ্ঠে পরাজয়ের সুর কান এড়াল না কর্সেয়ারদের। গুঞ্জন শুরু হলো পুরো জাহাজ জুড়ে। একটু পর এগিয়ে এল কয়েকজন। হাতজোড় করে মিনতি করল অলিভারের কাছে। মনে করিয়ে দিল তাদের আনুগত্যের কথা, অনুরোধ করল ওদেরকে যেন এভাবে মৃত্যুমুখে না ফেলে।

'আমার উপর আস্থা রাখো,' বলল ওদেরকে অলিভার। 'এতদিন বিজয় ছাড়া আর কিছু দিইনি আমি তোমাদেরকে। আজ... আমাদের শেষ অভিযানে পরাজয় উপহার দেব, তা হতে পারে না।'

'কিন্তু গ্যালিয়নটা তো আমাদের ঘাড়ে চড়ে বসেছে!' হাহাকার করে উঠল ভিজিটেলো।

সত্যিই তা-ই। হালকা বাতাসের সাহায্য নিয়ে ধীরে হলেও মূর্তিমান দানবের মত এগিয়ে আসছে সিলভার হেরন। আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে ওটার অবয়ব। কর্সেয়ার জলযান লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে জাহাজটার গলুই। একটু পরেই একেবারে পাশে চলে এল। ওটার পাটাতন থেকে ভেসে এল ইংরেজ নাবিকদের বিজয়োল্লাস। লোহার আঁকশি ছুটে এল খুব শীঘ্রি, পাশাপাশি বেঁধে ফেলা হলো দুটো জাহাজকেই। আর তারপরেই বর্ম পরে, হাতে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে মুসলিম দস্যুদের জাহাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল একদল যোদ্ধা। বারুদে আগুন ধরবার পরোয়া আর করল না কর্সেয়াররা। যা করে অভ্যস্ত, তাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অস্ত্রের ভাষায় অভ্যর্থনা জানাল হামলাকারীদের।

অস্ত্রের ঝনঝনানিতে প্রকম্পিত হলো চতুর্পাশ। গ্যালিয়নের আলোয় সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে অলিভার। ইংরেজ যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সার জন কিলিগ্রু, তাঁর পাশেই রয়েছে

লায়োনেল। ওরা দু'জনেই সবার আগে চড়েছে ওদের জাহাজে। পাটাতনে পা রেখেই পেয়ে গেছে জ্যাসপার লেইকে। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে লায়োনেলের উদ্দেশে তলোয়ার চালাল লোকটা, কোনোমতে তার আঘাত ঠেকাল ছোট ট্রেসিলিয়ান। আবার তলোয়ার চালাল জ্যাসপার... আবার! একইভাবে চারপাশে চলছে আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণ। প্রমাদ গুনল অলিভার, রক্তগঙ্গা বইতে শুরু করেছে... ঘটে যাচ্ছে অনর্থক প্রাণহানি। চোখের সামনে একের পর এক লাশ পড়তে দেখছে ও।

'থামো তোমরা!' সঙ্গীদের উদ্দেশে আরবীতে চেঁচিয়ে উঠল ও। তারপর ইংরেজিতে বলল, 'একটু থামুন, সার জন! আমার কথা শুনুন। থামান আপনার লোকজনকে। আমার কথা শেষ হবার পর নাহয় যা খুশি করবেন।'

রোজামুণ্ডকে ওর পাশে দেখতে পাচ্ছেন সার জন, ভয় পেলেন পাছে ক্ষতি হয় মেয়েটার, তাই তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে হাত তুললেন, দাঁড়াতে বললেন নিজের যোদ্ধাদের।

কয়েক মুহূর্তের হৈ-হল্লার পর নেমে এল পিনপতন নীরবতা। দু'পাশে সরে গেল দুই পক্ষের যোদ্ধারা।

অলিভারের দিকে ফিরলেন এবার সার জন। বললেন, 'কী বলার আছে তোমার, দলত্যাগী কুকুর?'

'প্রথমেই জানিয়ে দিতে চাই,' অলিভার বলল, 'আপনি যদি এক্ষুণি আপনার লোকজনকে জাহাজে ফিরে যেতে না বলেন, তা হলে এটা বারুদে ছুঁড়ব আমি।' হাত নেড়ে জ্বলন্ত লণ্ঠন আর পায়ের কাছে ছড়িয়ে থাকা বারুদ দেখাল ও। 'আমার জাহাজ ডুবে যাবে... আর ওটার ওজনে ডুববে আপনারটাও। দুটোই একসঙ্গে বেঁধে রেখেছেন কি না!'

'হুমকি দিচ্ছ?'

'না, সতর্ক করে দিচ্ছি। অযথা রক্তপাতের প্রয়োজন নেই। যার জন্যে এসেছেন... মানে রোজামুণ্ডের কথা বলছি... ওকে কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই নিয়ে যেতে পারেন আপনি। শুধু যদি লড়াই না করেন... যদি কারও রক্ত না ঝরান।'

চারপাশে চোখ বোলালেন সার জন। সশস্ত্র কর্সেয়ারদেরকে দেখে বুঝি হিসেব্ করে নিলেন, যুদ্ধ চালিয়ে গেলে কতখানি ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। বললেন, 'দস্যুদের সঙ্গে চুক্তি করবার ইচ্ছে নেই আমার, তারপরেও... তোমার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, রাজি হব আমি... তবে একটা শর্ত আছে। শুধু রোজামুণ্ডকে দিলে চলবে না, আমি আরেকজনকে গ্রেফতার করব বলেও মনস্থির করে এসেছি। জনৈক শাকের-আল-বাহার... এককালে যাকে অলিভার ট্রেসিলিয়ান বলে ডাকতাম আমরা... মানে, তুমি!'

নির্দ্বিধায় মাথা ঝোঁকাল অলিভার। 'আমি রাজি। আত্মসমর্পণ করব আমি আপনার কাছে, কিন্তু কথা দিতে হবে—বাকিদের আপনি ছেড়ে দেবেন।'

উত্তেজনায় ওর লণ্ঠন-ধরা হাতটা আঁকড়ে ধরল রোজামুণ্ড। আরেকটু হলেই বারুদে পড়ে যাচ্ছিল ওটা।

'সাবধান, লেডি,' হালকা গলায় বলল অলিভার, 'নইলে আমাদের মরণ ডেকে আনবে তুমি।'

'আমার তাতে কোনও দুঃখ থাকবে না,' বলল রোজামুণ্ড।

এগিয়ে এসে চড়া গলায় প্রতিশ্রুতি দিলেন সার জন—অলিভার আত্মসমর্পণ করলে, আর রোজামুণ্ডকে তাঁর জিম্মায় তুলে দেয়া হলে কারও কোনও ক্ষতি করবেন না।

কর্সেয়ারদের দিকে ফিরল অলিভার। অনুবাদ করে শোনাল সার জনের বক্তব্য। বাদশাহ্‌কে অনুরোধ করল তাতে সম্মতি

জানাতে।

মুখ বাঁকালেন আসাদ-আদ-দীন। 'তোমাকে তো ফাঁসিতেই ঝোলাতে চাইছে লোকটা... অসুবিধে কী? একটা বেঈমান আর বিধর্মী মেয়ের প্রাণের বদলে যদি ঝামেলা এড়ানো যায়, আমি তাতে বাধা দেব কেন?'

সার জনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল অলিভার। 'আমি তা হলে আত্মসমর্পণ করছি।' লণ্ঠনটা ছুঁড়ে ফেলে দিল পানিতে।

কথাটা মুখ থেকে বেরুতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল কয়েকজন ইংরেজ যোদ্ধা, ঝটপট বেঁধে ফেলল ওর দু'হাত। কেড়ে নিল তলোয়ার। রোজামুণ্ড ওর পক্ষ নিয়ে কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু সুযোগ পেল না। সার জন দ্রুত এগিয়ে এসে একটা কম্বল জড়িয়ে দিলেন ওর গায়ে। তারপর এক হাতে জাপটে ধরে দ্রুত নিয়ে যেতে শুরু করলেন নিজের জাহাজের দিকে। ভয় পাচ্ছেন, কর্সেয়াররা হয়তো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বসবে।

তেমন কিছু ঘটল না। নীরবে অলিভারকে বন্দি হতে দেখল জলদস্যুরা, দেখল ইংরেজ জাহাজে সওয়ার হতে। ওকে যখন ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেছে যোদ্ধারা, তখন উপলব্ধি এল ওদের মনে—বুঝতে পারল শাকের-আল-বাহারের আত্মত্যাগের প্রকৃতি। হ্যাঁ, ধোঁকা দিয়ে শত্রু-জাহাজকে ওদের উপর চড়াও হতে দিয়েছে মানুষটা, কিন্তু নিজে আত্মসমর্পণ করে সবার জীবনও বাঁচিয়েছে! শেষ পর্যন্ত সঙ্গীদের প্রতিই অনুগত থেকেছে সে, অন্য কারও প্রতি নয়। আবেগ ভর করল কর্সেয়ারদের মধ্যে। তলোয়ার উঁচু করে হৈ হৈ করে উঠল তারা... প্রাণ থাকতে প্রিয় নেতাকে নিয়ে যেতে দেবে না। আসাদ চেঁচিয়ে ওদেরকে থামতে বললেন, কিন্তু তাতে কাজ হলো না। হলো অলিভারের

চিৎকারে।

'বন্ধুরা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কোরো না... মিথ্যেবাদী বানিয়ো না আমাকে!' বলল ও। 'ভাল থেকো! আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষা করুন... দিনে দিনে উন্নতি হোক তোমাদের!'

সমস্বরে ওর আশীর্বাদের জবাব দিল দস্যুরা। কথা দিল, কোনোদিন ভুলবে না ওকে।

একটু পরেই কেটে দেয়া হলো সব বাঁধন, খুলে নেয়া হলো আঁকশি। কর্সেয়ারদের জাহাজের পাশ থেকে সরে এল সিলভার হেরন। মুখ ঘুরিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

জাহাজকে আলজিয়ার্সের পথে রওনা হবার আদেশ দিলেন আসাদ-আদ-দীন। যা ঘটে গেছে, এরপর আর স্প্যানিশ স্বর্ণবাহী জাহাজের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাবার মানসিকতা নেই তাঁর। ফেরার আদেশ দিয়ে চলে এলেন শামিয়ানার তলায়, তক্তপোশে বসে মুখ ঢাকলেন দু'হাতে। ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে শরীর। অব্যক্ত এক যন্ত্রণা অনুভব করছেন বুকের ভিতর। রাগ-দ্বেষ-হিংসা কেটে গিয়ে ভর করেছে অনুশোচনা। শাকের-আল-বাহারের শেষ কাজটা শুধু কর্সেয়ারদের মধ্যে নয়, তার ভিতরেও জাগিয়ে তুলেছে ওর আনুগত্যের উপলব্ধি।

ভুল করেছেন তিনি, বুঝতে পারছেন আসাদ, মস্ত ভুল। মোহ আর ক্রোধে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, সে-কারণে হারিয়েছেন পুত্রসম ছেলেটিকে। পুরো নারীজাতিকে অভিশাপ দিলেন সে-কারণে, অভিশাপ দিলেন ভাগ্যকে... তবে সবচেয়ে বেশি অভিশাপ দিলেন নিজেকে।

পাটাতন থেকে পানিতে লাশ ফেলতে শুরু করেছে কর্সেয়াররা। ধুয়ে ফেলছে রক্ত। কেউ খেয়াল করল না, লাশের মধ্যে নেই ওদের এক সঙ্গী... প্রাক্তন এক ইংরেজ ক্যাপ্টেন।

নেই জীবিতদের মধ্যেও।

দুঃখে কাতর অবস্থায় আলজিয়ার্সে ফিরল কর্সেয়াররা। অভিযানে ব্যর্থতার জন্য নয়, বরং ওদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে হারাবার শোকে। ইসলামের নামে অস্ত্র তোলার জন্য ওর চেয়ে বড় আর কোনও বীর দেখেনি ওরা কোনোদিন। কী ঘটেছিল, তা সাধারণ মানুষ কোনোদিন জানতে পারল না। কেউ সাহসই করল না সেই কাহিনি প্রকাশ করবার। এটুকু শুধু জানল সবাই, যুদ্ধে মারা যায়নি শাকের-আল-বাহার, বেঁচে আছে সে। সত্যের অভাবে জন্ম নিল গুজব, ছড়িয়ে পড়ল কল্প-কাহিনির ডালপালা। এর উপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হলো এক অদ্ভুত কিংবদন্তি। পরের অর্ধশতাব্দীর প্রতিটি প্রহর প্রতীক্ষায় রইল মানুষ—একদিন ফিরে আসবে তাদের মহান বীর। শাকের-আল-বাহারের জন্য এই অপেক্ষা পরিণত হলো আলজিয়ার্সের দৈনন্দিন জীবনের এক অংশে।

তেইশ

ভিন্ন ধর্ম

সিলভার হেরনের ফোক্যাসলে, একটা অন্ধকার কুঠুরিতে নিক্ষেপ করা হলো অলিভারকে। আত্মসমর্পণের পর থেকে ওর সঙ্গে আর একটি কথাও বলেননি সার জন। পিছমোড়া করে হাত বেঁধে ওকে

তোলা হয়েছে জাহাজে, খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওখানে। পরিচিত আরেকটা মুখ দেখেছে অলিভার আসার পথে—লর্ড হেনরি গোড, ব্রিটেনের মহামান্য রানির লর্ড লেফটেন্যান্ট... তা থেকে বুঝতে পেরেছে, এই অভিযানে রাজপ্রাসাদের পৃষ্ঠপোষকতা আছে।

নিকষ আঁধারে অনেকক্ষণ অসহায়ের মত পড়ে রইল প্রাক্তন নাইট, নির্বিকারভাবে। কিচ্ছু ভাবছে না, অনুভব করছে না উদ্বেগ বা ভয়... মাথা ঘামাচ্ছে না ভবিষ্যৎ নিয়ে। নিজের দায়িত্ব পালন করেছে ও—রোজামুণ্ডকে মুক্ত করেছে, প্রাণ বাঁচিয়েছে মুসলিম বন্ধুদের, লায়োনেলও খুব শীঘ্রি তার অপরাধের শাস্তি পাবে। এসবের পরে আর কিছু চাওয়া-পাওয়ার নেই। নিজেকে তো মৃতই ধরে নিয়েছে, খামোকা দুশ্চিন্তা করে লাভ কী? সবকিছু তাই সঁপে দিয়েছে ভাগ্যের হাতে। যা ঘটে ঘটুক, পরোয়া করে না ও। হ্যাঁ, যদি ভাবত কী হারিয়েছে—মানে আলজিয়ার্সের বাদশাহী এবং কর্সেয়ার-বাহিনীর নেতৃত্ব আর কী—তা হলে হয়তো বা খারাপ লাগতে পারত। কিন্তু কোনোকালেই ওসবের প্রতি লোভ ছিল না ওর। খ্রিস্টান অভিজাত পরিবারে জন্ম নেয়া একজন ভদ্রলোকের জন্য অমন ভবিষ্যৎ শোভাও পায় না। যা ঘটেছে, তা-ই বরং অনেক ভাল।

হঠাৎ কুঠুরির ভিতরে একটা খসখসানির আওয়াজে বাস্তবে ফিরে এল অলিভার। ইঁদুর-টিঁদুর হবে, ভাবল ও। সোজা হয়ে বসে পা ঠুকল মেঝেতে, প্রাণীটা যাতে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। তেমন কিছু ঘটল না, তার বদলে ভেসে এল একটা পরিচিত কণ্ঠ।

'কে ওখানে?'

চমকে গেল অলিভার। অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যায় না,

এতক্ষণ কুঠুরিতে ও একাই আছে বলে ভেবেছিল, এখন সে-ধারণা বদলে গেছে।

'কে ওখানে?' জবাব না পেয়ে আবার বলে উঠল মানুষটা। 'এত অন্ধকার কেন? কোথায় আমি?'

জ্যাসপার লেইয়ের গলা চিনতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না অলিভারের। শুধু বুঝতে পারছে না, লোকটা এখানে এল কী করে। ওর সঙ্গী-সাথীদের কারও তো বন্দি হবার কথা ছিল না!

'শান্ত হও,' বলল ও। 'সিলভার হেরনের ফোক্যাসলে আছ তুমি। কীভাবে এসেছ, তা জানি না।'

'কে আপনি?' মাথা বোধহয় কাজ করছে না লেইয়ের। চিনতে পারছে না অলিভারের গলা।

'আমাকে বারবারি উপকূলে শাকের-আল-বাহার বলে ডাকা হয়।'

'সার অলিভার!' চমকে ওঠা কণ্ঠে বলল লেই।

'হুঁ... এখন সম্ভবত ওই নামেই ডাকতে পারবে, যদিও খুব বেশি সময়ের জন্য নয়। ধারণা করছি, সাগরের পানিতে কবর হবে আমার। নইলে আমার কবরফলকে কোন্ নাম লেখা হবে, সেটা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যেতে পারে অভিজাত ইংরেজ-রা। কিন্তু... তুমি এখানে কী করে এলে, জ্যাসপার? আমার সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন সার জন—আর কোনও কর্সেয়ারকে বন্দি করবেন না। মনে তো হয় না তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করার মানুষ!'

'অতকিছু তো জানি না,' বলল লেই, 'তবে লড়াইয়ের সময় মাথায় আঘাত পেয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম আমি... আপনার ওই দুশ্চরিত্র ভাইটির গায়ে তলোয়ার বিঁধিয়ে দেবার পরে।'

থমকে গেল অলিভার। 'কী বললে? তুমি লায়োনেলকে খুন করেছ?'

'আমার তা-ই বিশ্বাস,' শান্তকণ্ঠে জানাল লেই। 'অন্তত তলোয়ারের ফলার দু'ফুট ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ওর গায়ে। ওই যে... ওরা যখন লাফিয়ে আমাদের জাহাজে উঠল! সবার সামনে পেয়ে গিয়েছিলাম মাস্টার লায়োনেলকে। ভাবতেই পারিনি ওকে ওখানে দেখব।'

নীরব হয়ে গেল অলিভার। হঠাৎ বুক খাঁ খাঁ করে উঠেছে। একটু পর নিজেকে সামলে বলল, 'সন্দেহ নেই, ওকে ওর প্রাপ্য শাস্তিই দিয়েছ তুমি। এ-কথাও ঠিক, সবার সামনে লায়োনেলকে পেয়ে যাওয়াটা একটু অবিশ্বাস্য বটে। আর যা-ই হোক, সামনে থেকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত মানুষ নয় ও।'

'তা হলে?'

'কে জানে, হয়তো ইচ্ছে করেই মরতে এসেছিল। ফাঁসির দড়ির চেয়ে তলোয়ারের ফলা অনেক ভাল না? আশা করি তা-ই ঘটেছে। ঈশ্বর ওর আত্মাকে শান্তি দিন।'

'আপনি আবার ঈশ্বরের কথা বলছেন?' বিভ্রান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লেই। 'আল্লাহ্-র কী হলো?'

'আল্লাহ্ বলো, বা ঈশ্বর... সর্বশক্তিমান তো একজনই—তাই না? কী নামে ডাকলে, তাতে কী এসে-যায়? যাক গে, এবার বোঝা যাচ্ছে তোমাকে এখানে পাবার কারণ। লায়োনেল খুন হওয়ায় তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে ইংরেজরা—সার জনের সঙ্গে আমার চুক্তি হবার আগেই। সম্ভবত শাস্তি দেবার ইচ্ছে।' হাসল অলিভার। 'অবশ্য... যদ্দূর জানি তোমার সম্পর্কে, বহুকাল আগে থেকেই ফাঁসিতে চড়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছ তুমি। কাজেই নতুন কোনও দুঃসংবাদ দিচ্ছি না। ঠিক?'

জবাব দিল না লেই। অন্ধকারে নড়ে উঠল। 'ওফ্, মাথাটা টন টন করছে!' ককিয়ে উঠল সে।

'এর একটা চমৎকার অষুধ আছে... ফাঁসি!' তিক্ত গলায় বলল অলিভার। 'আশা করছি সকাল হলেই ওটা জুটবে তোমার-আমার কপালে। দুঃখিত লেই, তোমার এ-পরিণতি চাইনি আমি। লায়োনেলের আসলে আমার হাতে খুন হওয়া দরকার ছিল। তা হলে তুমি বাকি কর্সেয়ারদের সঙ্গে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লেই। বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, সার অলিভার? আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?'

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ,' কলেমা পড়ল অলিভার। 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনও উপাস্য নেই, এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রেরিত রাসূল।'

'ভিন্নধর্মীদের মন্ত্র পড়ছেন আপনি!' বিরক্ত গলায় বলল লেই। 'এখন কি আর কোনও প্রয়োজন আছে তার? আলজিয়ার্স ছেড়ে এসেছি আমরা!'

'আমি ওটা নিজের স্বার্থের জন্য পড়ছি না, লেই। ইসলাম ধর্মকে সত্যিই মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছি আমি। ওটা স্রেফ ধর্ম নয়, জীবনযাপনের একটা ধারা... খুব সুন্দর এবং নিয়ন্ত্রিত একটি ধারা। দুঃখের বিষয়, খ্রিস্টানদের মধ্যে ওদের মত শৃঙ্খলা আমি কখনও দেখিনি।'

'মরার আগে এ-সব কী বলছেন? বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়ে মরতে চান আপনি?'

'ধর্ম কী?' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল অলিভার। 'মানুষের বিশ্বাস বৈ আর তো কিছু নয়!'

'তারমানে আল্লাহ্ বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না আপনি,' উপসংহারে পৌঁছুবার চেষ্টা করল লেই। 'মানছেন আসলে মনের বিশ্বাসটাকে।'

'ঠিক তার উল্টো। আমি আল্লাহ্‌কেই বিশ্বাস করি।'

'সত্যিকার আল্লাহ্? যিনি আসমানের উপরে থাকেন?'

'আর তো কোনও আল্লাহ্ নেই। আগেই তো বলেছি, তিনি এক—আমরা একেক ধর্মে একেক নামে ডাকি... এই আর কী।'

'যদি বিশ্বাসই করেন, ভয় হচ্ছে না আপনার?'

'কীসের ভয়?'

'নরকের... আগুনের... অনন্ত শাস্তির!' গলা কেঁপে উঠল লেইয়ের।

শান্ত রইল অলিভার। 'ভয়ের কী আছে? আল্লাহ্ যেভাবে আমার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন, সেভাবেই কাজ করেছি আমি। যেভাবে আমাকে তৈরি করেছেন, তা-ই হয়েছি আমি। তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো কিছুই করা সম্ভব নয় মানুষের পক্ষে! তা হলে তাঁর ইচ্ছে পালনের জন্য ভয় পাব কেন?'

'আপনি মুসলমানদের বুলি আওড়াচ্ছেন!'

'কারণ আমি মুসলমান... এবং এই ধর্ম আমাকে শান্তি দিচ্ছে। তোমার মত পাপীরও একই কাজ করা উচিত।'

অন্ধকারে মাথা নাড়ল লেই। 'যদি ঈশ্বর বা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করতাম, তা হলে তা-ই করতাম আমি। কিন্তু আজও আমি মনে-প্রাণে নাস্তিক রয়ে গেছি, সার অলিভার।'

অলিভার হাসল। 'তোমার অবিশ্বাসে আল্লাহ্ উধাও হয়ে যাবেন না, কিংবা বিশ্বাস করলেও রাতারাতি উদয় হবেন না। অস্থির হয়ে আছ তুমি, লেই। আমার পরামর্শ হলো, প্রার্থনা করো তাঁর উদ্দেশে। উপকার হবে তাতে।'

'আপনি প্রার্থনা করবেন না?'

'প্রার্থনার চেয়েও বেশিকিছু করব। তোমার প্রাণভিক্ষা চাইব আমি সার জনের কাছে।'

'উনি আপনার কথা শুনতে যাবেন কেন?'

'শুনতে হবে ওঁকে। ওঁর সম্মান জড়িত এতে। আমাকে কথা দিয়েছেন, কর্সেয়ারদের মধ্যে আমাকে ছাড়া আর কাউকে শাস্তি দেবেন না। তুমি ওদেরই একজন।'

'কিন্তু মাস্টার লায়োনেলকে খুন করেছি আমি।'

'সত্যি। কিন্তু ওর খুনির ব্যাপারে আলাদা কোনও শর্ত দেননি সার জন। এখন যদি ফাঁসিতে ঝোলান তোমাকে, প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গকারী হিসেবে চিহ্নিত হবেন। এ-কথাটাই আমি বুঝিয়ে দেব ভদ্রলোককে।'

বুকের উপর থেকে জগদ্দল এক পাথর যেন সরে গেল লেইয়ের—মনে হলো যেন মাথার উপর থেকে সরে গেছে মৃত্যুর ছায়া। নরক বা অনন্ত শাস্তির কথা আর বলল না সে, কটাক্ষ করল না অলিভারের ধর্মবিশ্বাস নিয়েও। বুঝে গেল, কে কোন্ ধর্মের উপর বিশ্বাস রাখবে, সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্তত ওর মত লোকের শোভা পায় না এ-নিয়ে কোনও ধরনের মন্তব্য করা। আর যদি নিজের ধর্মবিশ্বাসের প্রশ্ন আসে, সেটা সময় এলে ভেবে দেখা যাবে।

নীরব হয়ে গেল লেই। মেঝেতে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করল, যদিও সফল হলো না তাতে। নৈঃশব্দ্য অসহ্য হয়ে উঠলে আবার অলিভারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু ততক্ষণে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে প্রাক্তন নাইট।

বিস্ময় জাগল লেইয়ের মনে। বুঝতেই পারছে না, এমন পরিস্থিতিতে লোকটা ঘুমায় কী করে! ঘৃণিত এক জলদস্যু, ধর্মত্যাগী বিশ্বাসঘাতক, তার ওপরে ফেরারী আসামী—নিশ্চিত ফাঁসির দড়ি অপেক্ষা করছে অলিভারের জন্য; এরপরেও কি সামান্যতম দুশ্চিন্তা অনুভব করছে না সে? একবার ভাবল ডেকে

তোলে তাকে, পরমুহূর্তে মত পাল্টাল। থাক, ঘুমাচ্ছে যখন ঘুমাক। পরেরবার যখন ঘুমাবে, তখন তো আর জাগতে পারবে না অদ্ভুত মানুষটা।

অন্ধকার কুঠুরিতে একাকী আপন-চিন্তায় ডুবে গেল জ্যাসপার লেই। যতই ভাবল, ততই অপরাধবোধ পেয়ে বসল তাকে। অলিভারের আজকের দুর্দশার পিছনে তার অবদান কম নয়। অথচ তারপরেও লেইয়ের জীবন বাঁচিয়েছে লোকটা আলজিয়ার্সে, আজও আবার তার হয়ে সার জনের কাছে জীবনভিক্ষা চাইবে বলে কথা দিয়েছে। এমন মহত্ত্ব কোনও সাধারণ মানুষের কাছে আশা করা যায় না। কিছু করা যায় না মানুষটার জন্য? আসল ঘটনা যতটুকু জানে লেই, তা যদি খুলে বলে সার জনের সামনে, তাতে কি প্রাণরক্ষা পাবে না অলিভারের? নিজের হঠকারিতার কাহিনি বলে হয়তো বিপদ ডেকে আনবে লেই, তবু চিন্তাটা কিছুতেই দূর করতে পারল না মাথা থেকে।

রাতভর ছটফট করল সে। জীবনে এই প্রথমবারের মত একটা ভাল কাজ করবে বলে ঠিক করেছে, কিন্তু সেটার সুযোগ পাবে কি না জানে না।

ভোর হতেই হাজির হলো কয়েকজন নাবিক, অলিভারকে নিয়ে যেতে এসেছে। সঙ্গে যেতে চাইল লেই, কিন্তু রাজি হলো না লোকগুলো।

'তোমাকে নেবার কোনও আদেশ পাইনি আমরা,' রুক্ষ গলায় বলল এক নাবিক।

'না পেতে পারো,' বলল লেই, 'কিন্তু সার জন জানেন না আমি কী বলতে চাই। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা... দেরি হয়ে যাবার আগেই শোনা প্রয়োজন তাঁর। দয়া করে নিয়ে চলো আমাকে।

না নিলে মস্ত ভুল করবে।'

'চুপ!' গর্জে উঠল নাবিক। থাপ্পড় মারল লেইয়ের গালে। 'এত উতলা হয়ো না। খুব শীঘ্রি তোমার পালা আসবে। আপাতত এই বদমাশটার একটা গতি করে নিই!'

লেই তারপরেও হাল ছাড়তে রাজি ছিল না, কিন্তু অলিভার হাত তুলে বাধা দিল তাকে। বলল, 'খামোকা মুখ খরচ করে লাভ নেই, তোমার কথা শুনবে না ওরা। কী জন্যে যেতে চাইছ, তা আমি বুঝতে পারছি, বন্ধু। সেজন্যে ধন্যবাদ। হাত বাঁধা আমার, নইলে তোমাকে জড়িয়ে ধরতাম। বিদায়।'

লেইয়ের শূন্য দৃষ্টির সামনে ওকে নিয়ে গেল নাবিকরা। কুঠুরি থেকে বের করে আনল সকালে রৌদ্রস্নাত পাটাতনে। অন্ধকার থেকে এমন উজ্জ্বল আলোয় এসে চোখ কুঁচকে গেল অলিভারের, ক্ষণিকের জন্য সব সাদা সাদা ঠেকল, দেখতে পেল না কিছু। ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে ওকে এগিয়ে নিয়ে চলল নাবিকরা। অলিভার ধরে নিল, কোনও একটা কেবিনে ঢোকানো হবে ওকে, প্রহসনমূলক একটা বিচারের জন্য। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু ঘটল না। জাহাজের মাঝ বরাবর পৌঁছুতেই একজন অফিসার এসে দায়িত্ব নিল বন্দির, ওকে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলল।

পাটাতনের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা একটা দড়ির স্তূপে বসে পড়ল অলিভার, চারপাশে রইল সশস্ত্র প্রহরী। আশপাশ দিয়ে যাবার সময় জাহাজের সমস্ত নাবিক কৌতূহল নিয়ে তাকাচ্ছে ওর দিকে। হাজার হোক, ধর্মত্যাগী নাইট... তার ওপর আবার খ্রিস্টানদের যম, দুর্ধর্ষ এক কর্সেয়ারকে তো রোজ রোজ দেখার সুযোগ মেলে না! দাড়ি-গোঁফে ঢাকা... পাগড়ি আর কোর্তা-পাজামা পরা মানুষটাকে দেখে বিশ্বাস করা মুশকিল, এ-মানুষ কোনও এককালে কর্নওয়ালের বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিল।

লোকজনের দৃষ্টিবাণকে অগ্রাহ্য করে চুপচাপ বসে রইল অলিভার। নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে পা নাড়াল, হাবভাবে ভয়-ডরের কোনও চিহ্ন নেই। ফাঁকে ফাঁকে চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল চারপাশে। রোজামুণ্ডকে খুঁজে ফিরছে।

কিন্তু কোথাও দেখা গেল না মেয়েটিকে। গত কয়েক ঘণ্টা থেকে জাহাজের কেবিনে পড়ে আছে সে। অলিভারের জানা নেই, ওর কারণেই অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাকে।

চব্বিশ

বিচার

জাহাজে দ্বিতীয় কোনও মহিলা নেই, তাই উপায়ান্তর না দেখে লর্ড হেনরি, সার জন আর জাহাজের ডাক্তার মাস্টার টোবিয়াস মিলে যথাসাধ্য সেবা-শুশ্রূষা করছেন রোজামুণ্ডের। সিলভার হেরনে চড়ার পর থেকে আধো-অচেতন অবস্থায় আছে মেয়েটা।

যত রকম ওষুধ-পথ্য আছে, খাওয়ানো হয়েছে ওকে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে জাহাজের পিছনদিককার একটা আরামদায়ক কেবিনে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। বিশ্রাম প্রয়োজন ওর।

রোজামুণ্ডের চিকিৎসা হয়ে গেলে ওকে সার জন আর লর্ড হেনরির তত্ত্বাবধানে রেখে জাহাজের নীচের অংশে চলে এলেন

মাস্টার টোবিয়াস। ওখানে আরও গুরুতর এক রোগী রয়েছে—লায়োনেল ট্রেসিলিয়ান। কর্সেয়ারদের জাহাজ থেকে আরও চারজন আহত নাবিকের সঙ্গে ওকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে।

ভোরের আলো ফুটলে লায়োনেলের খবর নিতে এলেন সার জন। তিনি হাজির হতেই রোগীর কাছ থেকে সরে এলেন টোবিয়াস। রক্তমাখা হাত ধুয়ে ফেললেন মেঝেতে রাখা গামলার পানিতে। তারপর তোয়ালে-তে হাত মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন।

'আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়, সার জন,' হতাশ গলায় বললেন ডাক্তার। 'ও শেষ!'

'শেষ মানে?' আঁতকে উঠলেন সার জন। 'মরে গেছে?'

তোয়ালে নামিয়ে রাখলেন মাস্টার টোবিয়াস। শার্টের গোটানো হাতার ভাঁজ খুলতে শুরু করলেন। 'মরাটাই শুধু বাকি,' বললেন তিনি। 'শরীরে অত্তো বড় একটা ফুটো হবার পর জীবনের প্রদীপ জ্বলতে পারে না। ক্ষতটা বন্ধ করেছি আমি, কিন্তু আভ্যন্তরীণ রক্তপাত হয়ে চলেছে ওর। মরার আগ পর্যন্ত চলবে ওটা। ওকে আপনি মৃতই ধরে নিতে পারেন।' একটু থামলেন। 'সান্ত্বনা একটাই—জ্ঞান নেই ওর। ব্যথা-বেদনা অনুভব করবে না। শান্তিতে মারা যাবে।' কোনও অভিব্যক্তি ফুটছে না তাঁর মুখে। ডাক্তারি পেশায় মানুষের মৃত্যু দেখে অভ্যস্ত তিনি। দায়সারা ভঙ্গিতে যোগ করলেন, 'বাকিদের মধ্যে ব্লেয়ার ইতোমধ্যে মারা গেছে। অন্য তিনজন সুস্থ হয়ে উঠবে।'

শেষ কথাটা কানে গেল না সার জনের। পুত্র-তুল্য যুবকটির জন্য শোকাতুর হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তর।

'ও কি একবারও জাগবে না?' আকুল কণ্ঠে জানতে

চাইলেন।

'বললাম তো, ওকে মৃতই ধরে নিতে পারেন। দুঃখিত, ব্যাপারটা আমার ক্ষমতার বাইরে।'

কাঁধ ঝুলে পড়ল সার জনের। চেহারা বিমর্ষ হয়ে উঠেছে। 'আমারও,' বললেন তিনি। 'ওর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারব, কিন্তু ফেরাতে পারব না ছেলেটাকে।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'নিয়তির সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস এই প্রতিশোধ... বুকের জ্বালা হয়তো মেটে, কিন্তু ক্ষতিটা পূরণ হয় না।'

'সুবিচার করাটা আপনার দায়িত্ব,' বললেন টোবিয়াস, 'প্রতিশোধ নেয়া নয়।'

'দুটোয় খুব বেশি কি পার্থক্য আছে?' লায়োনেলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন সার জন। তাকালেন ফ্যাকাসে চেহারাটার দিকে, মৃত্যুর ছাপ পড়তে শুরু করেছে ওতে। 'অন্তত সুবিচারের খাতিরেও যদি একটু কথা বলতে পারত! অলিভার ট্রেসিলিয়ানকে যদি ওর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঝোলাতে পারতাম, মনের সাধ মিটত!'

'সেটা তো আর সম্ভব নয়,' টোবিয়াস বললেন। 'তবে চিন্তার কিছু দেখছি না। লেডি রোজামুণ্ডের জবানবন্দি নিতে পারব আমরা। সার অলিভারের অপরাধ প্রমাণের জন্য ওটাই যথেষ্ট... মানে, আদৌ যদি প্রমাণের প্রয়োজন হয় আর কী।'

'হুঁ। কুখ্যাতিই যথেষ্ট। লোকটা মানুষ আর ঈশ্বর... দুইয়ের সঙ্গেই এত অপরাধ করেছে যে, এখন আর সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন নেই। ওকে ক্ষমা করবার প্রশ্নই ওঠে না।'

দরজায় টোকা পড়ল। এক ভৃত্য ঢুকল কামরায়। জানাল, লেডি রোজামুণ্ড জেগে উঠেছেন... এক্ষুণি দেখা করতে চেয়েছেন সার জনের সঙ্গে।

'নিশ্চয়ই লায়োনেলের খবর জানতে চাইবে।' মুখ কালো হয়ে গেল সার জনের। 'হায় যিশু, কী বলব ওকে আমি? মুক্তির আনন্দ নষ্ট করে দেব হবু-স্বামীর মৃত্যুর কথা বলে?' মাথা নাড়লেন তিনি। চোখ ফেরালেন ডাক্তারের দিকে। 'আপনি এখানে থাকছেন তো?'

'অবশ্যই, সার জন,' বললেন টোবিয়াস। 'তবে খুব বেশিক্ষণ থাকতে হবে না বোধহয়।' লায়োনেলের করুণ দশার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'ঈশ্বর ওকে শান্তি দিন,' বিড়বিড় করলেন সার জন। তারপর বেরিয়ে গেলেন কেবিন থেকে।

পাটাতনে পৌঁছে একটু থামলেন তিনি। মাস্তুলে একটা ফাঁসের দড়ি ঝোলাতে বলে গিয়েছিলেন, সেটার অগ্রগতি দেখলেন। তারপর নির্দেশ দিলেন অলিভার ট্রেসিলিয়ানকে বন্দিশালা থেকে বের করে আনবার। একটু পর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হাজির হলেন রোজামুণ্ডের কেবিনে।

জানালা গলে ঢুকে পড়া ভোরের কোমল রোদে আলোকিত হয়ে আছে কেবিন। একই সঙ্গে ঢুকছে ফুরফুরে হাওয়া। অনুকূল বাতাস পেয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটছে সিলভার হেরন, পিছনে আবছা হয়ে এসেছে স্পেনের উপকূল। কিন্তু এসবের কোনও প্রভাব পড়ছে না রোজামুণ্ডের উপর। মলিন মুখে বসে আছে বিছানায়।

কেবিনে ঢুকে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে বাউ করলেন সার জন। চেহারা থমথমে হয়ে আছে। গত পাঁচ বছরে চুল পাকতে শুরু করেছে তাঁর, চুল ঝরে গিয়ে বড় হয়েছে কপাল... কিন্তু আজ সকালে বাড়তি কিছু ভাঁজ তাকে আরও বয়স্ক করে তুলেছে। এক রাতেই যেন দশ বছর বেড়ে গেছে বয়স। মাথার হ্যাট খুলে

একটা চেয়ারে নামিয়ে রাখলেন।

উঠে দাঁড়াল রোজামুণ্ড। এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাল তাঁকে। ওকে জড়িয়ে ধরলেন সার জন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এখন নিরাপদ। ঠিকমত বিশ্রাম নিয়েছ তো?'

'বিশ্রাম?' বিস্মিত গলায় বলল রোজামুণ্ড।

'বুঝতে পারছি, এই পরিবেশে আরাম পাচ্ছ না। কিন্তু কিচ্ছু ভেবো না। পূর্ণগতিতে ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে যাচ্ছি আমরা। খুব শীঘ্রি পৌঁছে যাব বাড়িতে। তারপর...'

সার জনের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে সাবধানে ছাড়িয়ে নিল রোজামুণ্ড। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'বাইরে নাবিকদেরকে বলাবলি করতে শুনলাম, আপনি নাকি আজই সার অলিভারকে ফাঁসি দেবেন?'

ওর উদ্বেগের ভুল অর্থ করলেন সার জন। বললেন, 'অস্থির হবার কিছু নেই। বিচার-আচারে সময় নষ্ট হবে না মোটেই। মাস্তুলে ফাঁসির দড়ি চড়ানো হয়েছে। খুব শীঘ্রি বদমাশটাকে তার প্রাপ্য শাস্তি দেব।'

আঁতকে ওঠার মত আওয়াজ করল রোজামুণ্ড। একটা হাত উঠে গেল বুকের কাছে। রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কেন আপনি এমন একটা কাজ করতে চাইছেন, জানতে পারি?'

'কেন মানে!' চমকে গেলেন সার জন। রোজামুণ্ডের কণ্ঠের এই সুর একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তীক্ষ্ণচোখে জরিপ করলেন ওর চেহারা। মনে হলো পাগলামি ভর করেছে মেয়েটার চেহারায়। কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাই নরম গলায় বললেন, 'হুম, তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। সার অলিভারকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। তোমার হয়ে আমিই প্রতিশোধ নেব।'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন, সার জন,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'আমি প্রতিশোধ নিতে চাইছি না। বরং জানতে চাইছি, কোন্ অভিযোগে আপনি অলিভারকে ফাঁসি দিতে চাইছেন।'

এবার হতভম্ব হয়ে গেলেন সার জন। ব্যাপার কী? এভাবে কথা বলছে কেন মেয়েটা? হাবভাবে তো সম্পূর্ণ সুস্থ দেখাচ্ছে, তারপরেও লায়োনেলের বদলে মাথা ঘামাচ্ছে অলিভারের ফাঁসি নিয়ে!

'আশা করি অন্তত তোমাকে সার অলিভারের অপরাধের ফিরিস্তি দিতে হবে না?' নিজেকে সামলে নিয়ে বাঁকা সুরে বললেন তিনি। 'তুমি সবকিছুর চাক্ষুষ সাক্ষী!'

'তবু আমার কাছে ব্যাখ্যা করুন, কীভাবে নিজেকে বিচারক এবং শাস্তিদাতা ভাবছেন আপনি? কে আপনাকে অধিকার দিয়েছে একজন মানুষকে বিনা-বিচারে ফাঁসিতে ঝোলানোর?'

'ত্... তোমার...' রোজামুণ্ডের রুদ্রমূর্তির সামনে কথা জড়িয়ে যেতে শুরু করল সার জনের, '...তোমার কি মাথা খারাপ হলো, রোজামুণ্ড? সাগর থেকে আটক করা একটা জলদস্যুকে নিয়ে কী করব না করব... তার জবাব চাইছ? তাও আবার আমার কাছে? হায় যিশু, তুমি যদি করুণা অনুভব করো ওর জন্য... যদিও কেন করবে বুঝতে পারছি না... জেনে রেখো, ওটাই ওর জন্য সবচেয়ে বড় করুণা।'

'প্রতিশোধ আর করুণাকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন আপনি, সার জন,' গম্ভীর গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'করুণা হবে তখন, যখন ওকে আপনি ন্যায়বিচার পেতে দেবেন।'

কথায় না পেরে মেঝেতে পা ঠুকলেন সার জন। 'ওকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়েই বা কী লাভ হবে? বিচার-শালিস যা-ই

করো না কেন, একটাই পরিণতি অপেক্ষা করছে অলিভার ট্রেসিলিয়ানের জন্য। খামোকা বোঝা টানার কোনও মানে হয় না।'

'যেটাকে আপনি অর্থহীন ভাবছেন, ওর জন্য তা নয়। তা ছাড়া ন্যায়বিচার পাবার অধিকার প্রত্যেকটা মানুষের আছে।'

কেবিনের ভিতর পায়চারি শুরু করলেন সার জন। রোজামুণ্ডের কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু হঠাৎ করে মেয়েটা অলিভারের জন্য এমন উতলা হয়ে উঠল কেন, সেটাই বুঝতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত হার মানলেন। বললেন, 'বেশ, ও যদি বিচার চায়... বিচার করা হবে। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে যদি আদালতে দাঁড়াতে চায়, তাতেও আপত্তি করব না। কিন্তু এসব করে যে ভাগ্য বদলাবে না, সেটা ওর জানা থাকা উচিত।' রোজামুণ্ডের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। বাড়িয়ে দিলেন দু'হাত। 'এদিকে এসো, লক্ষ্মী মেয়ে আমার। অনেক ঝড় গেছে তোমার উপর দিয়ে, তাই আসলে উল্টোপাল্টা কথা বলে বেড়াচ্ছ...'

পিছিয়ে গেল রোজামুণ্ড। 'হ্যাঁ, ঝড় গেছে,' বলল ও, 'কিন্তু তাতে উপকারও হয়েছে। চোখের সামনে থেকে সরে গেছে পর্দা, পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি সবকিছু। উল্টোপাল্টা কিছুই বলছি না আমি, সার জন।' চেহারা করুণ হয়ে উঠল ওর, কণ্ঠে আকুতি ফুটল। 'ওহ্, দয়া করুন... দয়া করুন!'

'কী দয়া চাও তুমি, বাছা? কিছুই তো বলোনি এখন পর্যন্ত...'

'নিজের জন্য না, আমি ওর জন্য দয়া চাইছি...'

'কার জন্য?' বুঝেও বুঝতে পারছেন না সার জন।

'অলিভারের জন্য! আর কে?'

চোয়াল ঝুলে পড়ল সার জনের। 'কী শুনছি আমি? অলিভার

ট্রেসিলিয়ানের জন্য দয়া চাইছ তুমি? ওই ধর্মত্যাগী, শয়তান, জলদস্যুর জন্য? রোজামুণ্ড, তুমি পাগল হয়ে গেছ!'

'আমি ওকে ভালবাসি,' ভেজা গলায় বলল রোজামুণ্ড।

পাথর হয়ে গেলেন সার জন। 'ভালবাসো? তুমি ওকে ভালবাসো? যার কারণে খ্রিস্টানরা সাগরে নামতে পারে না? যে তোমাকে আর লায়োনেলকে অপহরণ করেছিল? যার হাতে খুন হয়েছে তোমার ভাই?'

'অলিভার পিটারকে খুন করেনি,' জোর গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'সত্যটা আমি জানতে পেরেছি!'

'নিশ্চয়ই ওর মুখ থেকেই?' অভিব্যক্তিহীন গলায় বললেন সার জন। বিদ্রূপ করতে ভুলে গেছেন। 'সেটা বিশ্বাস করেছ?'

'বিশ্বাস না করলে ওকে আমি বিয়ে করতাম না।'

'বিয়ে!' ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন সার জন। বুঝতে পারছেন না, চমক এখানেই শেষ, নাকি আরও কিছু অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে। 'তুমি ওই কুখ্যাত জলদস্যুকে বিয়ে করেছ? কবে?'

'হ্যাঁ... যে-দিন আমরা আলজিয়ার্সে পৌঁছুলাম, সে-রাতেই।' শান্ত গলায় বলল রোজামুণ্ড।

'যথেষ্ট হয়েছে, রোজামুণ্ড!' এবার চেঁচিয়ে উঠলেন সার জন। 'আর না! ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্য আর কোনও কারণ প্রয়োজন নেই আমার। অন্তত তোমার সঙ্গে ওর ওই অশুভ বন্ধন ছিন্ন করার জন্য হলেও মরতে হবে ওকে।'

'আপনি নিজ হাতে আমাকে বিধবা করতে চান?' আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল রোজামুণ্ড।

'না, আমি তোমাকে ওই শুয়োরটার কবল থেকে মুক্ত করতে চাই।'

'পায়ে পড়ি, আমার কথা শুনুন...'

'না, আর কিছুই শুনব না আমি। যথেষ্ট-র চেয়েও বেশি শুনে ফেলেছি ইতোমধ্যে।' বেরিয়ে যাবার জন্য উল্টো ঘুরলেন সার জন।

ছুটে এসে তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল রোজামুণ্ড। বলল, 'আমার কথা শুনতেই হবে আপনাকে। অনেক ভুগেছে অলিভার—দেহ-মন-আত্মা... সবদিক থেকে। ভুগেছে এমন এক অপরাধের জন্য, যা ও করেইনি। সেই ভোগান্তির মূলে রয়েছি আমি। আজ আমি জানি, ও পিটারের খুনি নয়। আমার বোকামির কারণেই সবকিছু হারিয়েছে ও, সময় থাকতে প্রমাণ করতে পারেনি নিজের নির্দোষিতা। আমি এ-ও জানি, অপহরণ করা হয়েছিল ওকে... কোনও সুযোগ দেয়া হয়নি আত্মপক্ষ সমর্থনের। এসবের কারণে ধর্মত্যাগী জলদস্যুর জীবন বেছে নেয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না বেচারার। সব আমার দোষ! তাই এর সংশোধনও আমাকেই করতে হবে। ওকে ছেড়ে দিন, সার জন। যদি আমাকে ভালবাসেন...'

'চুপ!' গর্জে উঠলেন সার জন। সহ্যের শেষসীমায় পৌঁছে গেছেন তিনি। 'আর একটি কথাও নয়। তোমাকে ভালবাসি বলেই আর কিছু শুনব না আমি, রোজামুণ্ড। মনে হচ্ছে শুধু শয়তানটার কবল থেকে নয়, তোমাকে তোমার নির্বুদ্ধিতার কবল থেকেও বাঁচাতে হবে আমাকে। নইলে তোমার মৃত বাবা আর ভাইয়ের চোখে অপরাধী হয়ে থাকব। পাগলামি করছ তুমি, মেয়ে। ক্ষণিকের আবেগে ঘোলা দেখছ সবকিছু। অসুবিধে নেই, কোনও একদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবে। সেদিন ধন্যবাদ জানাবে আমাকে।'

'ধন্যবাদ?' হিসিয়ে উঠল রোজামুণ্ড। 'আমি আপনাকে

অভিশাপ দেব। আজ যদি এ-কাজ করেন, সারাজীবন ঘৃণা করব আপনাকে—ঠিক যেভাবে একজন খুনিকে ঘৃণা করা উচিত। অন্ধ আপনি, সার জন! অন্ধ এবং বোকা!'

ওর অগ্নিমূর্তির সামনে কুঁকড়ে গেলেন সার জন। পদস্থ এবং সম্মানিত মানুষ তিনি, ভয় পান না কাউকে। কিন্তু আজ মুখের উপর কন্যাতুল্য মেয়েটির অভিশাপ শুনে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। নড়বড় করে উঠল আত্মবিশ্বাস। শুধু মান-ইজ্জতের কথা ভেবে চেহারা স্বাভাবিক রাখলেন। বললেনঃ

'চুপ করো, মেয়ে, চুপ করো! পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছ তুমি। জাদুটোনা করেছে তোমাকে অলিভার। ওকে নির্দোষ, অসহায় ভাবছ তাই; আর আমাকে ভাবছ খুনি! ঈশ্বর তোমার ঘোর কাটিয়ে দিন। বিশ্রাম নাও। আশা করি পরেরবার যখন দেখা হবে, সবকিছু সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পাবে তুমি। যেতে দাও আমাকে।'

'না, কোথাও যাবেন না আপনি!' গোঁয়ারের মত বলল রোজামুণ্ড। 'আপনাকে আমি যেতে দেব না।'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন সার জন, থেমে গেলেন দরজায় একটা ছায়া পড়ায়। রাজকীয় ইউনিফর্ম পরে লর্ড হেনরি গোড হাজির হয়েছেন ওখানে। ঘাড় ফিরিয়ে রোজামুণ্ডও দেখল তাঁকে।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' বলে উঠলেন লর্ড হেনরি, এতক্ষণ ধরে কী চলছে এখানে, সে-সম্পর্কে সচেতন নন। 'আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, লেডি!'

'ওর আরও বিশ্রাম দরকার,' গোমড়ামুখে বললেন সার। 'এখনও ধকল কাটেনি ওর।'

'সার জন ভুল বলছেন,' দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল

রোজামুণ্ড। ঢুকতে দিল লর্ড হেনরিকে। 'আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।'

'তা হলে তো খুবই ভাল কথা।' ভুরু কুঁচকে দু'জনের মুখ দেখলেন লর্ড হেনরি—উত্তেজনার লেশ মিলিয়ে যায়নি এখনও। কী ঘটেছে বুঝতে পারছেন না। 'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আপনার জবানবন্দির প্রয়োজন হবে, লেডি রোজামুণ্ড। বিচারের জন্য বন্দিকে এরই মধ্যে জাহাজের পাটাতনে হাজির করা হয়েছে কি না! আপনার কি কোনও অসুবিধে আছে?'

'মোটেই না, মাই লর্ড,' বলল রোজামুণ্ড। 'আমি জবানবন্দি দেবার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি।'

'না!' মরিয়ার মত বলে উঠলেন সার জন। 'ওর কথা শুনবেন না, হেনরি...'

না শোনার ভান করে বলে চলল রোজামুণ্ড, 'যদ্দূর বুঝেছি, আমার সঙ্গে ও যা করেছে, সেটাই সবচেয়ে বড় অভিযোগ। এ-ব্যাপারে অবশ্যই আমার বক্তব্য শোনা দরকার আপনাদের।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন,' লর্ড হেনরি মাথা ঝাঁকালেন। একই সঙ্গে ভুরু কুঁচকে তাকালেন সার জনের দিকে। 'অবশ্য... অভিযোগটা মোটামুটি প্রমাণিতই বলা চলে। আপনার যদি কষ্ট হয়, জবানবন্দির আনুষ্ঠানিকতা এড়িয়ে যেতে পারি আমরা।'

'একটু ভুল হচ্ছে আপনার, মাই লর্ড,' রোজামুণ্ড বলল। 'আমার জবানবন্দিটা অপরিহার্য, ওটা কিছুতেই এড়ানো যাবে না। আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি!'

প্রশ্নবোধক চোখে সার জনের দিকে তাকালেন লর্ড হেনরি। 'আপনি কী বলেন?'

কাঁধ ঝুলে পড়ল সার জনের। বললেন, 'আমি আর কী

বলব? যা খুশি করুক ও।' পিছিয়ে গেলেন তিনি।

কয়েক মুহূর্ত রোজামুণ্ডের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকলেন লর্ড হেনরি। যেন পড়ার চেষ্টা করলেন ওর ভিতরটা। কী বুঝলেন কে জানে, মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আপনাকে তা হলে আর বাইরে যাবার কষ্ট দেব না, ব্যাপারটা এখানেই সেরে ফেলা যাক। ঠিক আছে?' সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে দরজার কাছে চলে গেলেন। পর্দা সরিয়ে বাইরে অপেক্ষারতদের উদ্দেশে বললেন, 'ভিতরে আসুন আপনারা। আর হ্যাঁ... বন্দিকেও নিয়ে আসতে বলুন।'

কাঠের পাটাতন পায়ের শব্দে মুখর হয়ে উঠল। একটু পরেই কেবিনে ঢুকল জাহাজের বেশ ক'জন অফিসার। ভিতরের টেবিলের পাশে সাজানো হলো চেয়ার—বিচারকক্ষের মত করে। যার জন্য বিচারের প্রয়োজন নেই বলে ভেবেছিলেন সার জন, সেই অলিভারের বিচার শুরু হবে এবার।

পঁচিশ

যুক্তি-তর্ক

টেবিলের পাশে আসন গ্রহণ করল সবাই। ঠিক মাঝখানে বসেছেন লর্ড হেনরি গোড। রানির লর্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে সবচেয়ে উঁচু পদমর্যাদা তাঁর, কাজেই আজকের বিচারকার্য

তিনিই পরিচালনা করবেন। তাঁর ডান পাশে বসেছেন সার জন কিলিগ্রু, এরপর ইয়োন্ডান নামে এক অফিসার। বাঁয়ে রয়েছে আরও দু'জন।

টেবিলে ডানপ্রান্তের মাথায় একটা চেয়ার দেয়া হয়েছে রোজামুণ্ডকে, বিচারকদের কাছ থেকে সামান্য দূরত্বে। শান্ত ভঙ্গিতে ওখানে বসল মেয়েটা, কিন্তু চঞ্চল চোখে বিচারকদের জরিপ করতে দেখে বোঝা গেল—ভিতরে ভিতরে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায় মরে যাচ্ছে সে।

নতুন পদশব্দ হলো এবার। কয়েক মুহূর্ত পরে পর্দা সরিয়ে কেবিনে ঢোকানো হলো বন্দি অলিভারকে। দু'হাত এখনও পিছমোড়া করে বাঁধা। ওর দু'পাশে রয়েছে রুক্ষ চেহারার দুই প্রহরী—পুরোদস্তুর রণসাজে সজ্জিত, হাতে নাঙ্গা তলোয়ার... বেচাল দেখলেই গেঁথে দেবে বন্দির শরীরে।

কেবিনের ছায়ায় ঢুকে চোখ পিটপিট করল অলিভার, দৃষ্টি মানিয়ে নিল ওখানকার পরিবেশের সঙ্গে। রোজামুণ্ডকে দেখতে পেয়ে একটু যেন স্বস্তি ফুটল চেহারায়। তারপর আবার চোখ ফেরাল বিচারকদের সমবেত পরিষদের দিকে। প্রহরীরা ধাক্কা দিয়ে দু'পা সামনে এগোতে বাধ্য করল ওকে।

অলিভারের চেহারায় শঙ্কার ছাপমাত্র নেই, সাহেবি কেতায় মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল পরিষদকে।

'সুপ্রভাত, ভদ্রমহোদয়বৃন্দ!' হাসিমুখে বলল ও।

প্রত্যুত্তর দিল না কেউ, ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। বন্দির মুসলিম সাজ-পোশাকই বিতৃষ্ণা জাগাচ্ছে সবার মনে। এই পোশাকে অভিবাদনটা মোটেই মানানসই হয়নি।

একটু পরে গলা খাঁকারি দিলেন সার জন। বললেন, 'আশা

করি তুমি জানো, কী কারণে এখানে আজ হাজির করা হয়েছে তোমাকে?'

'উঁহুঁ,' বলল অলিভার, 'তবে আপনাদের উদ্দেশ্য আমি আন্দাজ করতে পারছি। বিচারের প্রহসন না করলেও চলত, আমার ভাগ্য তো ঠিক করেই রেখেছেন। যদি ভেবে থাকেন আমাকে ভয় পেতে দেখবেন, অথবা দেখবেন হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে... তা হলে মস্ত ভুল করছেন।' গলার স্বর শীতল হয়ে উঠল ওর। 'একটা কথাই শুধু বলব—রোজামুণ্ডকে এ-সব না দেখালেও পারতেন।'

'লেডি রোজামুণ্ড এখানে নিজ ইচ্ছায় থাকছে!' দাঁত খিঁচিয়ে বললেন সার জন।

'হয়তো,' বলল অলিভার। 'কিন্তু ও নিশ্চয়ই জানে না...'

'সবকিছুই সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছি ওকে!' রাগী গলায় বললেন সার জন।

একটু বিস্ময় নিয়ে রোজামুণ্ডের দিকে তাকাল অলিভার। তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে নিল।

'সেক্ষেত্রে,' বলল ও, 'এ-ব্যাপারে আর কিছু বলার নেই আমার। তবে বিচারকাজ শুরু করার আগে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে চাই। সার জন, আপনার সঙ্গে আমার আত্মসমপর্ণের বিষয়ে একটাই শর্ত ছিল—আমি ছাড়া আর কোনও কর্সেয়ারকে স্পর্শ করা যাবে না। আপনি ওই শর্ত মেনেও নিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে আসার পর আমি আবিষ্কার করলাম, জ্যাসপার লেই নামে আমার এক সঙ্গীকে বন্দি করা হয়েছে। এ তো শর্তের বরখেলাপ!'

'ও লায়োনেল ট্রেসিলিয়ানকে গুরুতর জখম করেছে,' শীতল গলায় জানালেন সার জন। 'মরতে বসেছে বেচারা!'

'হতে পারে। কিন্তু মাস্টার লায়োনেলের হত্যাকারীর ব্যাপারে আলাদা কোনও চুক্তি হয়নি আমাদের মধ্যে... কিংবা চুক্তি হবার পরেও লায়োনেলকে জখম করেনি ও। কাজেই ওকে আটক করতে পারেন না আপনি। তা হলে কোথায় রইল আপনার কথার দাম? কোথায় রইল আপনার মর্যাদা?'

'মর্যাদার কথা বলছ? তুমি?' রূঢ় গলায় বলে উঠলেন লর্ড হেনরি।

'জী, মাই লর্ড,' বলল অলিভার। 'তবে আমার মর্যাদা নয়, সার জনের মর্যাদা।' বলার ভঙ্গিতে বিদ্রূপের সুর চাপা রইল না।

'এখানে তোমার বিচার চলছে, অলিভার ট্রেসিলিয়ান!' খ্যাপাটে গলায় বললেন সার জন।

'তা-ই ভেবেছিলাম আমি,' অলিভার বলল। 'আর এই বিচার করবার সুযোগ আপনি পেয়েছেন নির্দিষ্ট একটা চুক্তির বিনিময়ে। দুঃখের বিষয়, এখানে আসার পর দেখছি, চুক্তির মর্যাদা রাখতে জানেন না আপনারা। যাক গে, যা বলার বলে দিয়েছি আমি। এরপরেও যদি জ্যাসপার লেইকে আটকে রাখেন, বা ওকে কোনও ধরনের শাস্তি দেন... সেটার জবাব নিজের বিবেকের কাছে দেবেন।'

অসহায় বোধ করলেন সার জন। অলিভারের যুক্তির সামনে হার মানতে বাধ্য হচ্ছেন। আসলেই... যা-ই করে থাকুক জ্যাসপার লেই, তাকে বন্দি করার কোনও অধিকার নেই তাঁর। কিন্তু লোকটাকে ছেড়ে দেয়া মানে পুত্রসম লায়োনেলের হত্যাকারীকে ছেড়ে দেয়া। উভয়সঙ্কটে পড়ে গেলেন।

'তা হলে কী করতে বলো আমাকে?' অলিভারের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়লেন তিনি।

'কী করবেন, সেটা তো আপনার মর্জি, সার জন,' অলিভার বলল। 'কিন্তু কী করতে পারবেন না, তা বলতে পারি আপনাকে। জ্যাসপার লেইকে আটকে রাখতে পারেন না আপনি, ওর মতের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে পারেন না... এমনকী একটা আঘাতও করতে পারেন না ওকে। যদি ভুলক্রমে গ্রেফতার করে থাকেন লোকটাকে, তা হলে যত দ্রুত সম্ভব ভুলটা সংশোধন করে নেয়া উচিত। ওকে নিরাপদ কোনও জায়গায় নামিয়ে দেয়াটাই যুক্তিসঙ্গত হবে। অবশ্য... পুরোটাই নির্ভর করছে আপনার উপরে। আপাতত এ-নিয়ে আর আলোচনা না করাই ভাল। আপনাদের কাজ শুরু করতে পারেন। আমি তৈরি আছি।'

নীরবতা নেমে এল কেবিনে। কিছুক্ষণ কারও মুখে কোনও কথা ফুটল না। সবাই অনুভব করছে, বিচার শুরু হবার আগেই নৈতিক দিক থেকে তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে দুর্ধর্ষ কর্সেয়ার। খানিক পর নিজেকে সামলে নিলেন লর্ড হেনরি। কথা বললেন বন্দিকে উদ্দেশ্য করে।

'অলিভার ট্রেসিলিয়ান, আজ তোমাকে এই আদালতের সামনে হাজির করা হয়েছে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবার জন্য। জলদস্যু তুমি... আর ধরা পড়া জলদস্যুকে ফাঁসি দেবার অধিকার আছে যে-কোনও ক্যাপ্টেনের। বলতে পারো, তোমার বেলায় তা করা হবে না কেন?'

মুখ বাঁকা করে হাসল অলিভার। বলল, 'এত আনুষ্ঠানিকতা না করলেও চলবে। কিছুই বলব না আমি। অযথা মুখ-খরচ করার অভ্যেস নেই আমার।'

'তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না, অলিভার,' নরম গলায় বললেন লর্ড হেনরি। প্রধান বিচারক হিসেবে নিজের দায়িত্ব

ঠিকমত পালন করছেন তিনি—বিদ্বেষ দেখাচ্ছেন না আসামীর প্রতি। 'যদি আনুষ্ঠানিক বিচার চাও, তা হলে তোমাকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাব আমরা।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার,' বেরসিকের মত বলে উঠলেন সার জন। 'যে-সব অপরাধের জন্য তোমার বিচার হবে, সেগুলোর প্রায় সবক'টাই ঘটেছে আমাদের এই লর্ড হেনরি গোডের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায়। কাজেই তোমার বিচার হবে কর্নওয়ালে, ওঁর-ই আদালতে। মহামান্য রানির লর্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে উনিই হবেন প্রধান বিচারক এবং রায়দাতা।'

'মহামান্য রানি ভাগ্যবতী... কর্নওয়ালে এমন যোগ্য একজন প্রতিনিধি আছে তাঁর!' সকৌতুকে বলে উঠল অলিভার।

ঠাট্টায় কর্ণপাত করলেন না সার জন। বলে চললেন, 'অতএব বুঝতেই পারছ, বিচার এখানে হলো, না ওখানে... তাতে কিছু যায়-আসে না। তোমাকে শুধু সিদ্ধান্ত নিতে হবে—কোথায় ফাঁসিতে ঝুলতে চাও। জলে, না স্থলে?'

'আকাশটাই বা বাদ রাখলেন কেন?' মুখের হাসি একবিন্দু মলিন হলো না অলিভারের। 'আকাশে ঝোলাতে চাইলে এক্ষুণি রাজি হয়ে যাব।'

বিরক্তিসূচক একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল লর্ড হেনরির মুখ দিয়ে। সামনে ঝুঁকে তিনি বললেন, 'ঠাট্টা-মশকরা বন্ধ করো, অলিভার। নিজের মঙ্গলের জন্যই একটু সিরিয়াস হতে অনুরোধ করছি তোমাকে।'

'দুঃখিত, ঝোঁকটা সামলাতে পারিনি,' অলিভার বলল। 'তবে হ্যাঁ, দস্যুতার অভিযোগেই যদি বিচার করতে চান আমার, খুব অভিজ্ঞ একজন সহযোগী পেয়েছেন আপনি। এ-সব ব্যাপারে

সার জনের তুলনা হয় না।'

'প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ,' কপট সুরে বললেন সার জন। 'তবে জলদস্যুতার অভিযোগ নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে তোমার। এরচেয়ে অনেক গুরুতর অভিযোগ আছে তোমার বিরুদ্ধে।'

'তা-ই?' একটা ভুরু উঁচু করল অলিভার। 'আশা করছি বাকি অভিযোগগুলো জলদস্যুতার মত নড়বড়ে নয়। নইলে... মানে যদি আইন-কানুন মেনে এগোতে চান আর কী... আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে আপনাদের। যাক গে, শোনান অভিযোগ। স্বীকার করছি, যতটা আশা করেছিলাম, তারচেয়ে মজাদার হয়ে উঠছে পুরো ব্যাপারটা।'

'তুমি কি জলদস্যুতার অভিযোগ অস্বীকার করছ?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন লর্ড হেনরি।

'অস্বীকার? উঁহুঁ। তবে আপনাদের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলছি। কারণ আজ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের জলসীমায় কোনও জলদস্যুতা করিনি আমি। ইংল্যাণ্ডের কোনও আদালতে এ-অভিযোগে বিচার হতে পারে না আমার।'

থমকে গেলেন লর্ড হেনরি। যুক্তিটা অপ্রত্যাশিত... একই সঙ্গে অকাট্য। আইনকে শ্রদ্ধা জানাতে গেলে সত্যিই জলদস্যুতার অভিযোগে অলিভারের বিচার করতে পারেন না তিনি।

সার জন অবশ্য হার মানতে রাজি নন। রাগী গলায় বললেন, 'দস্যুতা করোনি মানে? কর্নওয়ালে হামলা চালাওনি তুমি? আরওয়েনাকে এসে জোর করে তুলে নিয়ে যাওনি...'

'থামুন, থামুন, এত উত্তেজিত হবেন না,' তাঁকে বাধা দিল অলিভার। 'দয়া করে যে-কোনও আইনি কেতাব উল্টে দেখুন।

জলদস্যুতা আর অপহরণ এক জিনিস নয়।'

'তা হলে অপহরণ-ই সই!' গোঁয়ারের মত বললেন সার জন।

'এভাবে বললে হবে না। যেটা যা, সেটাকে তা-ই বলতে বাধ্য আপনি।'

'কথা ঘোরাচ্ছ তুমি!' ধড়াম করে টেবিলে কিল বসালেন সার জন। পরমুহূর্তে সংবিৎ ফিরে পেলেন, সংবরণ করলেন নিজেকে। গলা যতদূর পারেন স্বাভাবিক করে বললেন, 'অসুবিধে নেই, এখুনি সমাধান হবে সবকিছুর। তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে, অলিভার, ইংল্যাণ্ডের আইনে অপহরণ একটা গুরুতর অপরাধ? এর জন্য মৃত্যুদণ্ড দেবার বিধান আছে।' সঙ্গী বিচারকদের দিকে ফিরলেন তিনি। 'ভদ্রমহোদয়গণ, যদি একমত হন আমার সঙ্গে, তা হলে আর *জলদস্যুতা* শব্দটা উচ্চারণ করব না আমরা। তার কোনও প্রয়োজন নেই।'

'হ্যাঁ,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা ঝাঁকালেন লর্ড হেনরি। 'জলদস্যুতার অভিযোগে বিচার করা যাবে না ওর। বন্দির যুক্তি অকাট্য। আমাদের জানামতে ইংল্যাণ্ডের জলসীমায়, কিংবা ইংল্যাণ্ডের কোনও জাহাজে লুটপাট করেনি সে।'

নড়ে-চড়ে বসল রোজামুণ্ড। এই প্রথমবারের মত আশাবাদী হয়ে উঠছে ও। গালে ফিরে আসছে রক্তের আভা। চোখ জ্বলজ্বল করছে উত্তেজনায়। ভাল একটা লড়াই উপহার দিচ্ছে অলিভার... এবং জিতছে। জলদস্যুতার অভিযোগ প্রত্যাহার হওয়ায় বড় একটা বিপদ কাটল। এবার পরেরগুলোর পালা।

ওর এই পরিবর্তন লক্ষ করল অলিভার, কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না। এখনও খুশি হবার মত কিছু দেখতে পাচ্ছে না। মোটামুটি নিশ্চিত ও, যুক্তিতে হার মানলেও পিছু

হটবে না প্রতিপক্ষ। ওকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েই ছাড়বে।

'তবে তা-ই হোক,' সার জনের গর্জনে ধ্যান ভাঙল ওর। 'অপহরণ আর হত্যার অভিযোগেই ওকে ফাঁসিতে ঝোলাব আমরা। অলিভার ট্রেসিলিয়ান, এ-দুটো অভিযোগের বিষয়ে কিছু বলার আছে তোমার?'

'আমার কোনও কথাতেই প্রভাবিত হবেন না আপনারা,' অলিভার কাঁধ ঝাঁকাল। 'কাজেই মুখ বন্ধ রাখা শ্রেয় মনে করছি।' বিতৃষ্ণা ফুটল চেহারায়। 'ধ্যাৎ, বন্ধ করুন এই তামাশা। ফাঁসি দিতে চান তো আমাকে? দিয়ে দিন। দরকার হলে জলদস্যুদের মত হাত-পা বেঁধে ফেলে দিন পানিতে। অন্তত ইংল্যাণ্ডের আইন-আদালতের এমন অমর্যাদা করবেন না!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সার জন। রাগে মুখ লাল হয়ে গেছে। 'কী বললে, অসভ্য বদমাশ কোথাকার...'

খপ্ করে তাঁর জামার হাতা টেনে ধরলেন লর্ড হেনরি, জোর করে বসতে বাধ্য করলেন। বসলেও ফুঁসতে থাকলেন সার জন, কিছুতেই শান্ত করতে পারছেন না নিজেকে।

বন্দির দিকে ফিরলেন লর্ড লেফটেন্যান্ট। বললেন, 'অলিভার ট্রেসিলিয়ান, এভাবে কথা বলা উচিত হচ্ছে না তোমার। কেন তামাশা ভাবছ এটাকে? তোমার বিচার করার অধিকার কি আমাদের নেই? খুনের অভিযোগ নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে তুমি, তারপর ধর্মত্যাগ করে বেছে নিয়েছ জলদস্যুর পেশা... পরে আবার আরওয়েনাকে হামলা চালিয়ে অপহরণ করেছ সম্ভ্রান্ত এক ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোককে। যত যুক্তিই খাড়া করো, যে-কোনও আদালতে দোষী সাব্যস্ত হবে। আমাদের এখানেও তা-ই হচ্ছে। অথচ এমন ভাব করছ, যেন

শত্রুতা করছি আমরা তোমার সঙ্গে... নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও চেষ্টা করছি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার! এটা কি ঠিক?'

'সার,' বলল অলিভার, 'আমাকে ফাঁসি দেবার অধিকার আছে আপনাদের, সেটা অস্বীকার করছি না... করবও না। যদি আমার ব্যবহারে অসম্মান প্রকাশ পেয়ে থাকে, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। আর কিছু বলার নেই আমার।'

'কিন্তু আমার আছে!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল রোজামুণ্ড। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। এতক্ষণে মুখ খুলেছে ও।

'রোজামুণ্ড!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন সার জন, নিজেও দাঁড়িয়ে গেলেন ওর দেখাদেখি। 'আমি অনুরোধ করছি...'

ঝট্ করে হাত তুলল মেয়েটা, আর তা দেখে মুখে যেন তালা এঁটে গেল ভদ্রলোকের।

'অপহরণের অভিযোগ... যেটা সার অলিভারের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে,' বলল ও, 'ওটার ব্যাপারে কিছু বলার আছে আমার। যেহেতু আমাকেই অপহরণ করেছিল ও, সেহেতু এই অভিযোগ নিয়ে এগোবার আগে আমার বক্তব্য শোনা দরকার আপনাদের। এখানে যদি না শোনেন, ভবিষ্যতে আমি কথাগুলো দেশের আদালতে বলব।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সার জন। ধপ্ করে বসে পড়লেন চেয়ারে। মেয়েটার পাগলামি আর ঠেকানো গেল না।

লর্ড হেনরি ফিরলেন রোজামুণ্ডের দিকে। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়েছে। বললেন, 'লেডি, অভিযোগ অস্বীকার করেনি এই বন্দি। ইংল্যাণ্ডের আদালতে বিচারের জন্যেও আবেদন জানায়নি। তাই আপনার জবানবন্দির কোনও প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চিত থাকুন, দেশের আদালতেও

ডাক পড়বে না আপনার।'

'এখানেই আপনি ভুল করছেন, মাই লর্ড,' বলল রোজামুণ্ড। 'কেউ ডাকবে না... আমি নিজেই যাব আদালতে—আপনাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ দায়ের করবার জন্য... যদি না আজ সার অলিভারকে ফাঁসি দেয়া থেকে আপনারা বিরত হন।'

হতবাক হয়ে গেল সবাই। মুখের ভাষা হারাল।

'কী বলছ তুমি, রোজামুণ্ড!' অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠল অলিভার। পারলে চিমটি কাটত গায়ে, নইলে বিশ্বাস হচ্ছে না—রোজামুণ্ড ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলছে।

বন্দি কর্সেয়ারের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল রোজামুণ্ড, তারপর আবার ফিরল পরিষদের দিকে। বলল:

'সার অলিভার যেহেতু অভিযোগ অস্বীকার করছে না, ওর হয়ে আমিই অস্বীকার করে দিচ্ছি। ও আমাকে অপহরণ করেনি, ভদ্রমহোদয়গণ। ওটা ছিল একটা নাটক। অলিভার ট্রেসিলিয়ানকে ভালবাসি আমি। সাবালিকা আমি, স্বেচ্ছায় ওর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিলাম বাড়ি থেকে... আলজিয়ার্সে গিয়ে স্বেচ্ছায় বিয়েও করেছি ওকে।'

দেয়াল ফেটে একটা পরী বেরিয়ে এলেও বুঝি এতটা অবাক হতো না কেউ।

হতভম্ব গলায় লর্ড হেনরি বললেন, 'আ... আপনি ওর স্ত্রী?'

'মিথ্যে কথা!' চেঁচিয়ে উঠলেন সার জন। 'ওকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যে কথা বলছে রোজামুণ্ড।'

তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হানল মেয়েটা তাঁর দিকে। থমথমে গলায় বলল, 'আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি চিরকালই কাঁচা, সার জন। একবারও ভাবছেন না, যদি সত্যিই আমাকে অপহরণ করে থাকে অলিভার... যদি সত্যিই আমার উপর অত্যাচার চালিয়ে থাকে,

তা হলে কেন ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করব আমি? কেন মিথ্যে কথা বলব?' বাকিদের দিকে আবার তাকাল ও। 'যা বলার বলে দিয়েছি আমি, ভদ্রমহোদয়গণ। যদি ভুল করে না থাকি, সার জন বা অন্য যে-কারও কথার চাইতে আমার কথা বেশি গুরুত্ব পাবে আইনের আদালতে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' স্বীকার করলেন লর্ড হেনরি। গজরাতে থাকা সার জনকে বললেন, 'একটু শান্ত হোন, কিলিগ্রু।' তারপর চোখ ফেরালেন অলিভারের দিকে। 'তুমি কিছু বলতে চাও?'

'আমি আর কী বলব?' কাঁধ ঝাঁকাল অলিভার। 'বলার আছেটাই বা কী?'

'সব মিথ্যে!' আবার চেঁচালেন সার জন। 'আমরা নিজেরা তার সাক্ষী। সে-রাতে আরওয়েনাকে হাজির ছিলাম আমরা, লর্ড হেনরি! আপনি-আমি দু'জনেই! নিজ চোখে দেখেছি...'

'আপনারা শুধু আমাদের অভিনয় দেখেছেন,' শান্ত গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'পিছনের ঘটনা জানা ছিল না আপনাদের।'

দাঁত-মুখ খিঁচালেন সার জন। 'অভিনয়? তা হলে কি বলতে চাও, তোমার হবু-স্বামী লায়োনেলও স্বেচ্ছায় গিয়েছিল তোমাদের সঙ্গে?'

'না,' রোজামুণ্ড মাথা নাড়ল। 'লায়োনেলকে নেয়া হয়েছিল ওর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করাবার জন্য... ওর ভাইয়ের প্রতি করা অপরাধ! এমন এক অপরাধ, যার জন্য ওর বদলে অলিভারকে দায়ী করছেন আপনারা।'

'কীসের কথা বলছেন আপনি, লেডি?' জিজ্ঞেস করলেন লর্ড হেনরি।

'আমার ভাই পিটারের হত্যাকাণ্ডের কথা বলছি। অলিভার

না, ওকে আসলে খুন করেছিল লায়োনেল ট্রেসিলিয়ান। সত্যটা যাতে প্রকাশ না পায়, সেজন্যে ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে অপহরণ করিয়েছিল ভাইকে... চেষ্টা করেছিল ওকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে।'

'এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে!' হুমকির সুরে বললেন সার জন। 'কল্প-কাহিনি শোনাচ্ছে এই মেয়ে। সাদাকে কালো, আর কালোকে সাদা বানাচ্ছে। শয়তান জলদস্যুটা বশ করেছে ওকে...'

'দাঁড়ান,' বাধা দিয়ে বললেন লর্ড হেনরি, 'আমাকে সামলাতে দিন ব্যাপারটা। লেডি, বড়ই গুরুতর অভিযোগ আনছেন আপনি লায়োনেল ট্রেসিলিয়ানের বিরুদ্ধে। এর স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ আছে আপনার হাতে?'

রোজামুণ্ড জবাব দেবার আগেই হেসে উঠলেন সার জন। 'কীসের প্রমাণ? ওই বদমাশটার শিখিয়ে দেয়া বুলি আউড়াচ্ছে ও। নিশ্চয়ই জাদু করেছে ওকে!'

অলিভারও হেসে উঠল। 'জাদু করেছি? আপনার থলেতে দেখি অভিযোগের অন্ত নেই, সার জন। প্রথমে জলদস্যুতা, তারপর অপহরণ আর খুনের দায় চাপাতে চাইলেন আমার ঘাড়ে। এবার অভিযোগ আনছেন জাদুবিদ্যার? নাহ্, দেখাচ্ছেন বটে!'

'থামবেন আপনারা?' অধৈর্য গলায় বললেন লর্ড হেনরি। তারপর মনোযোগ ফেরালেন রোজামুণ্ডের দিকে। 'লেডি, আপনি কি আসলেই বলতে চাইছেন—পিটার গডলফিনকে লায়োনেল ট্রেসিলিয়ান খুন করেছে?'

'শুধু বলছি না,' রোজামুণ্ড কণ্ঠে দৃঢ়তা ফোটাল, 'দরকার হলে কসম কাটব। লায়োনেল শুধু আমার ভাইকে খুনই করেনি,

খুনের দায় চাপিয়ে দিয়েছে অলিভারের উপরেও। সবাই ভেবেছিল শাস্তির ভয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে পালিয়ে গেছে ও... আমিও তা-ই ভেবেছি। অথচ আসল ঘটনা হলো...'

'আসল ঘটনা?' গরগর করে উঠলেন সার জন। 'কীসের আসল ঘটনা? সব চালবাজি! রূপকথা শোনানো হচ্ছে আমাদেরকে!'

'ধৈর্য ধরুন, কিলিগ্রু,' বললেন লর্ড হেনরি। 'সত্য শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পাবেই। মিথ্যের আয়ু হয় ক্ষণস্থায়ী।'

'কিন্তু তার আগ পর্যন্ত সময় নষ্ট করছি আমরা!' গম্ভীর হয়ে গেলেন সার জন।

'কথা শেষ করুন, লেডি,' লর্ড হেনরি বললেন। 'আপনি বলতে চাইছেন, ফেরারি হয়নি অলিভার ট্রেসিলিয়ান? ওর ভাই ওকে অপহরণ করিয়েছিল?'

'হ্যাঁ,' রোজামুণ্ড খেই ধরল। 'তবে কাজটা শুধু খুনের অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্য নয়, ট্রেসিলিয়ানদের সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক হবার জন্যও করেছে লায়োনেল। অলিভারকে বিক্রি করে দেবার কথা ছিল বারবারি উপকূলে, কিন্তু তার আগেই ওকে বহনকারী জাহাজে হামলা চালায় স্প্যানিয়ার্ড-রা, ও ধরা পড়ে। ছ'মাস স্পেনের বিভিন্ন জাহাজে মাল্লা হিসেবে কাজ করেছে ও। শেষ পর্যন্ত কর্সেয়াররা ওর জাহাজে হামলা চালালে মুক্তি পায়। বেঁচে থাকার জন্য একটাই বিকল্প ছিল ওর সামনে—কর্সেয়ারদের সঙ্গে যোগ দেয়া... ধর্মত্যাগ করে জলদস্যু হয়ে যাওয়া! ওটাই করেছে অলিভার, আর তারপর...'

'পরের ঘটনা আমরা জানি, লেডি,' বললেন লর্ড হেনরি। 'আপনার কাহিনি যদি সত্যি হয়, তা হলে কথা দিতে পারি,

পরের ওসব ঘটনা খুব হালকা চোখে দেখা হবে যে-কোনও আদালতে।'

'সত্যি বলছি আমি, বিশ্বাস করুন!'

'করলাম বিশ্বাস। কিন্তু আপনি কোনও প্রমাণ দেখাতে পারবেন এ-কাহিনির স্বপক্ষে?'

'আর কী প্রমাণ চাই আপনাদের। ওকে আমি আবার ভালবেসেছি... বিয়ে করেছি—প্রমাণ হিসেবে এটুকুই কি যথেষ্ট নয়?'

'বাহ্, বাহ্! ভাল বলেছ!' ফোড়ন কাটলেন সার জন।

'ওটা, লেডি,' শান্ত গলায় বললেন লর্ড হেনরি, 'প্রমাণ করে যে, আপনি একটা অদ্ভুত গল্প বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু গল্পটা যে সত্যি, তা কিন্তু প্রমাণ হয়নি। ধরে নিচ্ছি, এই গল্প আপনি অলিভার ট্রেসিলিয়ানের মুখেই শুনেছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু লায়োনেল উপস্থিত ছিল ওখানে... সে নিজে স্বীকার করেছে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা।'

'লায়োনেল সম্পর্কে এ-কথা বলতে পারলে তুমি? হা যিশু! পারলে?' প্রায় হাহাকার করে উঠলেন সার জন।

'পারব না কেন?' দৃঢ় গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'মিথ্যে তো আর বলছি না।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন সার হেনরি, চিন্তিত ভঙ্গিতে হাত বোলালেন মুখভর্তি দাড়িতে। বুঝে উঠতে পারছেন না কী ঘটছে। 'লেডি রোজামুণ্ড,' বললেন তিনি, 'যা বলছেন, তা ভেবে-চিন্তে বলছেন তো? এমন একজনকে আপনি অভিযুক্ত করছেন, যার পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন করা সম্ভব নয়। যদি আপনার কাহিনি সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়, কলঙ্কে ঢেকে যাবে মাস্টার লায়োনেল ট্রেসিলিয়ানের স্মৃতি। তাই আরেকবার

জিজ্ঞেস করছি—লায়োনেল কি আপনার সামনে নিজের দোষ স্বীকার করেছিল?'

'তা হলে আবারও শপথ করে বলছি আমি—হ্যাঁ, করেছে। অলিভার যখন আমার সামনে অভিযুক্ত করেছে ওকে পিটারের খুন আর ভাইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে... স্বীকারোক্তি দিয়েছে ও। নিজ কানে শুনেছি! আর কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, মাই লর্ড?'

টেবিলের উপর দু'হাত ছড়িয়ে দিলেন লর্ড হেনরি। 'এরপরে ব্যাপারটা নিয়ে আর এগোবার মানে হয় না, কিলিগ্রু। ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে হবে সার অলিভারকে, ওখানেই বিচার হবে ওর।'

হতাশাব্যঞ্জক একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল সার জনের মুখ দিয়ে। আর এই সময় মুখ খুলল ইয়োল্ডান নামের অফিসারটি। কথা শুনে বোঝা গেল, বাকিদের মত আবেগের বশবর্তী হয়ে পরিচালিত হচ্ছে না সে।

'মাই লর্ড, আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি সাক্ষীকে দু-একটা প্রশ্ন করতে চাই।' লর্ড হেনরি সম্মতি দিলে ফিরল সে রোজামুণ্ডের দিকে। 'লেডি, কোন্ পরিস্থিতিতে সার অলিভার তাঁর ভাইয়ের মুখ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করেছিলেন, বলবেন আমাদের?'

'আলজিয়ার্সে, ওর বাড়িতে। যে-রাতে আমরা ওখানে...' বলতে বলতে থেমে গেল রোজামুণ্ড। আচমকা টের পেয়েছে, ওকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। ব্যাপারটা বাকিরাও টের পেল।

সাগ্রহে সামনে ঝুঁকলেন সার জন। সুকৌশলে ওর জবানবন্দিতে একটা ফাঁক সৃষ্টি করেছে ইয়োল্ডান, সেটার

সদ্ব্যবহার করবেন বলে ঠিক করেছেন। 'থেমো না, বলে যাও,' কপট অনুরোধের সুরে বললেন তিনি। 'যে-রাতে তোমরা ওখানে...'

'...যে-রাতে আমরা ওখানে পৌঁছুলাম,' দুর্বল গলায় বলল রোজামুণ্ড। মুখ থেকে আবার রক্ত সরে যেতে শুরু করেছে।

'তার মানে তখনই প্রথমবারের মত অলিভার ট্রেসিলিয়ানের নির্দোষিতা সম্পর্কে জানতে পেরেছ তুমি, ঠিক?'

'হ্যাঁ,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধ্য হলো রোজামুণ্ড।

'তারমানে দাঁড়াচ্ছে,' বিজয়ের সুর ফুটল সার জনের কণ্ঠে, 'সে-রাতের আগ পর্যন্ত অলিভারকে পিটারের খুনি হিসেবে জানতে তুমি... এমনকী যখন ওর সঙ্গে আরওয়েনাক থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে, তখনও! ভুল বলেছি?'

মাথা নিচু করে ফেলল রোজামুণ্ড। বুঝতে পারছে, ওর মিথ্যে জবানবন্দি ধরা পড়ে গেছে।

'জবাব দাও!' ধমকে উঠলেন সার জন।

'তার কোনও প্রয়োজন নেই,' বললেন লর্ড হেনরি, গলায় বিষাদ। 'সব দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। লেডি রোজামুণ্ড আমাদেরকে বলেছেন, স্বেচ্ছায় অলিভার ট্রেসিলিয়ানের সঙ্গে আলজিয়ার্সে গিয়েছিলেন তিনি, ওখানে বিয়ে করেছেন তাকে—এটাই লোকটার নির্দোষিতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাতে চাইছিলেন। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে, ইংল্যাণ্ড ছাড়ার সময় ওকে ভাইয়ের খুনি হিসেবে জানতেন তিনি। লেডি, এখনও নিশ্চয়ই বলবেন না, একজন খুনির সঙ্গে স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়েছিলেন আপনি?'

'বন্ধ করা হোক এই তামাশা,' উঠে দাঁড়ালেন সার জন। 'অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।'

'না, দাঁড়ান,' আকুতি ফুটল রোজামুণ্ডের গলায়। 'স্বীকার করছি, অপহরণের বিষয়ে মিথ্যে বলেছি আমি। কিন্তু বাকি সব কথা সত্যি। সেজন্যেই অলিভারকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।'

'হাহ্, স্বীকার করছে ও!' বিদ্রূপ করলেন সার জন।

না শোনার ভান করে বলে চলল রোজামুণ্ড, 'আমার জন্য হাজারো দুর্দশা ভোগ করেছে অলিভার, তাই স্বেচ্ছায় স্বামী হিসেবে মেনে নিয়েছি ওকে। ভেবেছি হয়তো নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব ওভাবে। আমার কথা বিশ্বাস করুন, মাই লর্ড। আর যদি বিশ্বাস না-ও করেন, অন্তত ওর গতকালকের কাজটা তো গোনায় ধরবেন! ভুলে যাননি নিশ্চয়ই, ও যদি খবর না পাঠাত, তা হলে আপনারা কিছুতেই জানতে পারতেন না, গোপন ওই খাঁড়ির ভিতরে কর্সেয়ারদের জাহাজে বন্দি হয়ে আছি আমি।'

শূন্য দৃষ্টি ফুটল বিচারকদের চেহারায়। যেন বুঝতে পারছেন না ওর কথা।

'কী বলতে চাইছেন, লেডি?' বললেন লর্ড হেনরি। 'ওটার সঙ্গে অলিভারের সম্পর্ক কোথায়?'

'সত্যিই জানেন না? নাকি জেনেও না জানার ভান করছেন?' রুক্ষ গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'লায়োনেলকে অলিভারই পাঠিয়েছিল খবর নিয়ে, এ-কথা মনে করিয়ে দিতে হবে।'

দাঁতে দাঁত পিষলেন লর্ড হেনরি। এবার তিনিও রেগে গেছেন। 'চুপ করুন, লেডি! দয়া করে আর মিথ্যে কাহিনি শোনাবেন না। এতক্ষণ বিশ্বাস করিনি, কিন্তু এখন সত্যিই মনে হচ্ছে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। হয়েছে কী আপনার? লায়োনেল নিজমুখে ওর পালানোর ঘটনা শুনিয়েছে

আমাদেরকে। এ-ও বলেছে, অলিভার ট্রেসিলিয়ান ওকে পানিতে ফেলে দিয়ে খুন করবার চেষ্টা করেছিল!'

'বাহ্,' বলে উঠল অলিভার। 'লায়োনেল দেখছি মিথ্যেবাদী হিসেবে নিজের *সুনাম* অক্ষুণ্ন রেখেছে!'

ওর মত ঠাট্টা করতে পারছে না রোজামুণ্ড। চেঁচিয়ে উঠল রাগে, 'মিথ্যে কথা বলেছে ওই শয়তান, ছোটলোকটা!'

'বুঝে-শুনে কথা বলো, রোজামুণ্ড,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সার জন। 'তুমি একজন মৃত্যুপথযাত্রীর ব্যাপারে কথা বলছ... অযথা ওর অমর্যাদা কোরো না।'

'ওই ধারণা নিয়েই থাকুন,' অলিভার বলল। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, ভদ্রমহোদয়গণ, লায়োনেলের বদলে রোজামুণ্ডকে মিথ্যেবাদী ভেবে নিজেদের অদূরদৃষ্টির পরিচয় দিচ্ছেন আপনারা।'

'চুপ করো!' থমথমে গলায় বললেন লর্ড হেনরি। 'আর কিছু শুনতে চাই না আমরা!'

'না চাইলেও শুনতে হবে!' গোঁয়ারের মত বলল অলিভার। 'মুখ খোলার কোনও ইচ্ছে ছিল না আমার... কিন্তু রোজামুণ্ডকে আপনারা মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন করবেন, তা-ও মেনে নিতে পারছি না। সত্য জানার জন্য আদালত বসিয়েছেন তো? বেশ, সত্যটাই জানাব আমি। প্রমাণ দেখাব সবকিছুর।'

চোখ জ্বলজ্বল করছে ওর উত্তেজনায়। দ্রুতবেগে ওঠানামা করছে বুক। জীবনের সব আশা ছেড়ে দিয়েছিল, লড়াই করবার কোনও ইচ্ছে অবশিষ্ট ছিল না ভিতরে। কিন্তু সবার সামনে রোজামুণ্ডের প্রেমের স্বীকৃতি নতুন এক আগুন জ্বেলেছে অন্তরে। লাভ হোক না হোক, সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করবার একটা তাড়না অনুভব করছে। এতে অন্তত রোজামুণ্ডের সত্যবাদিতা

প্রতিষ্ঠিত হবে। কেউ ওকে দোষারোপ করতে পারবে না ঘৃণ্য এক জলদস্যুর পক্ষ অবলম্বন করা নিয়ে।

পরিষদের সবার উপর দিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল অলিভার। তারপর বলল, 'আমার জানা ছিল না, গতরাতে সার জনকে নিয়তি পরিচালিত করেছে। আমার সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করে যে-লোকটাকে তিনি ধরে এনেছেন, সেটা আসলে ভাগ্যেরই খেলা। ওর নাম শুনেছেন আপনারা—জ্যাসপার লেই, প্রাক্তন এক ইংরেজ ক্যাপ্টেন... ওর জাহাজের নাম ছিল *সোয়ালো।* কিছুদিন আগে কর্সেয়ারদের হাতে ধরা পড়ে সে, এবং আমারই মত প্রাণ বাঁচানোর জন্য দলত্যাগ করে মিশে যায় ওদের সঙ্গে। ওই জ্যাসপার লেই-ই লায়োনেলের ভাড়া করা লোক ছিল, ভদ্রমহোদয়গণ! ও-ই আমাকে অপহরণ করেছিল লায়োনেলের নির্দেশে, চেষ্টা করেছিল আমাকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে। কপাল খারাপ থাকায় স্প্যানিয়ার্ডদের হামলায় ডুবে যায় ওর জাহাজ, বন্দি হয় আমার সঙ্গে। বিশ্বাস না হলে ডাকুন ওকে। জিজ্ঞাসাবাদ করুন।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন বিচারকেরা। শেষ পর্যন্ত লর্ড হেনরি বললেন, 'ব্যাপারটা বড্ড কাকতালীয় হয়ে যাচ্ছে না? যে-লোক তোমার পক্ষে সাক্ষী দিতে পারে, ঠিক তাকেই ধরে আনলেন সার জন?'

'কাকতালীয় নয়, মাই লর্ড। এর পিছনে চমৎকার ব্যাখ্যাও আছে। লায়োনেলের প্রতি ক্ষোভ আছে জ্যাসপারের। ওর ধারণা, লায়োনেলের ষড়যন্ত্রে অংশ নেবার কারণেই জাহাজ হারিয়েছে ও, ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। ওকে খুন করে তাই নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিল। গত রাতে সেজন্যেই লায়োনেলকে দেখমাত্র আক্রমণ করেছিল জ্যাসপার। সার জন,

আপনি খেয়াল করেননি, আর কারও প্রতি মনোযোগ ছিল না লোকটার? সরাসরি লায়োনেলকেই আক্রমণ করেছে?'

জবাব দিলেন না সার জন।

'তারপরেও,' বললেন লর্ড হেনরি, 'ঘটনাটা অস্বাভাবিক।'

'সত্য প্রকাশের জন্য মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক, অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেন সর্বশক্তিমান,' হালকা গলায় বলল অলিভার। 'দেরি করবেন না। ডাকুন জ্যাসপারকে। যা খুশি জিজ্ঞেস করুন ওকে, যেভাবে খুশি জেরা চালান। সত্যটা বের করে নিন ওর পেট থেকে।'

'এ-সব সময় নষ্ট করার কৌশল ছাড়া আর কিছু না,' বিরক্ত গলায় বললেন সার জন। 'এক দিনের জন্য যথেষ্ট রূপকথা কি শুনিনি আমরা? মাই লর্ড, আমি অনুরোধ করছি...'

কথা শেষ হলো না তাঁর, বাইরে থেকে ভেসে এল উত্তেজিত পদশব্দ। পরমুহূর্তে ঝট্ করে খুলে গেল কেবিনের দরজা। দেখা গেল মাস্টার টোবিয়াসের চেহারা।

'সার জন!' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন তিনি। 'মাস্টার ট্রেসিলিয়ানের জ্ঞান ফিরেছে! আপনার সঙ্গে আর ওর ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। জলদি আসুন। বেশিক্ষণ টিকবে না ও।'

ছাব্বিশ

রায়

বিচারকার্য স্থগিত হয়ে গেল, সার জনের পিছু পিছু সবাই ছুটল লায়োনেলের কেবিনের দিকে। প্রহরীরা অলিভারকেও নিয়ে চলল ওখানে। খুব শীঘ্রি মুমূর্ষু মানুষটার বিছানা ঘিরে দাঁড়াল ওরা। ফ্যাকাসে চেহারা আর প্রাণহীন চোখের দিকে এক পলক চেয়েই বুঝল, অনন্ত যাত্রায় পাড়ি জমাতে বসেছে ছেলেটা।

হাঁটু গেড়ে বিছানার পাশে বসলেন সার জন। লায়োনেলের একটা হাত তুলে নিলেন নিজের দু'হাতের মুঠোয়। কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকলেন, 'লায়োনেল! আমরা এসেছি!'

খুব আস্তে আস্তে মাথা ঘোরাল লায়োনেল। চোখ বোলাল জমায়েত মানুষদের উপর। দুর্বল গলায় বলল, 'অলিভার... অলিভার কোথায়?'

'অস্থির হয়ো না,' নরম গলায় বললেন সার জন। 'ওকে বন্দি করেছি আমরা। খুব শীঘ্রি শাস্তিও দেব...'

'না-আ!' ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল লায়োনেল। 'ওর কিছু হয়নি তো? কোথায় ও?'

'আমি এখানে,' জলদগম্ভীর গলায় বলল অলিভার। পাথরের মত মুখ করে রেখেছে ও, চেহারা ভাবলেশহীন। ভাই মরতে

বসেছে, কিন্তু কোনও সহানুভূতি নেই।

অনেক কষ্টে মাথা একটু উঁচু করে ওকে দেখল লায়োনেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার মত পাপীকে দয়া দেখিয়েছেন ঈশ্বর। ভুল সংশোধনের একটা সুযোগ দিয়েছেন... হোক সেটা এই পরিস্থিতিতে।' দু'হাত একত্র করল ও। 'আ... আমাকে ক্ষমা করে দাও, ভাই!'

সামনে এগোল অলিভার, বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কেউ বাধা দিল না ওকে। রসকষহীন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কীসের জন্য ক্ষমা চাইছ তুমি আমার কাছে?'

জবাব দেয়ার চেষ্টা করল লায়োনেল, পারল না। কাশতে শুরু করল, শ্বাস নিতে পারছে না ঠিকমত। কাশির সঙ্গে বেরিয়ে এল কয়েক ফোঁটা রক্ত। তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেললেন সার জন।

'ওহ্!' আঁতকে ওঠার মত আওয়াজ বেরিয়ে এল রোজামুণ্ডের গলা দিয়ে। বিছানার অন্যপাশে দাঁড়িয়ে আছে ও। 'কথা বলো, লায়োনেল! ঈশ্বরের দোহাই, কথা বলো!'

কাশি থামিয়ে মলিন হাসি হাসল লায়োনেল। ভাঙা গলায় বলল, 'ভয় পেয়ো না, সব বলে যাব আমি... ঈশ্বর আমাকে সেজন্যেই এখন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমার শরীর থেকে হাত সরিয়ে নিন, সার জন। আমি এক নিকৃষ্ট পাপী, আপনার স্পর্শ পাবার উপযুক্ত নই। পিটার গডলফিনকে আ... আমিই খুন করেছি।'

'কী!' চমকে উঠলেন সার জন। একই সঙ্গে বাকিরাও।

'হ্যাঁ। কিন্তু ওটা আমার পাপ নয়। আত্মরক্ষার জন্য ওর প্রাণ নিতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি—লড়াইটাও ছিল ন্যায্য। পাপ করেছি পরে। যখন সবাই অলিভারকে সন্দেহ করল, তার

সুযোগ নিয়েছি আমি। সত্যি ঘটনা জানত আমার ভাই, তারপরেও রক্ষা করার চেষ্টা করেছে আমাকে... আর সেটার প্রতিদান দিয়েছি আমি বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে। নিজের জন্য ভয় পাচ্ছিলাম আমি... ওর প্রতি ঈর্ষাও অনুভব করছিলাম... তাই অপহরণ করাই ওকে...'

গলার স্বর ম্লান হতে হতে থেমে গেল লায়োনেলের। নতুন করে কাশতে শুরু করল। দমকে দমকে মুখ উঠে আসছে রক্ত-মেশানো থুতু। বিছানার চাদর খামচে ধরে চেষ্টা করছে ব্যথা সামলানোর। ভয়াবহ দৃশ্য।

কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হলো না রোজামুণ্ডের। অলিভারের জীবন বাঁচানোর জন্য নারীসুলভ আবেগ ত্যাগ করেছে। কড়া গলায় বলল, 'কথা শেষ করো! কাকে ভাড়া করেছিলে অলিভারকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্য? নাম বলো তার!'

'সোয়ালো জাহাজের ক্যাপ্টেন...' কাশি থামলে বলল লায়োনেল, '...জ্যাসপার লেই।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল রোজামুণ্ডের, কিন্তু ক্ষান্ত দিল না। সময় থাকতে সমস্ত সত্য লায়োনেলের পেট থেকে বের করে নেবার পণ করেছে। বলল, 'এবার বলো গতকালকের ঘটনা। নিজে পালিয়ে এসেছ, নাকি সার অলিভারই তোমাকে পাঠিয়েছিল সিলভার হেরনে?'

'থাক, লেডি, আর ওকে কষ্ট দেবার প্রয়োজন নেই।' বাধা দিয়ে বললেন লর্ড হেনরি। 'যা বলার বলে দিয়েছে ও। ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন, কিলিগ্রু। অন্ধ ছিলাম আমরা!'

নীরবে মাথা ঝাঁকালেন সার জন, লায়োনেলের উপর থেকে দৃষ্টি সরালেন না।

'সার জন!' ফিসফিসাল মুমূর্ষু যুবক। 'আছেন আপনি? এখনও?' হাসার চেষ্টা করল। 'বিদায়, সার। পাপ করেছি আমি... তার মূল্যও দিয়েছি। আ... আমার হাত ধরুন, সার জন।'

কাঁপতে থাকা একটা হাত তুলল সে। সেটা চেপে ধরলেন সার জন। এই দৃশ্য দেখে আর স্থির থাকতে পারল না অলিভার।

'লায়োনেল! ভাই আমার!!' চেঁচিয়ে উঠল ও। দু'হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বিছানার পাশে। পাগলের মত চুমু খেলো ভাইয়ের কপালে। গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়েছে। হারিয়ে গেছে গত পাঁচ বছর ধরে বুকের ভিতর জমে থাকা হিংসা-বিদ্বেষ। জেগে উঠেছে ভ্রাতৃস্নেহ। 'আমার হাত খুলে দিন!' চেঁচাল ও।

লর্ড হেনরির ইশারায় খুলে দেয়া হলো বাঁধন। লায়োনেলকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল অলিভার। ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, ভাই। আর কোনও অভিযোগ নেই আমার।'

'অলিভার,' লায়োনেল বলল, 'তুমি মহান... আর আমি স্রেফ একটা নরকের কীট। বড্ড ভুল করেছি আমি... এখন বুঝতে পারছি। তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পেরেছি তো?' তাকাল লর্ড হেনরির দিকে। 'বলুন আমার ভাই বেকসুর কি না। দরকার হলে আরও স্বীকারোক্তি দেব আমি!'

'দরকার নেই,' লর্ড হেনরি বললেন। 'ও নির্দোষ। আর কোনও অভিযোগ তোলা হবে না ওর বিরুদ্ধে... আমি কথা দিচ্ছি!'

পোর্টহোল সূর্যের এক চিলতে আলো পড়ল লায়োনেলের মুখে। ফ্যাকাসে চেহারায় দেখা দিল আনন্দের চিহ্ন। 'যাক, আমি

নিশ্চিন্ত,' বলল ও। 'যা হবার হয়ে গেছে, ভাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ এখন তোমার হাতে।' হাসল একটু। 'কালকের সাঁতারটা বড্ড লম্বা ছিল। পেনারো থেকে ট্রেফুসিস পয়েন্টে পৌঁছুতেও অনেক সাঁতার কাটতে হয়েছে, কিন্তু তখন তুমি আমার সঙ্গে ছিলে। জানতাম, আমার শক্তি ফুরিয়ে গেলেও তুমি সাহায্য করবে আমাকে। কাল সন্ধ্যায় সে-আশা ছিল না। তখনই আমি তোমার অভাব বুঝতে পেরেছি, অলিভার। বুঝেছি তোমাকে আমার কতখানি দরকার।'

'কথা বোলো না!' ওর ঠোঁটে আঙুল রাখল অলিভার।

শেষবারের মত হাসল লায়োনেল, তারপর কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। চিরদিনের মত।

হু হু করে কেঁদে ফেলল রোজামুণ্ড, মুখ ঢাকল দু'হাতে। মাথা নামিয়ে নিলেন সার জন আর লর্ড হেনরি-সহ সবাই। আর অলিভার... ভাইয়ের লাশ জড়িয়ে ধরে বসে রইল মূর্তির মত। বলতেও পারবে না কখন ওর চোখের কোণ থেকে নেমে এসেছে দু'ফোঁটা অশ্রু।

অনেকক্ষণ পর ওর কাঁধে হাত রাখলেন সার জন। সাবধানে আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লায়োনেলকে শুইয়ে দিলেন বিছানায়, হাতদুটো ভাঁজ করে দিলেন বুকের উপর। তারপর একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন লাশটা।

উঠে দাঁড়াল অলিভার। অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় বুক দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে, চেহারায় পড়েছে বেদনার ছাপ।

'চলো,' ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন সার জন। দু'জনে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। জাহাজের পাটাতনে পৌঁছে থামল। উদাস দৃষ্টিতে তাকাল খোলা সাগরের দিকে।

'ও আমার ছেলের মত ছিল,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সার

জন, যেন কৈফিয়ত দিচ্ছেন। 'সেই ভালবাসাই আমাকে অন্ধ করে রেখেছিল।'

'আর ও ছিল আমার ভাই,' বলল অলিভার শান্ত স্বরে। 'আল্লাহ্ ওকে বেহেশত নসিব করুন।'

'আ... আমি কি তোমার ক্ষমা চাইতে পারি?' ইতস্তত করে বললেন সার জন। 'বুঝতেই পারছ, স্রেফ আবেগের বশে তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম...'

ভদ্রলোককে লজ্জার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই যেন দ্রুত হাত বাড়িয়ে দিল অলিভার, আন্তরিক ভঙ্গিতে করমর্দন করলেন সার জন। বললেন, 'আমরা আবার প্রতিবেশী হতে চলেছি, সার অলিভার। কথা দিচ্ছি, এবার আমাদের সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেক বেশি সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে।'

'আমি আর বন্দি নই তা হলে?' জিজ্ঞেস করল অলিভার।

'না, সার অলিভার,' বলে উঠলেন লর্ড হেনরি। ওদের পিছু পিছু এসেছেন তিনি। 'নিশ্চিন্তে ইংল্যাণ্ডে ফিরতে পারো তুমি। রানি তোমার কাহিনি শুনবেন, প্রয়োজনে সেটার সত্যতা জ্যাসপার লেইয়ের মাধ্যমে প্রমাণ করা হবে। পুরনো পদবী আর সম্মান আবার ফিরে পাবে তুমি, আমি ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়তা দিচ্ছি তার।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু পদবী-টদবী চাই না আমি। ধর্মও বদলাতে আগ্রহী নই,' অলিভার বলল। 'তাতে কোনও সমস্যা আছে?'

'আমার তো মনে হয় না,' লর্ড হেনরি বললেন। 'ধর্ম-কর্ম মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। তা নিয়ে আপত্তি জানানোর অধিকার নেই কারও।' হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'আমাকে তোমার বন্ধু বলে ভাবলে খুশি হব।'

'ধন্যবাদ, মাই লর্ড,' বলে হাত মেলাল অলিভার।

রোজামুণ্ড এসে দাঁড়িয়েছে ওদের কাছে। ওকে লক্ষ্য করে গলা খাঁকারি দিলেন সার জন। 'আমাদের বোধহয় এবার যাওয়া দরকার, লর্ড হেনরি,' বললেন তিনি। 'অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' তাড়াতাড়ি বললেন লর্ড লেফটেন্যান্ট। সার জনের সঙ্গে চলে গেলেন জাহাজের অন্যদিকে। পাটাতনে একা রয়ে গেল রোজামুণ্ড আর অলিভার।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে পরস্পরকে দেখল ওরা, তারপরেই অলিভারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রোজামুণ্ড। ওকে নিবিড় আলিঙ্গনে টেনে নেয় অলিভার।

আশপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করল কৌতূহলী নাবিকেরা। অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখছে—পাগড়ি-কোর্তা পরা এক কর্সেয়ারের বুকে ইংরেজ অভিজাত নারী! তারচেয়েও অদ্ভুত হলো—দুজনকে মানিয়েছে বেশ!

***

রাফায়েল সাবাতিনি-র
বিশ্ববিখ্যাত রোমাঞ্চোপন্যাস

দ্য সি-হক

রূপান্তরঃ ইসমাইল আরমান

এ-কাহিনির নায়ক সার অলিভার ট্রেসিলিয়ান...
টগবগে তরুণ, বীর নাইট, অভিজাত
এক পরিবারের শেষ সন্তান।
সৎ ভাইয়ের ষড়যন্ত্রে সবকিছু হারাল ও।
অভিযুক্ত হলো মিথ্যে খুনের দায়ে,
ভুল বুঝে দূরে সরে গেল তার প্রেমিকা,
হলো অপহৃত, কপালে জুটল ক্রীতদাসের মানবেতর জীবন।
তারপর? সময়ের পরিক্রমায় এবং নিয়তির অমোঘ লিখনে
সে-ই পরিণত হলো ভয়ঙ্কর এক জলদস্যু... সি-হক,
মানে সাগরের বাজপাখিতে—যার নাম শুনে
কেঁপে ওঠে সাত সমুদ্র আর তেরো নদীর মানুষ।
শুরু হলো প্রতিশোধের পালা।

রাফায়েল সাবাতিনির সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস।
প্রেম, প্রতিহিংসা আর সংগ্রামের এক অতুলনীয় উপাখ্যান।
মুগ্ধতার শতভাগ নিশ্চয়তা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০